কুরআনের সওগাত

মূল ঃ সাইয়্যেদ বশীর উদ্দিন জামানী

কুরআনের সওগাত

মূল ঃ সাইয়্যেদ বশীর উদ্দিন জামানী

প্রকাশনায় ঃ মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী
১৪-১৫, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

বাংলা সংস্করণের প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ১৯৯৫

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে ঃ
নূর কম্প্রিন্ট
২৮/এ০২, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

বিঃ দ্রঃ এই বই-এর কোন স্বত্ব সংরক্ষিত নেই। যে কেউ যত সংখ্যক ইচ্ছা বইটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন। এজন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১।	**প্রথম সূরা-ফাতিহা**	৯
০২।	**তারাবীহ্'র প্রথম রজনী** প্রথম সোয়া পারা (সূরা বাক্বারাহ্)	১০
০৩।	**তারাবীহ্'র দ্বিতীয় রজনী** দুই পারার প্রথম চতুর্থাংশ থেকে তিন পারার অর্ধেক পর্যন্ত (সূরা বাক্বারাহ-আলে-ইমরান)	১৩
০৪।	**তারাবীহ্'র তৃতীয় রজনী** তিন পারার অর্ধেকাংশ থেকে চার পারার শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত (সূরা-আলে-ইমরান)	১৭
০৫।	**তারাবীহ্'র চতুর্থ রজনী** চার পারার শেষ চতুর্থাংশ থেকে পাঁচ পারার শেষ পর্যন্ত (সূরা-নিসা)	২০
০৬।	**তারাবীহ্'র পঞ্চম রজনী** ছয় পারার শুরু থেকে সাত পারার প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত (সূরা-নিসা, মায়েদা)	২৩
০৭।	**তারাবীহ্'র ষষ্ঠ রজনী** সাত পারার প্রথম চতুর্থাংশ থেকে আট পারার অর্ধেক পর্যন্ত (সূরা-আনআম)	২৫
০৮।	**তারাবীহ্'র সপ্তম রজনী** আট পারার অর্ধেক থেকে নয় পারার শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত (সূরা-আ'রাফ)	৩০
০৯।	**তারাবীহ্'র অষ্টম রজনী** নয় পারার শেষ চতুর্থাংশ থেকে দশ পারার শেষ পর্যন্ত (সূরা-আনআম, তাওবা)	৩৩
১০।	**তারাবীহ্'র নবম রজনী** এগার পারার শুরু থেকে বার পারার প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত (সূরা-তাওবা, ইউনুস, হুদ)	৩৭

নিরাপদ পরিবেশের, সততার, ন্যায়পরায়ণতার, আমানতদারীর, চিন্তার পরিশুদ্ধতার, আধ্যাত্মিক শান্তির, ক্ষমা ও উদারতার, উন্নত চরিত্রের এবং সুন্দর লেন-দেনের। পবিত্র কুরআন এ সবই শিক্ষা দেয়।

এ নশ্বর জগতে সিদ্ধান্তমূলক শক্তি রয়েছে একমাত্র পবিত্র কুরআনের আনুগত্যে। স্বার্থপরতা, লালসা, মিথ্যাচার, লুট-পাট, হত্যা, ডাকাতি, লুণ্ঠন ইত্যাদি আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। নেক জীবনের শুরু হয় ঘর ও মাদ্রাসা-মক্তব তথা শিক্ষালয় থেকে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ যে ধ্যান-ধারণা লাভ করে, বড় হবার পর কাজ-কর্মের মাধ্যমে তারই প্রতিফলন ঘটে। আমাদের মা, বোন, সন্তান ও ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন এমন এক বই যা দিন রাত তাদেরকে পথ দেখাবে। আমাদের বড়রা মোটেই সময় পান না। ধন-সম্পদ অর্জন ও ক্ষমতা হাসিল করার কাজে তারা সদা ব্যস্ত। তারা জীবনের প্রয়োজন মেটাতে সারাক্ষণ তৎপর। তাদের মনও চায় এ ধরনের বই পড়ে সে মোতাবেক আমল করতে। আল্লাহ্ যেন প্রত্যেককে তৌফিক দেন। তাঁর দ্বীনের দাওয়াত যেন সবার নিকটে পৌঁছে দেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী দ্বীন প্রচারের কাজ করা উচিত। এ উপলব্ধি থেকেই এ ছোট পুস্তিকা পেশ করা হলো। "কুরআনের সওগাত" বিনা বিনিময়ে আপনাদের হাতে পৌঁছে দিলাম। আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সাইয়্যেদ বশীর উদ্দিন জামানী

করাচী, পাকিস্তান।

১১। **তারাবীহ্'র দশম রজনী** ৪০
বার পারার চতুর্থাংশ থেকে তের পারার অর্ধেক পর্যন্ত
(সূরা-হুদ, ইউসুফ, রা'দ)

১২। **তারাবীহ্'র একাদশ রজনী** ৪৯
তের পারার অর্ধেক থেকে চৌদ্দ পারার তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত
(সূরা-রা'দ, ইব্রাহিম, হিজ্‌র)

১৩। **তারাবীহ্'র দ্বাদশ রজনী** ৫৫
চৌদ্দ পারার তিন চতুর্থাংশ থেকে পনের পারার শেষ পর্যন্ত
(সূরা-বনী ইসরাইল, কাহফ,)

১৪। **তারাবীহ্'র ত্রয়োদশ রজনী** ৬১
ষোল পারার শুরু থেকে সতের পারার চতুর্থাংশ পর্যন্ত
(সূরা-কাহফ, মারইয়াম, তোয়াহা, আম্বিয়া)

১৫। **তারাবীহ্'র চতুর্দশ রজনী** ৬৫
সতের পারার চতুর্থাংশ থেকে আঠার পারার অর্ধেক পর্যন্ত
(সূরা-আম্বিয়া, হজ্জ, মোমেনুন, নূর)

১৬। **তারাবীহ্'র পঞ্চদশ রজনী** ৭১
আঠার পারার অর্ধেক থেকে উনিশ পারার তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত
(সূরা-ফুরক্বান, শুয়ারা, নমল)

১৭। **তারাবীহ্'র ষষ্ঠদশ রজনী** ৭৪
উনিশ পারার শেষ চতুর্থাংশ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত
(সূরা-নামল, কাসাস, আনকাবুত)

১৮। **তারাবীহ্'র সপ্তদশ রজনী** ৭৯
একুশ পারা
(সূরা-আনকাবুত, রুম, লুকমান, সাজদা, আহজাব)

১৯। **তারাবীহ্'র অষ্টাদশ রজনী** ৮৭
বাইশ পারা
(সূরা-আহজাব, সাবা, ফাতির, ইয়াসীন)

২০। **তারাবীহ্'র উনিশতম রজনী** ৯১
তেইশ পারা
(সূরা-ইয়াসিন, সাফ্‌ফাত, সাদ, যুমার)

২১। তারাবীহ্'র বিশতম রজনী ৯৭
চব্বিশ পারা
(সূরা-যুমার, মুমিন, হা-মীম-সাজদা)
২২। তারাবীহ্'র একুশতম রজনী ১০১
পঁচিশ পারা
(সূরা-শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাছিয়া)
২৩। তারাবীহ্'র বাইশতম রজনী ১০৭
ছাব্বিশ পারা
(সূরা-আহক্বাফ, মুহাম্মদ, ফাত্হ, হুজুরাত, ক্বাফ)
২৪। তারাবীহ্'র তেইশতম রজনী ১১১
সাতাশ পারা
(সূরা-জারিয়াত, তূর, নাজম, ক্বামার, রহমান, ওয়াক্বিয়া, হাদীদ)
২৫। তারাবীহ্'র চব্বিশতম রজনী ১১৭
আঠাশ পারা
(সূরা-মুজাদালাহ, হাশর, মুমতাহানা, সাফ্ফ, জুমুয়া,
মনাফিকুন, তাগাবুন, ত্বালাক, তাহ্রীম)
২৬। তারাবীহ্'র পঁচিশতম রজনী ১২৩
উনত্রিশ পারা
(সূরা-মূল্ক-থেকে মুরসালাত পর্যন্ত)
২৭। তারাবীহ্'র ছাব্বিশতম রজনী ১৩০
তিরিশ পারার প্রথম অর্ধেক
(সূরা-নাবা থেকে ফাজর পর্যন্ত)
২৮। তারাবীহ্'র সাতাশতম রজনী ১৩৭
তিরিশ পারার শেষ অর্ধেক
(সূরা-বালাদ থেকে নাস পর্যন্ত
(সূরা বালাদ, শামস, লায়ল-সূরা দুহা, ইন্শিরাহ, ত্বীন-সূরা আলাক, কাদর,
বায়্যিনা-সূরা যিলযাল, আ'দিয়া, কারিয়াহ থেকে নাস পর্যন্ত)

بسم الله الرحمن الرحيم

সঙ্কলকের আরজ

রমজান মাসে পবিত্র কুরআন পড়া এবং শুনার মাধ্যমে সত্তর গুণ নেকী অর্জন করা যায়। আরবী ভাষায় অর্জিত কুরআনের সহজ-সরল বাংলা সংক্ষিপ্তসার যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে কতোই না ভাল হতো। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অন্ততঃ এতটুকু তো জানা প্রয়োজন যে পবিত্র কুরআনের তিরিশ পারায় কি লিখা রয়েছে—আল্লাহ্‌র কালাম মুসলমানদের কাছে কি চায়? এবং সকাল-সন্ধ্যা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের এতো তাগীদ কেন? রমজান মাসে প্রত্যেকেই গুরুত্ব সহকারে তারাবীহ্‌র নামাজ পড়ে। যদি তারাবীর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবার আগে দশ মিনিট সে দিনের পঠিতব্য অংশের সংক্ষিপ্তসার বাংলায় দেখে নেয়া যায় তাহলে তারাবীহ'র নামাজে অবশ্যই বেশী করে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে। এভাবে অন্তর দিয়ে আরবী তেলাওয়াত শুনলে সে রাতের যাবতীয় বরকত অর্জন করা সহজ হবে। এ রকম করে ২৭ শে রমজান যখন পবিত্র কুরআন খতম করার অনুষ্ঠান হবে তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ হিসেব নিতে পারবে যে, এ রহমতের রাতগুলোতে সে কি শুনলো, কি বুঝলো এবং কি পেলো। যদি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনার মাধ্যমে একটি বাক্যও অন্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী জায়গা করে নেয় তাহলে বুঝবে যে, এ ক্ষতিতে ভরপুর জীবন শুধরে গেছে—সঠিক সরল পথের সন্ধান মিলে গেছে এবং পরকাল সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে গেছে।

আমরা যখন আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ মেনেই নিয়েছি—ইসলামকে নিজেদের দ্বীন বলে গ্রহণ করেছি তখন গাফ্‌লতি,অলসতা এবং অজ্ঞতার অবকাশ কোথায়? আর নিজেদের দায়িত্ব পালনে ভীত হবার কারণ কি? জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত। কখন কোথায় এর পরিসমাপ্তি ঘটবে বলা দুষ্কর। যদি আমরা পবিত্র মাহে রমজানে এ সুযোগ হাত ছাড়া করি, নিজেদের ইহ্‌কাল ও পরকালের জন্য কোন সম্বল সাথে না নিতে পারি, তাহলে এ জীবনে যেমন সফলতা অর্জন করতে পারবো না তেমনি পরজীবনেও আল্লাহর হিসেব থেকে বাঁচতে পারবো না। পবিত্র কুরআন শুধু ইবাদত বন্দেগীর সবক দেয় না বরং প্রত্যেক মোমেনের ব্যক্তিগত আচরণ এবং আমল কেমন হবে তারও শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষা তিনটি। আকীদা-বিশ্বাসের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন জীবন, এবং ভদ্র আচরণ। একজন মানুষ সৎকাজ না করতে পারে। কিন্তু কখনো অসৎকাজ এবং মুনাফেকীতে লিপ্ত হওয়া মোটেই উচিত নয়। আজ প্রয়োজন ইসলামী সমাজের,

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট উর্দূ লিখক ও বুদ্ধিজীবি সাইয়্যেদ বশীর উদ্দিন জমানী কতৃক উর্দূ ভাষায় প্রণীত 'কুরআনের সওগাত' পবিত্র কুরআনকে এক নতুন আঙ্গিকে মুসলমান সমাজের সামনে পেশ করার এক শুভ প্রয়াস। প্রত্যেক মুসলমান দেশেই পবিত্র রমজান মাসে অধিকাংশ লোক অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তারাবীহ্'র নামাজে শরীক হয় এবং নেক নিয়তে কালামে পাকের তিলাওয়াত শুনে। এটা নিংসন্দেহে একটি ছওয়াব ও বরকতের কাজ। এ সুযোগে তাদের সামনে পবিত্র কুরআনের মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চিন্তা সত্যিই অভিনব। এ ধরনের উদ্যোগ ইতিপূর্বে কোথাও কারো গোচরীভূত হয়নি। এ সময় মানুষ পবিত্র কুরআন-মুখী থাকে বলে সহজেই তাদের মনে এ বিষয়গুলো জায়গা করে নেবে। বিষয়ের প্রাসংগিকতা, প্রয়োজনীয়তা এবং নতুনত্ব বাংলা ভাষায় বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে যারা আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পবিত্র কুরআনের খেদমত করার মানসে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মহান আল্লাহ্পাক কবুল করবেন-এই আমার কামনা।

ঢাকা-জুলাই, ১৯৯৫

মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানী

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম সূরা ফাতিহা

পবিত্র কুরআনের প্রথম সাত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে নিজের পরিচয় পেশ করেছেন। অতঃপর বান্দাকে দোয়া করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন কেমন করে দিনে পাঁচবার তাঁর দরবারে হাজির হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করতে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য যিনি বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।

الرَّحْمٰنِ

২। তিনি বড়ই দয়াময়! মানুষকে প্রয়োজন মতো সবকিছু দান করেন।

اَلرَّحِيْمِ

তিনি পরম দয়ালু। মানুষের গুণাহ্ এবং পাপ মোচন করে থাকেন।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

৩। তিনি কিয়ামতের দিন হিসেবের একমাত্র মালিক। কেউ তাঁর আদালত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

৪। হে প্রভু, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

৫। আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের সহজ-সরল পথ প্রদর্শন কর এবং তার উপর টিকে থাকার শক্তি দাও।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৬। সেসব লোকদের রাস্তা যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ— সালেহীন ও মোত্তাক্বীনদের রাস্তা।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

৭। সেসব পথভ্রষ্ট ও নাফরমানদের রাস্তা নয় যারা তোমার গজব ও ক্রোধে নিপতিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র প্রথম রজনী

(সূরাহ বাক্বারা)

প্রথম সোয়া পারার তেলাওয়াত

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এ কিতাব পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দাদের হেদায়াত ও নছীহতের জন্য—যার মধ্যে রয়েছে তাঁর রহমত ও নেয়ামত সমূহের বন্টনের বর্ণনা। এটা মহান আল্লাহ্ তায়ালার বাণী —এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এ কুরআনে মাজীদে দৃঢ় ঈমান পোষণ কর, অন্তরে এর প্রতি আস্থা স্থাপন কর এবং মুখ দিয়ে তা স্বীকার কর। সত্যিকার মোমেন সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে না দেখেই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। এরাই "মুত্তাকী"-এ কিতাবের দ্বারা যারা হেদায়েত ও নছীহত লাভ করবে। যারা নামাজ পড়ে, নিয়মিত যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে অভাবগ্রস্তদের জন্য খরচ করে। এ ধরনের নেক বান্দাদেরকে আল্লাহ্পাক নিজ রহমতের বারি দিয়ে সিঞ্চিত করেন।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক হলো তারা, যারা আকিদা, বিশ্বাস ও আমল আখলাক উভয় দিক দিয়েই মন্দ প্রকৃতির। এরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না-তাঁর সাথে শরীক করে এবং কুফ্রী ও শেরেকী কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে। এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর হাতে সোপর্দ করে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেবার এবং কুফরীর ভ্রান্ত পথ থেকে ইসলামের সঠিক পথে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তৃতীয় প্রকারের লোক যারা, তারা বাহ্যতঃ ঈমানদার। কিন্তু আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি এদের ঈমান দৃঢ় নয়। এদের প্রতিটা কাজ দ্বীন ইসলামের বিরোধী। এদেরকে মুনাফিক বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে হিংসা-বিদ্বেষ এবং কু-প্রবৃত্তির রোগ। এরা মিথ্যাচার, পাপাচার, ধোকাবাজি ইত্যাদিতে লিপ্ত। এসব লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন নিজ ইনসাফের আদালতে হাজির করবেন। সেখানে তাদের কাজের হিসেব নেয়া হবে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র আদালতের রায় ঘোষিত হবে।

এ সূরার প্রকৃত লক্ষ হলো আহ্লে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টান—যারা এ তৃতীয় দলে শামিল। আল্লাহ্র আদালতে এদেরকে অবশ্যই হাজির হতে হবে। আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনেছেন। বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের

ফিরিস্তি অনেক লম্বা। এ সূরার ৩নং থেকে ১১৮ নং আয়াতসমূহে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাইল-এর উপর নিজের নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহের এক দীর্ঘ ফিরিস্তী দিয়েছেন। ৪৮ থেকে ৬০ নং আয়াতে এটা বর্ণনা করার সাথে তাদের অপরাধের বিস্তৃত বর্ণনাও রয়েছে। পবিত্র কুরআন মানব জাতিকে সর্ব প্রথম যে শিক্ষা দিয়েছে তাহলো নিজ সৃষ্টি কর্তার ইবাদত এবং আনুগত্য করা এবং তাঁকে সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়া। বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের শেষ নেই। সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো এটা যে আলাহ মানুষকে সৃষ্টির আদিতে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন এবং তাকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হবার মর্যাদা দিয়েছেন আর তাকে নিজ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ-সংক্রান্ত অতি আশ্চার্য ঘটনাবলী ও ইতিহাস আলোচ্য সূরার ২৯ থেকে ৩৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ সবের সার কথা হলো এ যে আল্লাহ্ মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে নিজের থেকে রুহ্ দিয়ে জীবন দান করেছেন, তাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে ফেরেস্তার উপর মর্যাদা দিয়ে ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজ্দা করিয়েছেন। আর জ্বীনের বংশজাত শয়তান মানুষকে সিজ্দা না করে আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করেছে এবং তার অবাধ্য হবার কারণে গজবের শিকার হয়েছে ও বিতাড়িত হয়েছে। এসব বর্ণনার মূল কথা হলো এ যে, এ জগতে জীবন-যাপনের রাস্তা মাত্র দুটো- একটা হলো মনুষ্যত্বের রাস্তা—আল্লাহ্র আনুগত্য ও দাসত্ব এবং বন্দেগীর রাস্তা। অন্যটি হলো শয়তানী রাস্তা—শয়তানী কাজ-কর্মের রাস্তা। এ পথে গেলে মানুষ নাফরমানী, শির্ক, কুফরী, বদমায়েশী এবং প্রকৃতির দাসত্বে লিপ্ত হয়। আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কোন পথে চলবো। যে পথে চলি না কেন, তার পরিণতিও ফলাফলের দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হবে।

পবিত্র কুরআন মুত্তাকী মানুষ হিসেবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উদাহরণ দিয়েছে। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন আকীদার লোক। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অগাধ ও মজবুত। আল্লাহ্ তাঁকে অনেক পরীক্ষা করেছেন। তিনি এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আল্লাহ্ তাঁর ঈমান ও বিশ্বাসকে পছন্দ করলেন। এ কারণে তাঁকে নবুয়্যত এবং সারা বিশ্বের ইমামতি ও নেতৃত্ব দান করলেন। তাঁর বংশধরদের মাঝেও নবুয়্যত ও নেতৃত্বের ধারা বহাল রাখলেন। কিন্তু বনী ইস্রাইল মর্যাদাবান জাতি হওয়া সত্ত্বেও কুফ্রী ও শেরেকীর পথ অবলম্বন করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। ফলে আল্লাহ্ নবুয়্যত ও নেতৃত্ব তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে রেখেছেন এবং চূড়ান্ত বিচার হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে। বণী ইসরাইল

থেকে নব্যুয়তও ইমামত ছিনিয়ে সেটা দেয়া হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অপর সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরদের নিকট। এভাবে মক্কার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ (দঃ)-কে নবী বানালেন এবং তাঁর উপর পবিত্র কুরআন মজীদ নাজিল করলেন। এর প্রমাণস্বরূপ ইহুদীদের ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস পরিবর্তন করে উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ)-এর জন্য মক্কা শরীফকে কিব্‌লা বানানো হয়েছে। বস্তুতঃ দ্বীনের ভিত্তি হলো আকীদা। আকীদা যত মজবুত হবে আমলও তত শক্ত হবে। মুসলমানের মূল আকীদা হলো না দেখে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা। নামাজ ও অন্যান্য বন্দেগী হলো এর বহিঃপ্রকাশ।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় মূল শিক্ষা হলো ছবর বা ধৈর্য্য এবং নামাজ। ছবর ইবাদতের মধ্যে গণ্য। ঈমানদারদের উচিত এ দুটো জিনিস নিজেদের জীবনে অর্জন করা। ছবরের দ্বারা সব রকম মুছিবত, রোগ-শোক এবং কষ্ট সহ্য করা শিখা যায়। আর নামাজ দিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য হাসিল করা যায়। কেননা নামাজ হলো এক প্রকার দোয়া। আর আল্লাহ্ দোয়া শুনেন। ছবরের সর্বশেষ পর্যায় হলো জিহাদ। জিহাদের প্রস্তুতিস্বরূপ ছবরের প্রাথমিক স্তরগুলো অতিক্রম করতে হবে। যখন ছবর ও ধৈর্য্য-সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন জিহাদ করবে। আল্লাহ্ ছবর ও ধৈর্য্য বেশ পছন্দ করেন। বিবি হাজেরা ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছবরের যে রূপ দেখিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র বেশ পছন্দ হয়েছে। এজন্যে আল্লাহ্ এটাকে হজ্বের অবশ্য করণীয় কাজগুলোর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বছর হাজীরা ছাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ে সে ছবরও ধৈর্য্যের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করেন। জিহাদ ছবরের চূড়ান্ত পর্যায়। এটা দ্বীনের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। যারা জিহাদে শরীক হয়ে মারা যান তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা হলো শহীদ। আল্লাহ্ তাদেরকে অনন্ত জিন্দেগী এবং বিশিষ্ট রিজ্‌ক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ধৈর্য্যশীল বান্দাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষুধা, দারিদ্র, বালা-মুছিবত, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করেন যে বান্দাগণ বিপদে পড়ে ধৈর্য্য ধারণ করে-না অভিযোগ করে। হিম্মতের সাথে, ধৈর্য্যের সাথে কাজ কর। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করো। রীতিমতো নামাজ আদায় কর। হে মানুষ যদি মুসলমান হও তাহলে হালাল রুজি অর্জন কর এবং খাও। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর তিনটি জিনিস দিয়ে দ্বীনের প্রয়োজন মিটে। আকীদার বিশুদ্ধতা, পরিচ্ছন্ন জীবন ও হালাল রুজি আর উত্তম চরিত্র। হারাম রুজি দুঃখ-কষ্ট ও নানা রকম রোগ-শোকের সৃষ্টি করে। শয়তানের রাস্তা ও তরীকায় চলা উচিত নয়। মনুষ্যত্ব, মানবতা ও দ্বীন ইসলামের তরীকায় চলা উচিত। এতেই সুখ-শান্তি নিহিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র দ্বিতীয় রজনী

(সূরা বাকারা, আল ইমরান)

দ্বিতীয় পারার চতুর্থাংশ থেকে তৃতীয় পারার অর্ধেক পর্যন্ত তেলাওয়াত।

১৭৮ ওহে মানব জাতি! হন্তা থেকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য জিহাদ আর কিছাছ (হত্যার প্রতিশোধ) ও দিয়াতের (রক্তপণ) বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ্ তো ইনছাফ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান।

হে মানুষ! ওছিয়াত করে যাও। ওছিয়াতের বিধান ও পদ্ধতি তোমাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমাদের উপর আল্লাহ্ রোযার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ্পাক সর্বাবস্থায় তোমাদের সহজকল্যাণ চান। মক্কা শরীফে নামাজের হুকুম দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান খোদা মদীনা শরীফে হিজরতের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। হজ্বের ইবাদত হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এর যামানা থেকেই চলে আসছিল। এখন এর অনেক সংশোধন করা হলো। এবার মদীনাতে রোযার বিধানের মাধ্যমে দ্বীনের আরকান পরিপূর্ণতা লাভ করলো। রোজাতো এক মাসের জন্য ফরজ। কারো এর থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ নেই। কোন প্রকার ওজর-আপত্তি চলবে না। রমজান ও শাওয়াল মাসে এজন্যে চাঁদ দেখার বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাতে রোজার হিসেব রাখতে সুবিধা হয়। মানুষ জানতে চায় তারা আল্লার রাহে কি খরচ করবে। হে রাসূল! বলে দিন, তোমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আল্লার রাহে ব্যয় করো। এ ব্যাপারে পিতা-মাতার হক সবার আগে থাকবে। এরপর গরীব, নিকট আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নজর রাখতে হবে।

অবিশ্বাসীরা রাসূলের (সঃ)-এর নিকট তিনটি বিষয় জানতে চেয়েছে। কুরআনে কারীমে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। মদ, জুয়া ও পাশা অনর্থক শয়তানী কর্ম-এর মধ্যে উপকার কম বিরাট ক্ষতি।

তৃতীয় কথা হলো ইয়াতীম ও বিধবাদের হক। এদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। ইয়াতীমকে স্নেহ ভালবাসা দাও।

(২১৯) ঃ আয়াতের মধ্যে বদর যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরানী বিধান এসেছে। বদর যুদ্ধ হিজরতের ১৮ মাস পর সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে কোরাইশদের পাপীষ্ঠ যুদ্ধবাজ নেতারা জাহান্নামে পৌঁছে গেছে। তাদের পরিত্যাক্ত নারী ও মালসামানা

গণীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কুরআন এর বিধান জানিয়ে দিয়েছে। সর্ব প্রথম মুশরেক নারীদের বিবাহের বিধান এসেছে। তারা যদি ঈমান আনে তবে তাদের বিবাহ করা বৈধ হবে।

(২২২) ঃ আয়াতে মেয়েদের হায়েজের ব্যাপারে বলা হয়েছে এটা স্বভাবজাত কুদরতের বিধান। এ সময়ে মেয়েদের উপর নামাজের বিধান থাকবে না। তবে রোযার কাযা অবশ্যই করতে হবে।

(২২৪) ঃ আয়াতে মিথ্যা শপথের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মিথ্যা শপথ কখনো করা উচিৎ নয়। মিথ্যা কছমের কারণে ফেদিয়া আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর ফেদিয়া হলো দশজন মিসকীনকে একবেলা তৃপ্তিসহকারে খানা খাওয়ানো বা কাপড় দেয়া। আর যদি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তাহলে তিন দিন লাগাতার রোজা রাখা।

(২২৬) ঃ আয়াতে তালাকের বিধান প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর ২৪৫ আয়াত পর্যন্ত এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এবং এর খুটিনাটি কুরানের সুরায়ে তালাকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(২৩৮) ঃ আয়াতে আছরের নামাজের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। ভ্রমণাবস্থায় যে সওয়ারীর উপরই থাকনা কেন ঐ অবস্থায় নামাজ আদায় কর।

(২৪৮) আয়াতে বানী ইস্‌রাঈলের রাজা তালুত এবং আমালীকা জাতির রাজা জালুতের মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। যে যুদ্ধে আল্লাহ্ তায়ালা তালুতকে জয়যুক্ত করেছেন। হযরত দাউদ (আঃ) এ যুদ্ধে তালুতের সাথে ছিলেন। এবং তিনিই জালুতকে হত্যা করেছেন। তালুত দাউদকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ্ পরে তাকে বানী ইসরাইলের রাজত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তিনি বানী ইসরাইলের রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম করেন।

(২৫২) ঃ আয়াত تلك الرسل থেকে তৃতীয় পারা শুরু হচ্ছে।

(২৫৪) ঃ আয়াতে এ প্রথমবার জাকাতের হুকুম জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ছদকা-খায়রাতের হুকুমতো মক্কাতেই দেয়া হয়েছে। মদীনাতে যাকাত ফরজ হয়েছে। এর পূর্বে যে ছদকা-খায়রাত করা ফরজ ছিল সে হুকুম বাতিল হয়ে গেলো।

প্রত্যেক বৎসর যাকাত নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে। এভাবে ইসলাম ধর্মের শেষ রুকন পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেলো। দ্বীনের রুকন বা স্তম্ভসমূহ পুরা করার পর আল্লাহ্ স্বীয় পরিচয় পুরাপুরি পেশ করলেন ও আয়াতুল কুরশীর মত লম্বা আয়াত নাজিল

করলেন। ইহাকে শেফা বা রোগ-মুক্তির আয়াত বলা হয়। এই আয়াতে আল্লার জাত ও ছিফাতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে।

(২৫৯) ঃ আয়াতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিভাবে মৃত্যুর পর মানুষকে জিন্দা করা হবে? একশত বৎসর পূর্বের মৃত মানুষকে জীবত করে আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞাসা করলেন কত ঘুমিয়েছো? সে বলল গত কালই নাস্তা তৈরি করে একটু আরাম করলাম। তাকে জানানো হলো একশত বৎসর তুমি মৃত ছিলে। তোমার আরোহী মৃত গাধার জীর্ন শীর্ণ হাড়ের দিকে তাকাও আর চিন্তা কর কত বৎসর চলে গেলো।

ব্যাপারটা তার বিশ্বাস হলো না। তখন তার সামনে মৃত গাধাকে দ্বিতীয়বার জিন্দা করা হলো। তখন তার বিশ্বাস দৃঢ় হলো। এ উদাহরণ আল্লাহ্ তায়লা স্বীয় পয়গাম্বর হযরত উজাইর (আঃ) কে শুনিয়েছেন। যাকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

ঠিক এ জাতীয় ঘটনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনে ঘটেছে। যা (২৬০) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মৃত পাখীদের তাঁর সামনে জিন্দা করে দেখানো হয়েছে। এতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসী অন্তর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নিশ্চিত পরিতৃপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সব কাজ করতে সক্ষম ।

(২৭৪) ঃ নং আয়াতে সুদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ্ সুদ ধ্বংস করেন, আর ছদকা-খয়রাতের বরকত দান করেন।

(২৭৬) ঃ নং আয়াতে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের সময় সুনির্দিষ্ট অঙ্গিকার ও অঙ্গিকার রক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে ওয়াদা, কথা ও চুক্তি রক্ষা করার উপর জোর তাকিদ এসেছে। প্রত্যেক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট চুক্তি থাকা উচিৎ। ব্যবসায়িক কাজে দুজন স্বাক্ষী রেখে সব কিছু লিখে রাখা একান্ত দরকার। স্মরণশক্তির উপর নির্ভর কেউ করনা। লিখিত চুক্তিনামা তৈরী করে লও। আর এ চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে ঈমানদারী ও খোদাভীতির পরিচয় দাও।

(২৮৩) ঃ নং আয়াতে আল্লার কুদরতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাত-দিনের আগমন নির্গমণ ও অন্য সব কিছুই আল্লার নির্দেশে তাঁরই ইচ্ছে মাফিক হচ্ছে। আল্লাহ্তো মহা বিশ্বের একমাত্র মহান প্রভু বা মালিক। সর্বত্র তাঁরই নির্দেশ বলবৎ আছে। আমরা সকলেই তাঁর হুকুমের গোলাম তাঁরই মুখাপেক্ষী।

খোদাতায়ালা আদমকে বেহেশ্ত থেকে বের করে দেয়ার সময় যে দোয়া শিখিয়েছেন, এ সূরার শেষদিকে আদম সন্তানদের তা বাতলিয়ে দিয়েছেন।

"হে খোদা! আপনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনিই আমাদের সাহয্যকারী মনিব। আমাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করুন; নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু"। (সূরায়ে বাক্বারা সমাপ্ত)

আদম (আঃ)-এর এ দোয়া উল্লেখ করার পর আরকানে দ্বীনের বর্ণনা শেষ। সূরায়ে আল ইমরানে ইসলাম ধর্মের জীবনপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো ইসলাম। সূরায়ে বাকারায় দ্বীনের আরকান, নামাজ ও ছবরের তায়ালীম দেয়া হয়েছে। খোদার রাহে জিহাদ ও দান ছদকার হুকুম এসেছে। আর এ সূরায় ইসলামী জীবন প্রণালী ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানমাল কোরবানীর বিশেষ হেদায়েতী বক্তব্য আছে। সূরার প্রথমে আল্লার জাত ও ছিফাত বা গুনাবলী পেশ করা হয়েছে। আল্লার ইস্‌মে আযম বা বড় পরিচয় হলো তিনি ঃ হাইউল-কাইউম, অর্থাৎ চিরঞ্জীব ও চির ক্ষমতাধর। তার ফয়সালাই চূড়ান্ত। তিনি যেভাবে যা ইচ্ছে পয়দা করতে পারেন।

সূরায়ে বাকারায় আদম (আঃ) কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিতো পিতা মাতা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছেন। সুরায়ে আল-ইমরানে বলা হচ্ছে যে ঈসা (আঃ)-কে পিতা ছাড়া দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; এটা আল্লার ইচ্ছা ও তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। হে মানুষ! আল্লাহ্‌র নিকট হেদায়াত ও দৃঢ়তা কামনা কর। তোমাদের সকল আরাধনা প্রার্থনা শুধু তিনিই পুরা করতে পারেন। আল্লার নিকটই সবকিছু চাও।

কুরআনে কারীমে দু-ধরনের আয়াত আছে—

একঃ মুহ্‌কাম অর্থাৎ আহ্‌কাম বা বিধি নিষেধের আয়াত

দুইঃ মুতাসাবেহ্ অর্থাৎ খোদার গোপন রহস্য সম্বলিত বাণী। কুরআন মানুষকে এ বিষয়ে গবেষণার আহবান করেছে। দুর্বল ঈমানের মানুষ এখানে বিভ্রান্ত হয়। ভুল ব্যাখ্যা দেয়। এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য মুহাম্মদ (সঃ) এর আনুগত্য করা ফরজ। খোদার বন্দেগী দৈনিক পাঁচবার নামাজের আমলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। এটাই বান্দার সাথে আল্লার সম্পর্কের রাস্তা। আহ্‌লে কিতাব বা খৃষ্টান ও ইহুদী জাতি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাল্পনিক পুত্রের মাধ্যম অবলম্বন করে শিরক ও কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছে। (সুরায়ে আল ইমরান-৩৪)

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র তৃতীয় রজনী

(সূরা-আলে ইমরান)

তৃতীয় পারার অর্ধেক থেকে চতুর্থ পারার শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত

আলে ইমরান বংশে ইমরানের স্ত্রী ছিলেন বন্ধা। তিনি আল্লার নামে মান্নত করেছেন যে, যদি তাঁর ছেলে সন্তান হয়; তাহলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে উৎসর্গে করবেন। আল্লাহ্‌তো মান্নত পূর্ণকারী। তার দোয়া কবুল হয়েছে। তাঁর ঘরে মারয়াম জন্ম লাভ করেছেন। ইমরানের স্ত্রী বললেন, "আল্লাহ্ আমি তো পুরুষ সন্তান মান্নত করেছিলাম, আপনি আমাকে দান করেছেন কন্যা সন্তান"। আল্লাহ্ বলেন আমি জানি কোনটা তোমার জন্য উত্তম। আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবেই। মারয়ামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশে অবস্থিত তাঁর খালু হযরত জাকারীয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে দেয়া হলো। মারয়াম বায়তুল মুকাদ্দাসে বড় হলেন। যৌবনে পদার্পন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে তাঁর গর্ভে ঈসা মাসীহ পয়দা হবেন। মারয়াম বিচলিত হলেন। কিন্তু আল্লার ইচ্ছেতে সব কিছুই সৃষ্টি হয়। এদিকে হযরত জাকারীয়া (আঃ) এর সন্তান লাভের বিশেষ আকাংখা হলো। তাঁর কোন ওয়ারিশ ছিল না। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে ইয়াহিয়ার মত সৌভাগ্যবান নেক সন্তান দান করেছেন। যাঁকে পরবর্তীতে নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদা দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ ঈসা বিন মারয়ামকে শৈশবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ দিয়েছেন। যৌবনে নবুয়্যত ও আলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ ছিল তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে যে কোন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারতেন। যে রোগের চিকিৎসা তৎকালীন সময়ে কারো জানা ছিল না। তিনি শুধু রোগীকে একথা বলতেন যে খবরদার কখনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়োনা। নতুবা আবার রোগ দেখা দিবে। এতে বুঝা যাচ্ছে পাপ কাজের ফলে মানুষের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়।

প্রথম থেকে ইহুদী ধর্মের সাথে খৃষ্ট ধর্মের বিরোধ দেখা দিল। কেননা ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের খোদায়ী বিধান বদ্‌লে দিয়েছিল। হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে ফত্‌ওয়া জারী করেছিল। ঈসার ইন্‌জীল কিতাব এ তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিল। এবং তাদেরকে খোদার বিধান ও শাস্তির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটাই ছিল তাদের শত্রুতার মূল কারণ। তারা ঈসাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্ ঈসা মসীহকে হেফাজতের জন্য সব রকম বন্দোবস্ত করলেন। তিনি তাঁর সাথী হাওয়ারীদের থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তাদের মধ্যে একজন ঈসার সাথে গাদ্দারী করলো। সে শত্রুদেরকে ঈসার অবস্থানের

সন্ধান জানিয়ে দিল। তারা ইসার আকৃতির এক লোককে ঈসা ভেবে শুলে চড়িয়ে দিয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল ঈসা (আঃ) শুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। কুরআন একথার প্রতিবাদ করে বলছে যে আল্লাহ্ ঈসাকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি না শহীদ হয়েছেন না শুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কেয়ামতের পূর্বে তিনি আবার আসবেন। এটা আল্লাহর মাছলাহত ও ইচ্ছে অনুযায়ী হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হলো তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের উপর। মুমিন গায়েবের উপর ঈমান রাখবে আর আল্লার হুকুমের তাবেদারী করবে। তাঁর রেজামন্দিমত চলবে। ইসলামে আমানত-দ্বিয়ানত ও ঈমানদারীর শিক্ষা সর্বাগ্রে। খেয়ানত-ওয়াদাভঙ্গ এবং বেঈমানী কুরআনী শিক্ষার বিপরীত শয়তানী কাজ। মুমিন কখনো খেয়ানত করতে পারে না। না সে ওয়াদা ভাংবে না বেঈমানী করবে।

মুমিনের ২য় বৈশিষ্ট হলো সে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করবে, কথায় কাজে সত্যবাদী হবে। কুরআনী শিক্ষা হলো ইসলামী সমাজ ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাতে মানুষ দুনিয়া আখেরাতে কামিয়াব হবে। সুরায়ে বাকারার লম্বা আয়াতে দ্বীনের আরকান বা ভিত্তিসমূহ আলোচিত হয়েছে। সূরায়ে আল ইমরানের আয়াতে ইসলামের ব্যবহারিক জীবন-প্রণালী ও ইসলামী আইনের বর্ণনা আছে। যাতে পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবি ফুটে উঠে।

খোদার দ্বীন ইসলামের চেয়ে আর উত্তম কোন সমাজ ব্যবস্থা ভাল কোন শিক্ষা পৃথিবীর কোন মতবাদ দিতে পারেনি। এ মহাবিশ্বের দৃশ্যমান খোদায়ী কুদরতের দিকে তাকাও। এ চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র, আসমান, জমীন, বৃষ্টি বাদল, মেঘ-বিজলী, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, ঋতু চক্রের ঘূর্ণন সব কিছুই ইচ্ছায় অনিচ্ছাই আল্লাহ্র হুকুম মত পরিচালিত হচ্ছে।

যেসব মানুষ স্বীয় ইচ্ছার তাবেদারী করে। কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব মেনে নেয়– তাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। যে সব মানুষ ঈমান আনলো, আবার কাফের মুশরেক হয়ে গেলো– তাদের উপরও আল্লাহ্র লা'নত।

চতুর্থ পারা শুরু হচ্ছে। নেক আর ভাল কাজের ধারণা দ্বীন ইসলামে নামাজ পড়া, রোজা রাখার মধ্যেই সীমিত নয়। নেক ও ভাল কোন কাজই ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার প্রিয় জিনিস আল্লার রাস্তায় খরচ না করবে। আল্লাহ্ তো সব কিছুই জানেন দেখেন। আল্লার নামে হালাল, জিনিস ব্যয় কর। তোমরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকো। তোমাদের নিকট অবিকৃত আল্লাহ্র বাণী কুরআন আছে; কুরআন শিক্ষার তোমরাই বিশ্বস্ত বাহক। অথচ তোমরাই অমুসলিমদের মত চলো। শিরক আর কুফরের কাজ কর; ধর্মকে তোমরা দুভাগে বিভক্ত করে নিয়েছ। সামাজিক জীবনে ইসলামবিরোধী নিয়ম-কানুন মেনে চলেছ। আর নামমাত্র রোজা ও হজ্বের মত ইবাদতে আচার অনুষ্ঠানে ধর্মীয় রীতি পালন করছ। এই দ্বৈতনীতি ছেড়ে দাও। ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ কর। দ্বীনকেই জীবনের সার্বিক গাইড বানাও। আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। আল্লাহ্র রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর। নিজেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা কর। আল্লাহ্ বিভেদ ও মুনাফেকী পছন্দ করেন না।

হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই যাকে শ্রেষ্ঠ উম্মাত বলা যাবে। সৎ কাজের উৎসাহ যোগাবে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লার বিধান শুনবে। নবীর আনুগত্য করবে।

বিভিন্ন জাতির পতনের কারণ হলো পাপে লিপ্ত হওয়া মুনাফেকী আর বিভেদ সৃষ্টি করা। তাই ইসলামী সমাজ কায়েম কর। হে মুমিন বান্দারা! তোমরা তো বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করেছ। মক্কী জীবনে নামাজ আর ছবরের শিক্ষা লাভ করেছ। রাসূলের আনুগত্যের বাইরে যাওনি। উহুদ যুদ্ধে জয় পরাজয়ে পরিণত হলো। এজন্য যে তোমাদের মধ্যে মুনাফেকী আর অনৈক্য ছিল। তোমরা গণীমত লাভের আশায় রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে তোমাদের ঘাটি ত্যাগ করেছ। মনে রেখো রাসূলের আনুগত্য বাদ দিয়ে দুনিয়া আখেরাতে তোমরা একচুল বরাবর সাফল্যও লাভ করতে পারবে না। জানের ভয়, মওতের ডর কার না হয়? কিন্তু মনে রেখো মুমিনের জানের ভয় মৃত্যুর ডর নেই। মুমিন কখনো মরে না। প্রত্যেক নফসই মৃত্যুবরণ করে। মুমিন কোন নফসের নাম নয়।

মুমিনতো নফসকে মারে, নফসকে বশ করে। নফসকে দমিয়েই তো তোমরা মুমিন হয়েছো। এখন মৃত নফসের আবার মওত কি?

আল্লাহ্ মুমিনদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে কোন নারী-পুরুষ নেকের কাজ করবে। রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য আর পরহেজগারীর জিন্দেগী অবলম্বন করবে– আল্লার নিকট তার উৎকৃষ্ট বিরাট পুরস্কার রয়েছে। জান্নাতের বাগানে সদা-সর্বদা বিদ্যমান নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

যারা ইসলামের প্রথম যুগে ঈমান এনেছে, কষ্ট সহ্য করেছে, জীবনবাজি রেখেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রথম কাতারের অগ্রগামী দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লার নিকট তাদের উত্তম পুরস্কার আছে।

হে মুমিন বান্দাগণ! কাফেরদের নিকট ধনদৌলত আর সন্তান ও ক্ষমতার আধিক্য দেখে তোমরা হতাশ হয়োনা, আফসোস করনা। এটা দুনিয়ার নেয়ামত মাত্র যা ক্ষণস্থায়ী। এতে তারা খোদাকে ভুলে গেছে।আল্লাহ্ তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য ছাড় দিয়েছেন। তোমাদের জন্য দুনিয়া থেকে উত্তম দ্বীন ও বিনিময়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের সুখের ওয়াদা আছে।

তোমরা দ্বীনের চিন্তা কর, আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ--কর। তোমাদের নিকট হিদায়েত আর নছিহতে ভরপুর কুরআন বিদ্যমান রয়েছে। তা থেকে আদর্শ গ্রহণ কর। কুরআন অধ্যয়ন কর। সকাল-বিকাল আল্লার বন্দেগী নামাজ আদায় কর। তাতে তোমরা দুনিয়াতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করবে। তোমাদের কল্যাণ ইসলামে নিহীত আছে। (আল ইমরান-১৯৮)

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র চতুর্থ রজনী

(সূরা-নিসা)

চতুর্থ পারার শেষ চতুর্থাংশ হতে পাঁচ পারার শেষ পর্যন্ত

পূর্বের তিন তারাবীহ'র তেলাওয়াতে আমরা যা জানতে পেরেছি তা হলো—

১) সূরা বাকারায় রাব্বুল আলামীন কর্তৃক মানবতা ও পশুত্বের ভিন্নতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ২) সূরা আলে ইমরানে মানুষ ও প্রবৃত্তির ভিন্নতার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সূরায় মানুষের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দিয়ে পারিবারিক বন্ধনের দিকে আহবান করা হয়েছে। এবং পরস্পর সহাবস্থানের নিয়ম, সামাজিক শিষ্টাচার ও অধিকার শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। যা মুসলমানদের একটি কর্মনীতির মর্যাদা রাখে। আদম-হাওয়ার সৃষ্টি ও উভয়ের ভালবাসা আল্লাহ্র একান্ত ইচ্ছার ফসল। উদ্দেশ্য ছিল এর দ্বারা মানব বসতির সম্প্রসারণ করা এবং পৃথিবীতে মুসলিম সমাজের ভিত্তি মজবুত করা। সন্তান ও উত্তরাধিকারী দান করার ক্ষমতা আল্লাহ্ই সংরক্ষণ করেন। এতে মানুষের কোনই শক্তি নেই। প্রত্যেক মানুষ, সমাজ ও পরিবারকে আপন সহায়-সম্পদ ও উত্তরাধিকার ত্যাগ করে রিক্ত হস্তে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়। প্রত্যেকের উত্তরাধিকার তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হয়। পবিত্র কুরআনে সম্পদ বন্টনের আহ্কাম ও নিয়ম পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-এর প্রতি যত্নবান থাকা চাই।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও অংশ হচ্ছে মহিলা সমাজ। কুরআনই সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে নারীর অধিকার ও কর্তব্যবিষয়ক বক্তব্য রেখেছে এবং তা মেনে চলার জন্য জোর তাগীদ দিয়েছে। মাতাপিতা কে রাব্বুল আলামীন সন্তানের পৃষ্ঠপোষক করে দিয়েছেন। তাদের দায়িত্ব হল সন্তানের উত্তম লালন-পালন করা এবং তাদের খোদা ও রাসূলের (সাঃ) বাণী শিক্ষা দেয়া। মাতাপিতার অনুপস্থিতিতে ইয়াতিম সন্তানের দায়িত্ব ভার কারা গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য পরিষ্কার

১৫- চরিত্রহীন পুরুষ ও নারীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। নারীদেরকে পর্দা রক্ষা করে ঘরোয়া অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর ভরণপোষণের যাবতীয় দায়িত্বভার পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণতঃ ইসলাম এক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।

শরিয়ত নির্দেশিত পথে সর্বোচ্চ চার বিবাহের অনুমতি রয়েছে। তবে এজন্য শর্ত হলো ন্যায় ইনসাফ ও নারী অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা। একাধিক বিবাহ জায়েজ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্যায় ও জুলুম থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। বিবাহ-শাদীতে তিনটি ফরজ রয়েছে (১) নারী ও পুরুষের আন্তরিক সম্মতি (২) মোহর নির্ধারিত হওয়া এবং (৩) দু'সাক্ষীর উপস্থিতি। বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপন, অবৈধ জিনা ও অবৈধ যৌনাচার হারাম।

হে মানব সকল! ধোকা ও প্রতারণার মাধ্যমে কারো সম্পদ ভোগ করোনা। এটা হারাম। পরস্পর বিনিময় ও সম্মতিক্রমে কারো সম্পদ গ্রহণ করা যেতে পারে। ধোকা, সুদ ও ঘুষ এবং উপহারের নামে অবৈধ আমদানী হারাম। আল্লাহ্ সব কিছুই দেখেন ও শুনেন।

৩২— আল্লাহ্ ঈমানদেরদের কল্যাণ প্রত্যাশী। তোমাদের উপর আল্লাহ্র দেয়া কর্তব্য হচ্ছে উত্তরাধীকারের হক যথাযথ আদায় করা এবং মাতাপিতার প্রতি যত্নবান থাকা। পুরুষ নারীর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক প্রাধান্য প্রাপ্ত। নারী ও পুরুষ উভয়েরই পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো পালনে ইন্সাফের পরিচয় দিতে হবে। অবশ্য রাব্বুল আলামীন পুরুষদের কাছে ন্যায় বিচারের চেয়ে ইন্সাফ ও ক্ষমা প্রত্যাশা করেন। নারীদের সাথে করুণা ও ভালবাসার আচরণ করা উচিৎ। যেকোন মূল্যে নারী পুরুষের এ নাজুক সম্পর্কটি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে মুরুব্বীদের দ্বারা তা নিরসন করে ফেলা উত্তম। এবং অবস্থা আয়ত্বের বাহিরে চলে গেলে খোলা অথবা তালাকের মাধ্যামে সমস্যা সমাধানের অনুমতি রয়েছে। কুরআনে এর বিস্তারিত আহ্কাম রয়েছে।

৪। হে মানব সকল! সদা আল্লাহ্কে ভয় কর। যিনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন। তোমাদের কাছে জীবন ও বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা একান্তভাবে কাম্য। আকীদা ও রুহ, শরীর ও পোষাকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের পরিচায়ক। তোমাদের ওযু ও তায়াম্মুমের নিয়ম শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকলে আল্লাহ্র রহমত ও ফিরেশতা তোমাদের সাথী হবে। সদা আল্লাহ্র জিক্র কর। সকাল ও সন্ধ্যায় জিকর ও ইবাদাত আল্লাহ্ কবুল করে থাকেন। আমানতের সংরক্ষণ করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। খেয়ানত জায়েজ নেই। বদরের মালে গণীমতে সংশ্লিষ্ট খেয়ানতকারীদের জবাবদিহী ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। হে মানব জাতি! ইন্সাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ফয়সালা করো। সত্য সমুন্নত রাখো। অপরাধীদের বাঁচাতে মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষীর আশ্রয় নিবেনা। মনে রাখবে মিথ্যা দুনিয়ার আদালতে মিথ্যা মামলা ও অবৈধ পন্থায় তোমরা

অপরাধীদের উদ্ধার করে কিছু সম্পদ অর্জন করতে পার। কিন্তু কিয়ামাতের আদালতে তোমাদের জন্য কোন সাক্ষী ও সুপারিশকারী পাবেনা। খুবই সাবধান!

হে মানব সন্তান! মৃত্যুকে ভয় করনা। সদা মৃত্যুকে স্মরণ কর। প্রত্যেকেই মরনশীল। শহীদী মৃত্যু শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মৃত্যু। পৃথিবী থেকে আখেরাতমুখী যাত্রা শুরু নামই মৃত্যু। এটা ঈমানদারের বিশ্বাস। ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি ও সন্তান বৃদ্ধিতে আল্লাহ্‌র শুকর আদায় কর। কারণ এটা তাঁরই অনুগ্রহ। এবং আল্লাহ্‌র ইবাদাতই হচ্ছে প্রকৃত শুকর। অভাব-অনটন ও বিপদে ধৈর্য্য ধারণ কর ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা কর। কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বৈ কিছুই হয় না। সময় মতো নামাজ আদায় করা ফরজ। যুদ্ধের ময়দানেও নামাজ ত্যাগ করা যাবেনা। এ সময়ে নামাজ পড়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছে। যা কুরআনের মাধ্যমে রাসূলকে (সাঃ) শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। নামাজের পাশাপাশি আল্লাহ্ মুসলমানদের কুরআনের দৌলত দান করেছেন। দিবা-নিশি কুরআন অধ্যয়ন, গবেষণা ও আমল একান্ত জরুরী। এটাই তোমাদের জন্য মুক্তির বার্তা বহন করে আনবে। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে ভুল-ত্রুটি। এর সংশোধনে কুরআনের সাহায্য নেয়া দরকার। হে মানুষ! একদিন তোমাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সকাশে আপন কৃতকর্মের বিবরণ দিতে হবে এবং তার ফয়সালা কবুল করতে হবে। হে মানুষ! মনে রেখ, নিজের অপরাধ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া ভীষণ অন্যায়। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখছেন। তাঁর আদালতে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না।

হে মানুষ! শয়তান তোমাদের চির শত্রু। তোমাদেরকে সত্যবিচ্যুত করাই তার একমাত্র কর্ম। তোমাদের অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হতে পারে। এজন্য শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা কর। এবং তাক্‌ওয়ার জীবন অবলম্বনে প্রয়াসী হও।

সূরাঃ ১২৭ নং আয়াত থেকে ১৩৫ আয়াত পর্যন্ত নারী বিষয়ক অধিকার ও আহ্‌কামের বর্ণনা রয়েছে। কুরআন ও ইসলামের যারা উপহাস করে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দাও। তাদের সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। নুতবা তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহ্‌র আজাবে আক্রান্ত হবে। (সূরা নিসা-১৪৭).

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র পঞ্চম রজনী

(সূরা নিসা ও মায়েদা)

৬ষ্ঠ পারার শুরু থেকে সপ্তম পারার চতুর্থাংশ পর্যন্ত

আয়াতের ২০ নং রুকুতে সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে—

যখন কেউ তোমাকে আর্শীবাদ করে ও সালাম দেয় তখন তুমিও অনুরূপ আচরণের মাধ্যমে আন্তরিকতার পরিচয় দান কর। আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কাউকে আক্রমণ করনা। মুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যা হারাম ও অবৈধ। হত্যার প্রতিশোধ এবং মুক্তিপণ (দিয়াত) মুসলমানদের আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার। হত্যার পরিবর্তে হত্যা করার বিধান জারি রাখতে হবে। বস্তুতঃ অন্যায় হত্যা একটি গুণাহে কবিরা অমার্জনীয় অপরাধ।

হে মুমিনগণ! তোমরা সততা ঈমান ও বিশ্বস্থতা অক্ষুণ্ন রাখবে। বিনয় ও একগ্রতা সহকারে নামাজ আদায় করবে। প্রদর্শনীর জন্য নামাজ পড়বেনা। যথাযথ হক আদায় না করে নামাজ পড়ার উপকারিতাও নেই। মুনাফিকদের নামাজ তড়িত গতিসম্পন্ন ও প্রদর্শনী পর্যন্ত হয়ে থাকে। আশা ও ভয় এবং বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তোমায় সদা লক্ষ্য করছেন। এবং তোমার বাক্য শুনছেন। নামাজতো আল্লাহ্র আদালতে হাজিরা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ্র ভয় ও ভরসাই ঈমানদারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্র সহায়তা গ্রহণ কর। মুসলমানদের বিষয়ে আল্লাহই যথেষ্টঃ (সূরা নিছা আয়াত নং ১৪৬)

সূরা মায়েদা হতে ঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। সুতরাং ধন-সম্পদ ব্যয় ও বন্টনে তোমাদের সিদ্ধান্ত নয় বরং আল্লাহর নির্দেশই প্রতিফলিত হতে হবে।

জংগে বদরলব্ধ ধন-দৌলত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং এসবের অধিকারী হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র তরে নিবেদিত হও। তাহলে সম্পদ সম্মান ও গৌরব তোমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহর পথেই অটল থাকবে। মনে রাখা উচিত দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পরীক্ষাবিশেষ। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে নিবেদিত থাকতে হবে। পার্থিব সহায় সম্পদ অর্জনে নয়। হে মুমিনগণ! তোমাদের উপকারার্থে যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য হালাল ও বৈধ সুতরাং পানাহার কর। তবে শূকর এবং তাজা রক্ত হারাম। তা বর্জন কর।

ইসলামের ইবাদত, ঈমান ও আকীদার বিষয়ে ইব্রাহিম (আঃ) একজন মডেল ও আদর্শ। পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্ব ও আল্লাহ্‌র হুকুমের সে কঠিন মুহূর্তটি সদা স্মরণযোগ্য। পিতা আপন আদরের সন্তানের গলদেশে ছুরি চালিয়ে খোদা প্রেমের ঘোষণা দিচ্ছেন। অপর দিকে রাব্বুল আলামীন প্রিয় বান্দার এ ত্যাগকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন। এবং হজ্ব ও কুরবানিকে ইব্রাহীমের ভালবাসার স্মারকরূপে ইসলামের রুকুন ও ফরজের মার্যাদা দান করছেন। উল্লেখ্য হজ্ব ও কুরবানি দুটি অতি প্রাচীন ইবাদত। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরবানি চালু ছিল। কুরবানির উদ্বোধক হচ্ছে হাবিল ও কাবিল। এরা আদমের (আঃ) দু-সন্তান। তারা নিজেদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে আল্লাহ্‌র ফয়সালা কামনা করে কুরবানি করেছিল। তৎকালে প্রচলন ছিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আপন কুরবানি আকাশের নীচে পেশ করতেন। আল্লাহ যদি এ কুরবানি কবুল করে থাকেন, তাহলে আগুন এসে কুরবানি বস্তু ভস্ম করে দিয়ে যেত। নতুবা তা এভাবেই পড়ে থাকত। ইব্রাহীমের মাধ্যমে এ নিয়ম পরিবর্তন হয়। এবং পশু জবেহ্ করার বিধান প্রবর্তিত হয়। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক ইব্রাহীম (আঃ) এর সুন্নাত ও স্মরণকে চির ভাস্বর করে রেখেছেন।

হে মানব সকল! মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাত ও তরিকার মাধ্যমে ইসলামকে আল্লাহ পরিপূর্ণতা দান করেছেন। রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক মানব জাতিকে ইসলামের সর্বশেষ সম্পদ দান করেছেন। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ্‌র শুকর আদায় কর এবং দ্বীনকে সমুন্নত রাখ। হালাল আহার কর। এবং বৈধ পন্থায় উপার্জন কর। খোদা প্রদত্ত হালাল ও হারামের তালিকার প্রতি লক্ষ্য রাখ। ইহুদীদের ন্যায় হালাল ও হারামের বিকৃত রূপ উপস্থাপন করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। রাসূলের (সাঃ) আদর্শ অনুসরণই হেদায়েত প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

হে মানব সম্প্রদায়! প্রত্যেক বিষয়ে কুরআনী নির্দেশ বাস্তবায়নে তোমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহর প্রিয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে। নফ্‌স ও প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের পরিনাম হচ্ছে জাহান্নাম। সুতরাং এটা বর্জন কর। সঠিক আকীদা ও অটল ঈমানই ঈমানদারের পরিচয়। আল্লাহর স্মরণ কাফেরদের চরম শত্রু। মসজিদের আজান কাফেরদের উপহাসের পাত্র। এ পবিত্র আহবান তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। অবৈধ উপার্জনও সুদী কারবারের সম্প্রসারণ কাফেরের কর্ম।

হে মানব! অপবিত্র ও হারাম উপার্জন হতে বিরত থাক। এর দ্বারা সমাজে বিপদজনক রোগ ও উপসর্গ দেখা দেয় এবং খোদায়ী অভিশাপ তোমাদের বেষ্টন করে নেয়। মিথ্যা কসম খাওয়া হারাম। মিথ্যা কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। দশজন অনাথ ও গরীবকে অন্ন দান অথবা বস্ত্র সরবরাহ কিংবা তিন দিন রোজা রেখে এ কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়। মদ, জুয়া, লটারী হারাম। এগুলি থেকে দুরে থাকা কর্তব্য।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র ষষ্ঠ রজনী

(সূরা আনআম)

সাত পারার প্রথম চতুর্থাংশ থেকে আট পারার অর্ধেক পর্যন্ত

কিয়ামতের দিন ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা প্রশ্ন করবেন যে ইসা! বলতো তোমাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছি? তিনি উত্তর দিবেন যে, প্রভু, আমি জানিনা। এ ব্যাপারে আপনিই অধিক জ্ঞাত। মহান আল্লাহ্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, আচ্ছা তুমি বলতে পারবে কি আমি তোমাকে কত অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলাম? তোমাকে কত শত নেয়ামতের অধিকারী করেছিলাম। তোমার মাতা মরিয়ম কেও কত নেয়ামত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাইল ও ইমরান পরিবারে তোমাদের জন্য মর্যাদার এক বিশেষ আসন সংরক্ষিত হয়েছিল? বল? তুমি কি মানব জাতিকে তাওহীদের পরিবর্তে শিরকের প্রতি আহ্বান করেছিলে? যাতে তারা আমাকে ত্যাগ করে তোমরা ও তোমার মায়ের উপাসনা শুরু করে দেয়? ইসা (আঃ) উত্তর দিবেন, পরওয়ারদেগার, আমার দাওয়াতী মিশন সম্পর্কে আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন। আমি আপনারই নির্দেশ মোতাবেক প্রেরিত কিতাব ইন্‌জিলের যাবতীয় আহ্‌কাম ও আকায়েদ তাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু তারা আমার এ আহবানে সাড়া দেয়নি। বরং এরা কুফর ও শিরক এবং ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আকড়ে ধরেছিল। হে আল্লাহ! এরা তোমারই বান্দা ও দাস। এদের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনার দৃষ্টিতে তাকাও। কেননা তুমি ক্ষমা ও দয়ার আধার। আর যদি শাস্তি দাও তাহলে এরা এর যোগ্য এবং তুমি শাস্তি বিধানকারী ও সর্বশক্তিমান।

সূরা আনআমের সূচনা

বিশাল পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। গোমরাহীর তিমিরে নিমজ্জিত পৃথিবীতে হেদায়াতের আলোক মশাল হচ্ছে পয়গামে তাওহীদ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবুয়্যত ও রিসালাতের বর্ণনা আর পয়গাম হচ্ছে আল কুরআন।

হে মানব সম্প্রদায়!

আর কতকাল কুফুরীর অন্ধকার গলিতে অবস্থান করবে? কুফুর ও শিরক বর্জন করে হেদায়াত গ্রহণে মানোনিবেশ কর। অতীতের মানবগোষ্ঠী ও বিভন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও পরিমাণ তোমরা জানতে পেরেছ। শুধু বিশ্বাসীগণ মুক্তি ও সফলতা অর্জনে সক্ষম

হয়েছে। এবং কুফুরীর শক্তি আল্লাহ্‌র কোপাণলে পড়ে ধ্বংস ছাড়া কিছুই লাভ করতে পারেনি। কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় এবং উপদেশমূলক।

১৬-তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার অসংখ্য কুদরতের প্রত্যহ দর্শক। খোদায়ী কুদরতের এ প্রদর্শনীও তোমাদেরকে দেয়া নেয়ামতের সমাহার সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করেছ কি? এ কুদরত ও নেয়ামত মহান আল্লাহ্‌র দয়া, সৃষ্টিগুণ, আহার সংস্থান ও জীবন-মৃত্যুর একচ্ছত্র ক্ষমতার বার্তা বাহক বৈ কিছুই নয়। এ সকল মুনাফিক আর্শ্চয্য প্রকৃতির মানুষ। এরা সরল অন্তর মানুষদের সত্যচ্যুত করার হীন প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। ইসলাম ও ঈমানের রাজপথ থেকে সরে দাঁড়াতে প্ররোচনা দেয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহর ইন্‌সাফের আদালতে এ মুনাফিকদের অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। সেদিন আপন পরিণাম তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হে নবী! আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও আপনার আদর্শের উপর অবিচল ব্যক্তিদের কখনো দূরে সরিয়ে দিবেন না। আপনার সংস্পর্শ পাওয়ার হকদার নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার সাহবারাই। মক্কার কুরাইশ নেতাদের সম্মান ও অন্যায় আবদার রক্ষার্থে ঈমান ও ইস্‌লামের পতাকাবাহী সাহাবাদের থেকে বিমুখ হবেন না। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রাব্বুল আলামীন মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে শাসকের আসনে বসিয়ে ক্ষমতার অধিকার অর্পণ করেন। আর কাউকে দরিদ্র ও সেবকরূপে সৃষ্টি করেছেন, এতে তাঁর অশেষ হেকমত নিহিত রয়েছে। তিনি আপন ইচ্ছা ও অভিপ্রায় পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শুকরগুজার কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দাগণ আল্লাহর একান্ত প্রত্যাশিত।

হে মানব সকল! পরস্পর সাক্ষাতে তোমরা দয়া ও সালাম বিনিময় কর। বিনিময়ে পাবে মহান আল্লাহর করুণা ও দয়া। সালামের উত্তর দেয়া আবশ্যক। গুনাহ্ ও অপরাধ করলে বিলম্ব না করে তাওবা করে নাও। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জীবন তাঁরই ইচ্ছা ও আকাংখানুযায়ী পরিচালিত হয়। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত থাকেন। আকাশ ও ভূমন্ডলের গুপ্ত বিষয়াদি আল্লাহ্‌পাকের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। গভীর সমুদ্রের তলদেশ ও সমস্ত জমীনের অভ্যন্তরে লুকায়িত জিনিসগুলিও তাঁর জ্ঞানের আওতাবহির্ভূত নয়। বৃক্ষের একটি পাতাও তাঁর নির্দেশ ব্যতীত নড়তে পারেনা এবং পড়তে পারেনা। এসব পূর্ব থেকেই 'লৌহে মাহ্‌ফুজে' লিখিত। মহান আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই তোমরা নিদ্রা যাও এবং জাগ্রত হয়ে থাকো। তাঁর ইচ্ছে হলে নিদ্রা অবস্থায়ই তোমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট জীবন রয়েছে। সময় শেষ হলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এর বিকল্প নেই। মানবজাতির মৃত্যু বিধানে নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা হচ্ছেন

আজরাইল (আঃ)। তিনি আল্লাহর হুকুম পালনে বিলম্ব করেন না। বরং তিনি হুকুম পাওয়া মাত্রই রুহ কবজ করে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেন। অতঃপর তিনি উক্ত রুহের অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহ্ তোমাদের ও সমস্ত সৃষ্টি কূলের প্রতিপালক ও মালিক। তোমরা ঈমান আনয়ন কর কিংবা কুফ্রী কর ইবাদাত কর কিংবা নাইবা কর তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। আল্লাহপাক বান্দাদের উপর অশেষ করুণাশীল ও দয়াবান। তাদের সুখ ও দুঃখের প্রতি যত্নবান। তোমরা এ খোদাকে ত্যাগ করে কিভাবে অন্যদের দ্বারস্থ হও ? গায়রুল্লাহ্কে আপন প্রয়োজন পেশ করে কোন লাভ আছে কি? এটা কি বিপরীত পথে চলা নয়? আল্লাহ্ অগাধ শক্তির অধিকারী। কুফর ও শিরকের শাস্তি হিসেবে তোমদেরকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিতে পারেন। কিংবা আকাশ হতে আজাব নাজিল করে তোমাদের সমূলে ধ্বংস করতে পারেন। রাব্বুল আলামীনের এ পরিষ্কার বক্তব্যগুলির উপর তোমারা চিন্তা কর। কুফর ও শিরক বর্জন কর। সত্য পথ অবলম্বন কর। তোমরা হিদায়াত গ্রহণ কর কিংবা বর্জন কর। রাসূল সর্বাবস্থায় দাওয়াত ও হিদায়াত প্রচার করে যাবেন। তাঁর দায়িত্ব ও মিশন হচ্ছে, রাব্বুল আলামীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়া। তিনি তোমাদের প্রহরী নন। তোমাদের আকায়েদ ও আমলের দায়িত্বশীল নন এবং শক্তি প্রয়োগকারীও নন।

৭৪। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ) সৌভাগ্যবান। তাঁর আকীদা ও ঈমান আল্লাহ্পাকের নিকট অতি পছন্দীয়। কুরআনে ইব্রাহীমের (আঃ) বাল্য জীবনের বর্ণনা রয়েছে। এক মুশরিক পরিবারে তাঁর জন্ম। এ পরিবারেই তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং যৌবনলাভ করেছেন। মূর্তি তৈরির কাজে নিয়োজিত খান্দানে বাস করেও তিনি চিন্তা করতেন যে, আল্লাহ্ এক ও দোষ ত্রুটিমুক্ত। তাই আল্লাহ্ আপন কাজের জন্য ইব্রাহীমকে নির্বাচিত করলেন এবং নিজের সৃষ্টি ক্ষমতা তার সামনে তুলে ধরলেন। তিনি কিছু পাখী বধ করে টুকরো টুকরো করেন। বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করেন অতঃপর পাখীগুলোর নাম ধরে ডাক দিলে তারা পূর্বের ন্যায় জীবন্ত অবস্থায় তাঁর কাছে ফিরে আসে। এতে ইব্রাহীমের (আঃ) ঈমান বিলগায়েব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস উন্নতি লাভ করে এবং তা 'আইনুল ইয়াকীন' তথা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও হক্কুল ইয়াকীন বা সঠিক বিশ্বাসে পরিণত হয়। তিনি মারফতে ইলাহীর মর্যাদা অর্জন করেন। পৃথিবীর রহস্য তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। ইব্রাহীম (আঃ) মারেফতের শিখরে আরোহন করেন। যেখানে বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সমস্ত আবরন দূরিভূত হয়ে যায়। রাব্বুল আলামীন নিজেই জিজ্ঞেস করেন হে বান্দা! তোমার আশা ও আকাংখা কি ? ইব্রাহীম (আঃ) দ্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন শরীক নেই। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতঃপর খোদার পথে মাতাপিতার স্নেহ ও মাতৃভূমি ত্যাগ করা ইব্রাহীমের (আঃ) কঠিন মনে হয়নি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে

করেন, মারেফতের সুউচ্চ মার্যাদা দান করেন। তারা সালিক, আরিফ, ও সুফি প্রভৃতি উপাধী লাভ করেন। সূরা আনআমের ৪১ নং আয়াত হতে ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত মহান নবী ও রাসূলদের বরকতময় আলোচনা রয়েছে। সমস্ত নবীগণ ইব্‌রাহীমি ধর্মেরই প্রচারক ছিলেন। তাঁদের থেকে মানুষ এ ধর্মই শিখেছে যা রাসূল (সঃ) মক্কাবাসীকে শেখাতে ও বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। "দ্বীনেহানীফ" বা ইব্‌রাহীমি ধর্মের জন্ম হয়েছিল মক্কায়। এ ধর্মই কাবা নির্মাণের মাধ্যমে দুনিয়ায় সর্বপ্রথম ইবাদত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) এর বংশধর মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা থেকেই এ ধর্মের আহবান করছেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শ্লোগানের মাধ্যমে মানুষকে তাঁদের পিতা ইব্‌রাহীমের ধর্মের প্রতি ডেকেছেন যা মানুষের প্রকৃত ও পৈতৃক ধর্ম। এ ধর্ম সকলের উত্তরাধীকার। যারা এ আহ্‌বান শুনেনা তারা বধির। যারা কুরআন পাঠ করেনা তারা অন্ধ। যারা রাসূল (সঃ) কে স্বীকার করে না তারা পথভ্রষ্ট ও বঞ্চিত। সকলেই নিজের কৃতকর্মের দায়িত্বশীল।

হে মানব জাতি! মনে রেখো, এ পয়গাম্বর (মুহাম্মদ) ইব্‌রাহীমি বংশের সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর যথাযোগ্য সম্মান কর। অতঃপর কোন নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবেনা। শুধু এ কুরআন নবীদের মিশন চালিয়ে যাবে। কুরআন হেদায়াত ও সৎ উপদেশের উৎস হিসেবে বিরাজমান থাকবে। অতএব, কুরআন শ্রবণ কর, বুঝতে চেষ্টা কর, এর বিধি-বিধান মেনে চল!

(১২০) দ্বীন এখন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। হে লোক সকল হালাল এবং বৈধ জবাইকৃত পশুগুলোর আহ্‌কাম তোমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। জবাইর পূর্বে আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত জানোয়ার থেকে দূরে থাক। তার গোশত খাওয়া জায়েজ নয়। শুয়োরের গোশত্ ও রক্ত হারাম। এটা খাবেনা। এ আদেশ জারির মধ্যে আল্লাহর অনেক হিকমাত রয়েছে। যা তোমরা বুঝবেনা। অপারগতা ও মৃত্যু উপক্রম ক্ষুধার্ত অবস্থায় হারাম সাময়িকভাবে হালাল হয়ে যায়। মূল্যবান জীবন রক্ষার্থে তা থেকে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এ অনুমতি সময়সাপেক্ষ। আল্লাহকে ভয় করতে থাক! প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য সব ধরনের পাপাচার বর্জন কর। আল্লাহ্ সব দেখছেন। হারাম উচ্চারণ করবে না ও হারাম কর্মকান্ডে লিপ্ত হবেনা। আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে টালবাহানার প্রশ্রয় দিবেনা।

(১২৮) আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে সত্য নিরাপত্তার আলয়। কিয়ামাতের দিন সকলকে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতে হবে। এবং আপন কৃতকর্মের হিসেব ও পুর্ণাঙ্গ বিবরণ পেশ করতে হবে। আপন আকীদা বিশ্বাসের আলোকেই আমল ও কর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। ইসলামই সঠিক ও শান্তির পথরূপে বাকী থাকবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর নামে ও হুকুমে তাঁরই পথে ব্যয় কর। তোমাদের উপার্জিত সম্পদে অভাবীদের একটি

নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। এ অংশ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। সুতরাং এ অংশ তাদের অধিকারী বরাবরে পৌঁছে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব। তারা এটা নিতে আসুক বা না আসুক জাকাত সাদ্‌কাহ্ ও দান খয়রাত করতে থাক। এগুলো তোমাদের গুনাহ্ ও পাপ মিটিয়ে দিতে সহায়ক।

হে মানব সকল! আল্লাহকে ভয় করতে থাক। হালালকে হারামে ও হারামকে হালালে রূপান্তরের চেষ্টা করবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে নানা রকম নেয়ামত দান করেছেন। সব ধরণের বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। অধিক হারে পানাহার কর। এবং আল্লাহর শুকর আদায় কর। তবে হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাক।

হে পয়গম্বর (সঃ)! আপনি ঘোষণা করে দিন যে,আমার প্রভু আমাকে ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমার নামাজ ও ইবাদত, জীবন ও মৃত্যু সব আল্লাহর তরে নিবেদিত। একমাত্র আল্লাহর হুকুমানুযায়ী আমার জীবন পরিচালিত হবে। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

সূরার শেষে আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য যে আহ্‌কাম জারী করেছেন তা হলো—

(১) আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন না করা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত না করা। (২) মাতাপিতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করা (৩) দরিদ্রতার ভয়ে আপন সন্তান হত্যা না করা। (৪) জিনা বেহায়াপনা থেকে বিরত থাকা (৫) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করা। (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাত না করা কিংবা অন্যায়ভাবে তা ব্যয় না করা। (৭) ওজন ও পরিমাপে খেয়ানাত না করা (৮) ন্যায় ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করা, সত্য কথা বলা ও সত্যবাদীদের সাহায্য করা। (৯) কারো উপর জুলুম না করা ও সাধ্যাতীত কাজ না চাপানো। (১০) আল্লাহর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষা করা। আকীদা ও বিশ্বাস এবং ধারণা পরিচ্ছন্ন রাখা। পরিষ্কার ও পবিত্র জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। ভদ্র সম্ভ্রান্ত ও মার্জিত আচরণ করা। এগুলো ইসলামের নির্দেশিত জীবন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের উপর আল্লাহর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। কুরআন আল্লাহর সেরা অনুগ্রহ যা থেকে তোমরা সদা হেদায়েত ও উপদেশ পাবে। অতএব, দিন-রাত্রি কুরআন অধ্যয়ন কর এবং তা বুঝার চেষ্টা কর এবং তার আহ্‌কাম মেনে চলো।

১৬৫- প্রত্যেককেই আপন কৃতকর্মের জন্য কিয়ামতের দিন জবাবদিহী করতে হবে। তোমরা সৃষ্টিকুলের সেরা। আল্লাহ্ তোমাদেরকেই সম্মান, জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও বোধশক্তি দিয়ে অনন্যভাবে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সঃ) জীবন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শরূপে বিরাজমান। এরপরেও কিসের অপেক্ষায় তোমরা অসচেতন?

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র সপ্তম রজনী

(সূরা-আরাফ)

আট পারার অর্ধেক থেকে নয় পারার শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত

পূর্বের তারাবীতে কুরআনের তিলাওয়াত অব্যাহত রাখার নির্দেশ আমরা শুনেছি। সূরা আরাফের এ অংশেও কুরআন বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ করা হচ্ছে—

"হে মানব সকল! কুরআন পাঠ কর। তার নির্দেশিত পথে চলো। কিয়ামাতের দিন সকলকে জিজ্ঞাসার সম্মুক্ষীণ হতে হবে। 'লক্ষ্য কর! তোমরা তাদের মতো হবেনা-যাদের আল্লাহ্পাক কিতাব দান করেছেন কিন্তু তারা না সে কিতাব পড়েছে না তার বিধি বিধান মেনে চলেছে। কিতাবুল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কুফরীর আধারে বাস করার নির্মম পরিণতি তোমদের জানা। কুরআন তার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছে। খোদাদ্রোহী, ধর্মহীন জনপদগুলো পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও বিপর্যয়ের দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। আকাশ থেকে আল্লার আজাব নাফরমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তখন তাদের বাঁচার অবকাশ থাকেনা। বস্তুতঃ এরা নিজেদের উপরই অত্যাচার করে থাকে। রাব্বুল আলামীন পৃথিবীকে মানুষের আলয়ে পরিণত করেছেন। উদ্দেশ্য তারা মানবতা ও ইন্সানিয়াতের পরিচর্যা করবে। এবং শয়তানী কর্মকান্ড পরিহার করবে। আদম (আঃ) ও ইবলিসের ঘটনা তোমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। শয়তান তোমাদের চির শত্রু। সদা প্রতিশোধের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। শয়তানী প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। আল্লাহ্কে ভয় কর। শয়তানের কুমন্ত্রণায় তোমরা লোভ-লালসা প্রবৃত্তির শিকার হতে পার। যেমনিভাবে আদম ও হাওয়ার বেলায় ঘটেছে। পরিণামে তারা জান্নাতের সুখ-শান্তি ত্যাগ করে দুঃখের দুনিয়ায় আসতে বাধ্য হয়। আদম ও হাওয়ার ঘটনা থেকে তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ। মনে রাখবে, আদমের মতো তোমাদেরও স্ত্রীর প্রয়োজন রয়েছে। একাকী জীবন-যাপনের অবকাশ নেই। স্ত্রী যেমন অপরিহার্য, তেমনি সময়ে শত্রুবিশেষ। আদমের (আঃ) ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহ্কাল ক্ষণস্থায়ী। এর সৌন্দর্য ও সুখ এক মনোরম প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। পক্ষান্তরে পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। এর প্রতি তোমরা বলিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন কর। সৃষ্টির পরে আদমের (আঃ) সর্বপ্রথম পোষাকের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল লজ্জাস্থান ঢাকা। সুতরাং সতর আবৃত রাখা ও পোষাক পরিধান করা তোমদের উপর ফরজ। এবং

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত সর্বোত্তম পোষাক। কুরআন হচ্ছে মুত্তাকিনের গাইডস্বরূপ, (هدىً للمتقين) কুরআনের মিশন হলো মানুষের মাঝে তাকওয়ার অনুশীলন। মুত্তাকীগণই কুরআনের হিদায়াত লাভ করে। অবিশ্বাসীরা কুরআনের কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়। এবং এটাকে প্রকৃতির চাহিদা বলে আখ্যায়িত করে। নারী ও পুরুষের শারিরীক উত্তেজনা ও জৈবিক চাহিদা কুদরতেরই অংশ ও পূর্ব পুরুষ থেকে এর ধারাবাহিকতা রয়েছে। কিন্তু কুরআন এর সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক যৌন চাহিদা পূরণ করা যায়। পশু জগতের ন্যায় বল্গাহীন যৌন আচরণে মেতে উঠার অনুমতি নেই। আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করনা এবং বলনা যে, এটা আল্লাহর শিক্ষা। বরং সমস্যা হল যে, তোমাদের ঈমান ও আকীদা বলিষ্ঠ নয়। আখিরাতের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান মানুষের সমস্যা সমাধানে সহায়ক।

এ নশ্বর জীবনের পর অবিনশ্বর জীবন রয়েছে তথায় মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে । এবং যোগ্য প্রতিদানও সে পাবে। এ কথার বিশ্বাস রাখতে হবে। এবং আপন প্রত্যাশিত জীবন ত্যাগ করে আল্লাহর মনোনীত জীবন-যাপনে প্রায়াসী হতে হবে। রাসূলুল্লাহর (দঃ)-এর আদর্শ অনুসরণে আন্তরিক হতে হবে। তোমাদেরকে আল্লাহ অশেষ নেয়ামাত দান করেছেন। তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন পানাহার। দান করেছেন স্ত্রীর ভালবাসা ও সন্তান সন্ততির আদর সোহাগ এবং দুনিয়ার সহায় সম্পদ। ইচ্ছেমত পানাহার করো এবং মুল্যবান পোষাক পরিধান কর। মেয়েদের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য স্বর্ণ-রূপার অলংকার পরাও।

৬০- দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত ঈমানদার ও পৃথিবীবাসীর জন্য দান করা হয়েছে। ঈমানদারগণ এসব জান্নাতেও ভোগ করবে। প্রভু এ ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ। শূকরের গোশত, রক্ত, শিরক ও কুফর, ওয়াদাভঙ্গ ও খেয়ানত, চুরি ও ডাকাতি, হত্যা ও জুলুম ইত্যাদি হারাম। এগুলো বর্জন করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যুর বিধান অপরিবর্তনীয়। আখেরাতের বিধান সম্পূর্ণ ইন্‌সাফ ও ন্যায় ভিত্তিক। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং পাপীগণ জাহান্নামে অবস্থান করবে। যাদের পুণ্য ও পাপ সমান তারা "আরাফ" নামক স্থানে থাকবে। যা জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী অবস্থিত। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সাথে আরাফবাসীর কথোপকথোন ও আচরণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

জান্নাতেও মর্যাদার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। দোযখ হবে উনিশ স্তরবিশিষ্ট। প্রতিটি স্তরের জন্য একজন ফেরেশতা রয়েছে। কুরআনে সে উনিশ ফিরিশতার উল্লেখ রয়েছে। (সূরার ৩৮ নং আয়াত হতে ৫৫ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

অতঃপর হযরত নুহ (আঃ)-এর আলোচনা এসেছে। নূহ্ (আঃ)-এর গোষ্ঠীর শিরক ও কুফরীর ইতিহাস সবার চাইতে দীর্ঘ। তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। নূহ (আঃ) বদ দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, এ কাফির, মুশরিক ও অত্যাচারী জাতিকে সমূলে বিনাশ করে দাও। যাতে পৃথিবীতে এদের কোন বংশধর অবশিষ্ট থাকতে না পারে। কারণ এতে কুফর ও শিরক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা বিদ্যমান। নূহের এ ফরিয়াদ আল্লাহ পাক কবুল করেন। সে গোষ্ঠীর মুষ্ঠিমেয় মুমিন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারেনি এবং বেঁচে যাওয়া মুমিনদের দ্বারাই এ পৃথিবীতে পুনরায় মানব বসতি স্থাপিত হয়। আবারো তা মুখরিত হয় সৃষ্টির কলতানে। এজন্যই নূহের (আঃ) উপাধী হচ্ছে "দ্বিতীয় আদম আঃ"। নূহ (আঃ)-এর অবস্থা আলোচনার পর আ'দ ও সামুদ গোষ্ঠীদ্বয়ের নির্মম ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর লূত (আঃ)-এর অবাধ্য জাতির ইতিবৃত্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আকাশ থেকে বর্ষিত পাথর ও বৃষ্টি দ্বারা এ জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এমনিভাবে দাঁড়িপাল্লায় সঠিক ওজন ও সঠিক পরিমাপ খেয়ানাতের দরুন শোয়াইব (আঃ)-এর জাতি আযাবের শিকার হয়।

পরিশেষে রয়েছে মূসা ও হারুন (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনা যারা ফেরাউনের দরবারে দাওয়াত পৌঁছেছিলেন। এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক ঘটনাবলী ও উপস্থাপন করেছিলেন। যাকে ফেরাউন যাদু বলে মন্তব্য করল। বানী ইসরাঈলের অপরাধের ও পরিণামের ইতিহাস কুরআনের শুরু থেকেই আলোচিত হয়ে আসছে।

১৭৫— এক মুমিনের শিক্ষণীয় ঘটনা

আল্লাহ্র এক প্রিয় বান্দার সারা জীবন ইবাদাতে অতিবাহিত হয়েছিল। রাব্বুল আ'লামীন তাকে ইল্ম ও হিকমাত দান করেছিলেন। যার বদৌলতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। খ্যাতির তোড়ে তিনি আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে পাপাচার শুরু করে দিলেন এবং তার তাক্ওয়া ও ইবাদাত লোক দেখানো ও প্রদর্শনী সর্বস্ব হয়ে উঠলো। অহংকার ও পাপের দরুন তিনি আল্লাহ কর্তৃক মর্যাদার আসন হারিয়ে ফেললেন। তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। এবং কুকুরের ন্যায় জিব্বাহ্ লটকিয়ে চলতে থাকলেন।

১৮০— এ পৃথিবীতে মানুষের ন্যায় জ্বীন জাতিরও বসবাস রয়েছে। তারা আগুনের ফুলকি দ্বারা তৈরী এবং দৃষ্টিগোচর হয়না। আল্লাহ্ তাদের জন্য রাতকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষ ও জ্বীন উভয়ই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি। মানুষের ন্যায় জ্বীন জাতির মাঝেও বিভিন্ন আকিদা ও বিশ্বাসের গ্রুপ রয়েছে। কিয়ামাতের দিন সবাইকে একত্রিত করা হবে এবং ফয়সালা শুনিয়ে দেয়া হবে। সূরা শেষে প্রিয় নবী (সঃ)-কে নরম ও হিকমাতের মাধ্যমে দাওয়াত ও ইবাদাত চালিয়ে যাওয়ার ইরশাদ করা হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ'র অষ্টম রজনী

(সুরা-আনফাল ও তাওবা)

নয় পারার শেষ চতুর্থাংশ থেকে দশ পারার শেষ পর্যন্ত

সুরা আনফালে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গণীমত বিতরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ মালে গণীমত যা পরিশ্রম ও মেহনত ছাড়াই আল্লাহ পাক দান করেছেন তার মধ্যে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও অভাবী দরিদ্র অসহায়দের অংশও রয়েছে। মোট সম্পদের ৫/১ অংশ মিসকিনদের জন্য রেখে অবশিষ্ট ৫/৪ অংশ মুজাহিদীনগণ পাবে। তোমরা আল্লাহর তরে নিবেদিত হও। তিনি সমস্ত সহায় সম্পদ তোমাদের পদযুগলে জমা করে দিবেন। তোমরা অগাধ সম্পদের অধিকারী হবে। স্মরণে রেখো, সম্পদশালী হওয়া খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সঠিক খাতে ব্যয় করাই মূল ও পরীক্ষার বিষয়। ঈমানদারের চরম ও পরম লক্ষ্য সম্পদ অর্জন নয়, বরং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র কাম্য। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে দুঃখ ও কষ্টের সাথে সংগ্রাম করো। আল্লাহর প্রতিই তোমাদের আস্থা ও ভরসা থাকা উচিৎ। লোকবল ও জনবল নিয়ে চিন্তা করোনা। একশ কাফেরের বিরুদ্ধে ২০জন মুমিন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দ্বীনের তরে নিবেদিত নিষ্ঠাবান একশ মুজাহিদ এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করতে সক্ষম। আল্লাহর সাহায্যই শ্রেষ্ঠ। বদরের জিহাদ ছিল মুসলমানদের জন্য প্রথম ট্রেনিং স্কুল। এতে তারা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এবং ২য় ট্রেনিং স্কুল ছিল ওহুদ। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তারা পালন করেনি। ফলে এ যুদ্ধে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারলনা। বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌছেও তাদের পরাজয়ের তিক্ত স্বাধ অনুভব করতে হয়েছে। সমস্ত সফলতার উৎস হল আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ। এটা ট্রেনিং-এর ২য় শিক্ষা ছিল। ধন-সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত সম্পদে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। গর্ব ও অহংকার তাকে পেয়ে বসে। সম্পদের পাহাড় গড়া ঠিক নয়। সব সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে ধন-সম্পদ ও সন্তান ফিতনা। সদা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের প্রাণ ও ধন তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন। যুদ্ধলব্ধ মালের ৫/১ অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় হওয়া উচিত। মুসলমানদের একটি গ্রুপ সদা দ্বীনের হেফাজত ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে।

৩৮— আল্লাহর কাছে তোমাদের ক্ষুদ্র বাক্যসমূহ লিপিবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। এর উপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে তোমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়বে। অতএব, তার দেওয়া সুযোগ নষ্ট করোনা। নিজেকে সংশোধনে প্রয়াসী হও। তিনি আপন অনুগ্রহে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর নিকট জংগে বদর "ইয়াওমুল ফুরকান" বা হক ও বাতিলের মাঝে ফয়সালার দিন। যুদ্ধের সময় মুসলমানদের ঐক্য ও ইত্তেহাদ থাকবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। তাদের সাহস ও মনোবল থাকতে হবে তুঙ্গে। ময়দানে দিতে হবে অটুট ঐক্য ও দৃঢ়তার পরিচয়। কোনভাবে যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে পালানো চলবেনা। এটা আল্লাহর আইন। ঈমানদারগণই আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করে থাকেন। যুদ্ধের ময়দানে সর্বাবস্থায় যে কোন মূল্যে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশ থাকবে শিরোধার্য। এবং কোনভাবেই আল্লাহ্‌র জিকর ও স্মরণ বিস্মৃত হওয়া যাবেনা। বিপদে ধৈর্য ধারণকারী মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ সহচর হল আল্লাহ্‌পাক। আল্লাহর নেয়ামতের সাথে যারা কুফরী করে আল্লাহ্ তাদের থেকে নেয়ামত উঠিয়ে নেন। ফেরাউনের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন। মাদায়েন ও হাজরবাসীদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়েছে। এরা মুশরিক, কাফির। এবং নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হল কাফির ও মুশরিক।

৬৬—বদর যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ (দঃ) আচরণ ছিল অস্বাভাবিক। উচিৎ ছিল, ৭০ জন বন্দী কাফেরকে হত্যা করা। যেমনিভাবে ৭০ জন যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এটা ছিল তাদের প্রাপ্য প্রতিদান। কারণ তারা মক্কার মুসলমানদের সাথে কতইনা জঘণ্য ব্যাবহার করেছে। হত্যা ও অত্যাচার করে মুসলমানদের দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। তাদের সহায়-সম্পদ কুক্ষিগত করে ছেড়েছে। তাদের মুক্তি নয়। তাদের শাস্তি ছিল কতল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দিলেন। তিনি না হয়ে অন্য কেউ হলে এদের ছেড়ে দেয়ার কারণে শাস্তি ভোগ করতে হত। কিন্তু আল্লাহ্ অপার অনুগ্রহে তাঁকে এ কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রাপ্ত মাল ভোগ করা তাঁর জন্য বৈধ করেছেন। তাঁকে বলেছেনঃ বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করুন। এদের অন্তরে ঈমানের উত্তাপ রয়েছে। ভাল ব্যাবহারে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। ঈমানের অগ্রগামী দলের জন্য অশেষ মর্যাদা ও আল্লাহর সুসংবাদ রয়েছে। সূরা আনফালে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও আচরণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। সূরা তাওবাতেও তা অব্যাহত। সূরা তাওবাকে সুরা আনফালের পরিশিষ্ট ও বলা হয়। এ সূরার প্রারম্ভে বিছমিল্লাহ্ উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এতে মুনাফিক ও কাফিরদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে। এ ধরণের "জালালী সূরাতে" সাধারণতঃ বিস্‌মিল্লাহ্‌র উল্লেখ হয় না।

ইরশাদ হচ্ছে—

বদর যুদ্ধের পরে যথাসম্ভব আপন মিত্রদের সাথে কৃত চুক্তিগুলো রক্ষা করা দরকার। যারা একতরফা ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে চুক্তির মেয়াদ শেষ করার অবকাশ দাও। চুক্তির প্রতি যাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার দারকার নেই। এরা ফাসিক। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে, নামাজ ও জাকাত আদায়ে অবহেলা করেনা, জুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকে, এরা আল্লাহর পছন্দীয়। এদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর। এদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। কারো সাথে বাড়াবাড়ি করা যাবেনা। আল্লাহকে ভয় কর। তোমার কাছে আশ্রয় নেয়া মুশরিকের নিরাপত্তা দান কর। তার সাথে মার্জিত ব্যবহার কর। ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই তারা তোমাদের আপনজন। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে, অঙ্গিকার ও চুক্তিপত্র করে, আবার তা ভঙ্গ করে, এসব হতভাগাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তাদের হত্যা করে ফেলো। মুশরিক ও আহ্‌লে কিতাবের দাবি হচ্ছে, তারা বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক এবং হাজীদের সেবক, আর বায়তুল মুকাদ্দাসের রক্ষক। হাইকালের সেবক। অথচ এরা উভয় কুফর ও শিরকের পতাকা বহন করছে। আল্লাহর ঘরের প্রকৃত রক্ষক হল তারা যাদের ইমান ও আকীদা পরিচ্ছন্ন। যারা শুধু আল্লাহর উপাসনা করে এবং তাঁকেই ভয় করে। নামাজ ও জাকাত আদায় করে। ইস্‌লামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হচ্ছে বদর ও হুদায়বিয়াহ। বদরে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন এবং হুদায়বিয়াতে যুদ্ধ ব্যতীত সন্ধি করতে সক্ষম হন। অতঃপর জংগে হুনাইন। মুসলমানগণ এতে সংখ্যাধিক্য থাকায় পুলক ও গর্ব অনুভব করেন। ফলে তারা পরাজয় বরণ করেন। অতঃপর ৯ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। এদিন আল্লাহ নির্দেশ করেছেন যে, আজ থেকে মক্কা নগরী কাফির ও মুশরিক মুক্ত পবিত্র এলাকা। এ ঘোষণা কিয়ামাত পর্যন্ত বলবত থাকবে। কাফির ও মুশরিকদের ন্যায় অপবিত্র বস্তুর মক্কায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। এবং আল্লাহ মক্কাবাসীদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন।

ইয়াহুদীরা দাবী করে যে, হজরত ওযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র। আর নাসারাদের উক্তি হচ্ছে ঈসা (আঃ) ও খোদা তনয়। এ উক্তিদ্বয়ের মাধ্যমে এরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। এর ফয়সালা কিয়ামাতের দিন হবে। ইয়াহুদীও নাসারাদের একান্ত পছন্দ হচ্ছে খেয়ানাত। এদের ধর্মে খেয়ানাত জায়েজ।

তাবুক জিহাদের ঘোষণা দেয়া হলে তীব্র গরম ও প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করে মুসলমানগণ জিহাদের ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হন। কিছু সাহাবা অলসতা করে জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। তাদের ধারণা ছিল খেজুর পাকার মৌসুম আসন্ন এবং দীর্ঘ দিন জিহাদ চলবে। অতএব খেজুর কাটার পর্ব সমাপ্ত করেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা উত্তম।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র নবম রজনী

(সূরা তাওবা, ইউনুস, হুদ)

এগার পারার শুরু থেকে বার পারার এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত

হে মানব সম্প্রদায়! স্বীয় ত্রুটি ও বিচ্যুতির ব্যাপারে মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর। অধিক হারে আল্লাহর জিকির কর। জাকাত সাদকাহ ও দান খায়রাতের মাধ্যমে পাপরাশি মোচন কর। কাফির ও মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা রাসূলের (সঃ) জন্য জায়েজ নেই। যদিও তারা তাঁর নিকটাত্মীয় হোকনা কেন। এরা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু। এদের জন্য মাগফিরাত কিসের?

ইব্রাহীম (আঃ) আপন মুশরিক পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বারণ করে দেন। (তাবুক-যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায়) রাসূল কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত ও মুসলমানদের বয়কটের শিকার তিন সাহাবীকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের তাওবা ও ইসতিগফার তাঁর দরবারে গৃহীত হয়েছে। তারা আজ অভিযোগ মুক্ত। হে রাসূল (সঃ)! আপনি এসব সাহাবীদের থেকে দান সাদকা গ্রহণ করে অভাবীদের মাঝে বিতরণ করে দিন। এ দান ও সাদকাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও কল্যাণ বয়ে আনবে। বস্তুতঃ তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর মাগফিরাত ও করুণা সমগ্র মদীনাবাসীর জন্য এক পরম সম্মান ও গৌরব। হে লোক সকল। জেহাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের যাবতীয় দুঃখ ও ক্লেশ, দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ এবং তৃষ্ণা ও উপবাসের কষ্টকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নিয়েছেন। তার যোগ্য প্রতিদান তোমরা পাবে। তোমাদের আমল নামায় এ সব লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেহেরবান খোদা মুমিনদের কোন আমল নির্মূল ও নিরর্থক করেন না।

হে মানব জাতি! মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই তাঁর প্রিয় রাসূল (সঃ) কে পাঠিয়েছেন। মানব জাতির মধ্যে রাসূলের (সাঃ) ব্যক্তিত্ব সর্বচ্চো মর্যাদার অধিকারী। মুসলমানদের বেদনা ও যাতনায় রাসূল অস্থির হয়ে যান। সমগ্র রাত নামায ও দোয়ায় বিনিদ্রভাবে কাটান। তোমাদের মাগফিরাতের জন্য তাঁর অস্থিরতার সীমা নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তোমাদের বিজয় ও সফলতা কামনায় তাঁর জবান সদা ব্যস্ত থাকে। রাসূলের ন্যায় দয়দ্র হৃদয়ের পথ প্রদর্শক তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ পায়নি। তাঁর যথাযোগ্য সম্মান করা তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব। জীবনের

কিছু সরল প্রকৃতির মুসলমান মুনাফিকদের কুমন্ত্রণায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করেননি। এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট বোধ করেন এবং ইরশাদ করেন—

হে মুসলমানগণ! তোমরা ঈমান ও মনোবল হারিয়ে ফেললে নাকি? জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ছোনা কেন? তোমরা কি আল্লাহর পথে চলতে অক্ষম? দ্বীনের হিফাজত ও কুফর নির্মূলের জন্য রাসূল (সঃ) তোমাদের আহ্বান করছেন। আর তোমরা আপন নীড়ে অবস্থান করছো। দুনিয়ার সহায় সম্বল, ক্ষেত ও ফসল তোমাদের সব চেয়ে প্রিয় হয়ে গেল। যার কারণে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) নির্দেশ পালন করছনা। এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করছনা। আল্লাহ তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারো। এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের হাতে আল্লাহ্ দ্বীনের খেদমাত করিয়ে নেবেন। আল্লাহ্র হাবীবের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। স্মরণ করো। হিজরতের দিন কাফের মুশরিক গোষ্ঠী যখন রাসূলুল্লাহ্কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তখন কে তার সাহায্য করেছে? যখন রাসূল ও তাঁর সাথী অসহায় অবস্থায় মক্কা ত্যাগ করলেন এবং কাফেরদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা গুহায় আশ্রয় নেন, তখনও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত কে করেছিল? গারে সাওরে রাসূল (সঃ) আপন সাথীকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন— ভয় করনা আল্লাহ্ আমাদের সহচর। হ্যাঁ। আমিই তাদের রক্ষা করেছি। এবং এমন ভাবে সাহায্য করেছি যা তোমরা বুঝতেও পারবেনা। আল্লাহর হিকমাত অনেক বড় ও ফলপ্রসূ।

আল্লাহ্ তাবুকের ময়দানে যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিলেন। মুসলমানগণ মদীনা ফিরে আসলেন। মদীনার মুনাফিকগণ দলে দলে রাসূলের (সঃ) দরবারে এসে যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ ও কাল্পনিক অসুবিধা বর্ণনা করতে শুরু করল। হে রাসূল (সঃ) এরা অত্যন্ত ধূর্ত। এদের সাফাইর অভাব নেই। আপনি কোমলতা বশতঃ তাদের ক্ষমা করে দিবেন না। এরা মিথ্যায় পারদর্শী। মিথ্যা কসম খাওয়ায় এদের জুড়ি নেই। এদের ব্যাপারে আপনি জ্ঞাত নন, এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জ্ঞাত। এরাই গুহাতে আপনাকে ফেলে চলে এসেছিল। এদের সাথে মদীনার কিছু আনসার সাহাবী ও অলসতা বশতঃ জিহাদে অংশ নেননি। কিন্তু তাদের আকিদা ও ঈমানে কোন খুঁত ছিলনা। তাঁদের অন্তর পরিচ্ছন্ন। জিহাদে না যাওয়ায় তাঁরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। এদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হবে।

হে রাসূল (সঃ)! মুনাফিকরা "মসজিদে যেরার" নির্মাণ করেছে। তাদের আশা, আপনি উক্ত মসজিদে নামাজ আদায় করবেন। মসজিদ আল্লাহর পবিত্র ঘর। নিকাকের উপর নির্মিত মসজিদ জ্বালিয়ে দিন। আল্লাহ্ মুমিনদের প্রাণ ও ধন জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এ বিনিময় কতই না উত্তম। আল্লাহ্ নিজের দেয়া মাল ও তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এ ক্রয় তোমাদের করেছে সৌভাগ্যশীল।

(সূরা তাওবা—৯৩)

প্রতিটি স্তরে তাঁর উত্তম আদর্শ অনুসরণ তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা তোমাদের জন্য ফরজ। তাঁর অনুকরণেই আল্লাহর অনুকরণ ও সন্তুষ্টি এবং উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত। তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন পড় ও মেনে চল। প্রকৃত পক্ষে কুরআন ও রাসূলের জীবন এক ও অভিন্ন।

সূরা ইউনুস হতে—

কুরআনের পাঁচটি সূরার প্রারম্ভে 'হুরুফে মুকাত্তায়াত' রয়েছে। এ ধরণের সর্ব প্রথম সূরা হচ্ছে সূরা ইউনুস।

ইরশাদ হচ্ছে—

কুরআন হিকমাত ও জ্ঞানের পরিষ্কার বিররণদাতা আসমানী গ্রন্থ যা মক্কা বাসীদের উদ্দেশ্যে তাদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষের সামনে দিবানিশি মহান আল্লাহর লালন ক্ষমতা, সৃষ্টি শক্তি ও প্রভুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তার পরেও মানুষ তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। কুফর ও শিরকের নিকষ কালো আঁধার ভেদ করে আলোর রাজ পথে আসতে চায়না। মাটি ও পাথরের তৈরি মূর্তিগুলোর হাতে তাদের কল্যাণ ও ক্ষতি কিছুই নেই। অথচ এ নির্বোধগুলো মূর্তিগুলোর উপাসনায় ব্যস্ত। শিরকের কারণে আল্লাহ ইচ্ছে করলে এদের মৃত্তিকা চাপা দিতে পারেন। তিনি তো সত্যান্বেষীদেরকেই সঠিক পথের দিশা দান করেন। আমি মানুষদের উদ্দেশ্যে ইউনুসের (আঃ) কিস্‌সা বর্ণনা করছি যাঁর উপাধি হচ্ছে জুন্নুন তথা মাছ ওয়ালা। ইউনুস (আঃ) হযরত ইউসুফের বংশধর। রাব্বুল আলামীন তাঁকে নবুয়্যত দান করেন ও দাওয়াত-তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে এক জাতি বরাবরে প্রেরণ করেন। জাতি তার দাওয়াত কবুল করেনি। বরং শিরক কুফরী অবলম্বন করেছিল। হযরত ইউনুস (আঃ) বদ্‌দোয়া করলেন যে, হে খোদা! এদের প্রতি আযাব নাজিল কর। স্বজাতির প্রতি বিরক্ত হয়ে ও আল্লাহর আযাবের ভয়ে হযরত ইউনুস দেশ ত্যাগ করেন এবং নদীর পাড়ে এসে নৌকার অপেক্ষায় বসে থাকেন। এদিকে আল্লাহ উক্ত পথভ্রষ্ট জাতিকে হেদায়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। তারা ঈমান এনে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইসতেগ্‌ফার শুরু করে দেয় এবং পয়গম্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রাব্বুল আলামীন দয়া পরবশ হয়ে তাদের তাওবা কবুল করেন এবং আজাব নাজিল থেকে বিরত হন। ইউনুস (আঃ) নৌকাযোগে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। মাঝপথে সমুদ্রযান ঝড়ে আক্রান্ত হয়। নৌকার চালক পেরেশান হয়ে বললেন যে, এ নৌকায় মনিবের অপছন্দনীয় কোন গোলাম রয়েছে সমুদ্র তাকে নৌকাযোগে তীরে পৌছাতে ইচ্ছুক নয়। ইউনুস (আঃ) উদ্যোগী হয়ে বললেন যে আমিই সে হতভাগা গোলাম। আরোহীরা ইউনুস (আঃ)-কে নদীতে ফেলে দেন। সমুদ্রের ঢেউ তাকে উঠিয়ে নেয়। রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে মাছ তাঁকে গিলে ফেলে, এবং নদীর কুলে ছেড়ে দেয়। মাছের পেটে ইউনুস (আঃ) এর জবান প্রভুর জিক্রিরে সিক্ত ছিল।

তিনি পাঠ করছিলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ পরওয়ার দেগার, তুমি ভিন্ন উপাস্য নেই, তুমি এক ও একক এবং দোষত্রুটিমুক্ত সত্ত্বা। আমি পাপাচারী ও অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে ক্ষমা করে দিন। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে সুস্থ ও নিরাপদে স্বজাতির নিকট তিনি ফিরে আসতে সক্ষম হন। প্রত্যেক যুগে প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠী বরাবরেই আল্লাহ্ পাক রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ হিদায়াত পেতে পারে। আল্লাহ্ মানুষের সাথেই আছেন। মুমিনের কুরআন পাঠ ও জিকিরকালে রাব্বুল আলামীন তথায় উপস্থিত হন। তিনি প্রতিটি নেক আমলের স্বাক্ষী। আকাশ ও ভূমন্ডলের সব কিছুই তাঁর গোচরে রয়েছে। এবং সব কিছু 'লৌহে মাহ্ফুজে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয় ব্যক্তিদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকে না। আল্লাহর প্রতি তাঁদের রয়েছে অগাধ আস্থা ও ভরসা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে তারা সন্তুষ্ট।

আল্লাহ নূহ্ (আঃ)-এর বর্ণনা করেছেন। এবং নূহের সাথে স্বজাতির আচরণ ও ঔদ্ধত্যের পরিণামও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মূসা, হারুন (আঃ) ও ফেরাউনের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউন তাদের বিরুদ্ধে যাদুর অপবাদ রটিয়ে দিয়েছিল। এবং অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ির দরুন সে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। অন্তিম মুহূর্তে ফেরাউনের উক্তি ছিল— হে মূসা, আমি প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। রাব্বুল আলামীন তার ঈমান গ্রহণ করেননি। কিন্তু এ খোদাদ্রোহীর অন্তিম মুহূর্তের ডাক বৃথা যায়নি। আল্লাহ্ পাক তার মৃতদেহ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন। এবং অবিকৃতভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। যাতে মানুষ তার লাশ দর্শনে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহর নাম স্মরণ করার বরকতে ফেরাউনের লাশ অদ্যাবধি মিশরের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ আপন ওয়াদা পূরণ করে থাকেন। হে মানুষ! ঈমান ও ইয়াকীন শুদ্ধ কর। ইসলামের তরে নিজেকে সমর্পণ কর। তাওহীদ ছেড়ে বিন্দুমাত্র শিরক ও প্রশ্রয় দিবেনা। দুঃখ কষ্ট ও যাবতীয় মুছিবত দূর করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাঁর কাছে সাহায্য ও মাগ্ফিরাত কামনা কর। ধর্মের উপর টিকে থাকলে নিজেরই লাভ। অন্যথায় নিজেরই ক্ষতি ও ধ্বংস। রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব হল প্রভুর পয়গাম পৌঁছে দেয়া। এবং সঠিক ফয়সা-া কিয়মাতের দিন আল্লাহর আদালতেই হবে।

অতঃপর কুফর ও শিরকের নিন্দা করে সূরা হুদ শুরু হচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে—

জমিনের প্রতিটি সৃষ্টির আহার সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। প্রতিটি জীবনের অন্ন সংস্থানে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সৃষ্টি কর্তা ও প্রতিপালক। প্রত্যেকের জন্মস্থান, স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান, উপার্জন স্থল, মৃত্যুস্থান ও সামাধিস্থল ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাই ভাল জ্ঞান রাখেন। এগুলো পূর্ব নির্ধারিত এবং 'লৌহে মাহ্ফুজে' লিখিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ'র দশম রজনী

(সূরা হুদ, ইউসূফ ও রা'দ)

বার পারার এক চতুর্থাংশ থেকে তের পারার অর্ধেক পর্যন্ত তেলাওয়াত

আ'দ জাতির হেদায়াত ও নছীহতের জন্য হযরত হুদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। আ'দ জাতি অনেক সুন্দর, মজবুত ও শক্ত এবং বলবান গঠনের অধিকারী এক প্রচন্ড শক্তির অধিকারী জাতি ছিল। এ তিলাওয়াতের সম্পর্ক রয়েছে আগের দিনের তারাবীর সাথে। প্রশ্ন উঠছিল যে যখন তোমরা কুরআনকে অস্বীকার করছো এবং এটাকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে মানতে রাজী হচ্ছো না তখন তোমরা নিজেরাই কুরআনের ন্যায় একটি আয়াত বানিয়ে নিয়ে এসো না। এটা তো কখনো সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এরা বদলোক। নানা রকম মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আসে। অবশ্য জালিম এবং কাফির জাতিসমূহের স্বাভাব সব যুগেই এরকম।

৪৬- হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথেও এরকম ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর জাতি তার সাথে ধোকাবাজি করেছে। আল্লাহ্‌র নামে অনেক মিথ্যা অপরাদ দিয়েছে। অবশেষে পরিণামে তারা একবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে বানী ইসরাঈল জাতির নিকট পাঠানো হয়েছিল। তারাও বদমায়েশী করেছিল এবং নবীর সাথে বেয়াদবী করেছিল। এরপর হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আসলো হযরত হুদ (আঃ) এবং হযরত ছালেহ (আঃ) এর ঘটনা। হযরত হুদ (আঃ) এসেছিলেন আ'দ জাতির নিকট। আর হযরত ছালেহ (আঃ) এসেছিলেন ছামুদ জাতির নিকট। তাঁকে আল্লাহ্ তায়ালা উটের মোজেজা দিয়েছিলেন। জনগণ ইচ্ছা করে সেটিকে মেরে ফেলেছিল। ফলে তারা আল্লাহ্‌র গজবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বনী ইসরাইলের এসব নবীদের ঘটনা বর্ণনার পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ওরসে সন্তান জন্ম নেয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ ফেরেস্তাদের দ্বারা এ সুখবর দিয়েছিলেন যে, তাঁর ওরসে ইসহাক জন্ম গ্রহণ করবে। যিনি বনী ইসরাইল-এর ইমাম ও নেতা হবেন। লূত (আঃ)-এর জাতির নিকট আজাব দিয়ে ফেরেস্তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে তারা যেন সে সমকাম প্রিয় জাতির প্রতি পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত লূত (আঃ) এবং তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে রক্ষা করেছিলেন। সকাল হবার সাথে সাথেই পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। হযরত লূত (আঃ) এর স্ত্রীও ধ্বংস হয়েছিল।

এরপর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) এর ঘটনা রয়েছে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মাদইয়ানবাসীদের প্রতি। তারা ওজনে কারচুপি এবং বেঈমানী করতো। এ পাপের দোষে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) কে বনী ইসরাইল জাতির হেদায়াত ও নছীহতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তাঁর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল তিনি যেন বানী ইসরাঈল জাতিকে মিসরের ফেরআউনের গোলামী থেকে মুক্ত করেন। আল্লাহ্ তাকে মোজেজা দিলেন। ফেরআউন এসব মোজেজাকে যাদু বলে অবজ্ঞা করলো এবং আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে থাকলো। সেও ধ্বংস হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা অনেক বসতির অধিবাসীদের শেরেকী, কুফ্রী ও মন্দ আচরণের কারণে ধ্বংস করেছেন। এ ধরনের অনেক জনপদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আবার এমন অনেক জনপদ রয়েছে যেগুলো নিজ পাপের কারণে ধ্বংস হয়েছে কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে নেই। আল্লাহ্তায়ালা কখনো কোন জাতির প্রতি জুলুম করেন না। জাতিসমূহ নিজেরাই তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বদ-আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা সব লোকদেরকে একত্রিত করবেন। এ কিয়ামতের দিন কবে আসবে ? এটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বর্তমান সময় হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা সুযোগ। যেন মানুষ সময় আসার আগেই নিজের অবস্থা শুধরে নিতে পারে। আর আমাদেরকে কিয়ামতের আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অনেক ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাসই করে না। এ ব্যাপারে তারা সন্দিহান। হে ঈমানদারগণ! নিয়মিত নামাজ পড়ো। প্রতিদিন দুটো অবসর সময় সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পর ফজর এবং মাগরিবের নামাজ আদায় করো। দিনের মধ্যভাগে যোহরের নামাজ পড়ার, এবং রাতের প্রথম অংশে ইশার নামাজ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এটা ফরজ ইবাদত। এটা আদায় না করলে গুনাহ্ হবে এবং শাস্তি পেতে হবে। কারো জন্যই নামাজ মাফ নেই।

নিজ অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না। মানুষের উচিত সেসব লোকদেরকে হেদায়াত করা যারা ফেৎনা-ফাসাদে লিপ্ত। যারা দ্বীনদার এবং বুদ্ধিমান এটা তাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে সব লোকদের একই প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়ে তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান না যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর মর্জী মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য হোক। তিনি মানুষকে স্বাধীন চেতনা ও অধিকার দিয়েছেন যেন তারা নিজ নিজ রাস্তা নিজেরা বেছে নেয়। নিজের কর্মের দায়িত্ব নিজেই বহন করে এবং এর ফলাফলের জন্য দায়ী থাকে। তবে তিনি ওয়াদা করেছেন

যে নাফরমান ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি দোজখ পূর্ণ করবেন। অন্য নবীদের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বারবার এজন্য বর্ণিত হয়েছে যেন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি এবং যেন এতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর অন্তরে শক্তির প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দেখে-শুনে যদি আমরা সত্যের পথে অবিচল থাকি ভাল। অন্যথায় আমাদের জন্যও রয়েছে একই ধরনের আজাব। আমরা যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার না করি তাহলে দেখবো যে, আল্লাহ্ নিজেই আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্ গায়েবের খবর রাখেন। এবং সবকিছু দেখেন ও শুনেন। একথা বলে মহানবী (দঃ) কে শান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে তিনি যেন দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যান এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখেন। কেননা তিনি তো সব জানেন।

এরপর সূরা ইউসুফের কাহিনী শুরু হয়। এটা পবিত্র কুরআনের সর্বোত্তম কাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় কাহিনী। যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন যে আদর্শ মানুষ ও চরিত্র তৈরী করতে চায় তার উজ্জ্বল নমুনা। হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাঝে মানব চরিত্রের এক উন্নত আদর্শ বণী-ইসরাইলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ইহুদীদের লোক কাহিনীগুলোতে ইউসুফ জুলেখার কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে কেউ প্রকৃত ঘটনা জানতো না। ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (দঃ)-কে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে প্রচীনকালে ইউসুফ জুলেখার এক প্রসিদ্ধ কাহিনী ছিল। আপনি কি আমাদের সে কাহিনী শুনাতে পারবেন? আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে পুরো সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (দঃ) এ সূরা ইহুদীদেরকে শুনালেন এবং কাহিনী বর্ণনা করলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সংক্ষিপ্ত এবং চিত্তাকর্ষক কিন্তু এতে রয়েছে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকের সুন্দর চিত্রায়ন। স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, এবং সৎ ভাইদের ভূমিকা, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষমা, ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ, যৌবনকালের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে কাহিনী শুনুন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চার স্ত্রীর ঘরে মোট বার জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শেষ স্ত্রীর ঘরে জন্ম নেয় ইউসুফ এবং বিন ইয়ামীন। এ দু'জনের শৈশবেই তাদের মা ইন্তেকাল করেন। হযরত ইউসুফের খালা প্রথমে তাদের লালন-পালন করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) ছিলেন বাবার বেশী প্রিয়। এজন্য সৎ ভাইগণ তাকে হিংসা করতো। বয়স যখন আট-দশ বছর তখন ইউসুফ (আঃ) এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন যে আকাশের চাঁদ, সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁকে সিজ্দা করছে। ইউসুফ (আঃ) বাবার নিকট স্বপ্ন বললেন এবং এর অর্থ জানতে চাইলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ্র নবী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর হুশ-জ্ঞান ছিল এবং স্বপ্নের অর্থ বুঝতেন। তিনি ছেলেকে এ স্বপ্ন ভাইদের নিকট বলতে

বারণ করলেন। ভাইগণ ইউসুফ (আঃ)কে বাবার নিকট থেকে দূরে রাখার এবং নিজেদেরকে তাঁর নিকট প্রিয় করার পথ খুঁজতে লাগলো। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে ইউসুফ (আঃ)কে সাথে করে খেলার জন্য নিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো যে ইউসুফকে রাস্তায় যাতায়াতকারী কোন ব্যবসায়ী দলের নিকট বিক্রি করে দেবে। সে মোতাবেক ইউসুফ (আঃ) কে এক ব্যবসায়ী দলের নিকট সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিল আর মিথ্যা কান্নার অভিনয় করে ঘরে ফিরে বললো যে তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তাঁর রক্তাক্ত জামা-কাপড় রং মেখে বাবার সামনে পেশ করলো নিজেদের কথাও কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের জন্য। ইউসুফ (আঃ) বাবা ইয়াকুব (আঃ) এর খুব আদরের ছিলেন। তিনি তাঁর শোকে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ছেলে হারানোর বেদনায় কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। একজন নবী হয়ে তো তিনি মুখে আহাজারি করতে পারেন না। এ জন্য ধীরে ধীরে ধৈর্য ধারণ করলেন এবং চুপ হয়ে গেলেন। পবিত্র কুরআন তার জন্য "ছবরে জামীল" অর্থাৎ সুন্দর ছবর শব্দ ব্যবহার করেছে। ইউসুফ (আঃ) বাবা, ভাই এবং ঘর থেকে দূরে সরে গেলেন। ব্যবসায়ী দল তাঁকে মিসরের দাস বেচা কেনার বাজারে নিয়ে গেল। ইউসুফ (আঃ) ছিলেন এক সুশ্রী ও সুন্দর বালক। জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের উপকরণ তার মধ্যে ছিল। এজন্য তাঁর দাম উঠলো অনেক বেশী। সাধারণ লোক এ দাম দিয়ে তাঁকে কিনতে পারলো না। অবশ্য অনেকেই এ বেচাকেনায় শরীক হতে চেষ্টা করেছিল। অবশেষে মিসরীয় রাজ দরবারের উচ্চ পদস্থ পারিষদ আজীজে মিসর উঁচু দরে তাঁকে কিনে ঘরে নিল। স্ত্রীকে বললো তোমার জন্য এক অতি দামী উপহার নিয়ে এসেছি। আরো বললো যে আমাদের তো কোন সন্তান নেই। আমরা একে নিজেদের সন্তানের মতো লালন পালন করবো। সুতরাং একে আদর যত্নে ঘরে রাখবে। ইউসুফ (আঃ) আজীজে মিসরের ঘরে কিছু দিন বাস করার পর যৌবনে পদার্পণ করলেন। যৌবনে আল্লাহ্ তাঁর সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করে ছিলেন। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য তাঁর পরীক্ষা নেয়া। নবুয়্যত দান করার আগে তাঁকে অবশ্যই পরীক্ষায় পাস করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নজীরবিহীন রূপ ও সৌন্দর্য দিয়ে তাঁকে এক আকর্ষণীয় যুবকে পরিণত করা হয়েছিলো। জুলেখাও যুবতী এবং সুন্দরী মহিলা ছিল। তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা মেটাবার প্রয়োজন ছিল। ঘরে ছিল আরাম আয়েশের প্রচুর ব্যবস্থা, ছিল নির্জনতা এবং নজীরবিহীন সৌন্দর্যের অধিকারী এক যুবক। এ অবস্থায় যা ঘটার তাই ঘটলো। মানবিক কামনার ঢেউ খেলে উঠলো। মহিলা ইউসুফ (আঃ) কে ফুসলাতে লাগলো। লালসার নজরে তার দিকে তাকালো, তাকে কু-কাজে প্রলুব্ধ করলো এবং নিজের কাছে ডাকলো। ইউসুফ (আঃ) বিচলিত হয়ে গেলেন। তিনিও মানুষ ছিলেন। তার ভেতরও

ছিল মানবিক কামনা, বাসনা। তদুপরি ছিলেন নওজোয়ান। দু'ক্ষেত্রেই কামনার অগ্নি প্রজ্জলিত হলো। কোন বাধা বিঘ্ন কিছুই ছিল না। নিজের ঘর, আরামদায়ক শোবার কক্ষ, সুন্দরী মহিলার পক্ষ থেকে বারবার আহবান। এ অবস্থায় একজন নওজোয়ান কতটুকু নিজেকে সামাল দিতে পারে? এ অবস্থায় ইউসুফ (আঃ)-এর মনের অবস্থা কি ছিল! পবিত্র কুরআন তা সুন্দরভাবে তের পারায় শুরুতে এভাবে বর্ণনা করেছে।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (৫৩)

"আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয় আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু"। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীকার করলেন যে তিনি একজন মানুষ। তাঁরও যৌবনের কামনা-বাসনা ছিল। মহিলা তাঁকে প্রায় কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাকে কু-কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখলো। যদি তা না হতো হয়তো তিনি পাপে লিপ্ত হয়ে যেতেন। আসলে যখন ঘরের ভেতরে এসব ঘটছিলো তখন দরজার খটখট আওয়াজ হলো। ইউসুফ (আঃ) দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন। দেখলেন দরজায় দাড়িয়ে রয়েছে ঘরের মালিক, জুলেখার স্বামী আজীজে মিসর। সেখানে তারা দু'জন একা ছিল। আজীজে মিসর জিজ্ঞাসা করলো কি হচ্ছিল। জুলেখা বললো এ যুবক আমার দিকে কুমতলবে হাত বাড়িয়েছিল। আজীজ মিসরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে পালিত ছেলে কেমন করে মালিকের স্ত্রীর সাথে কুকাজ করার চিন্তা করতে পারে। কিন্তু মহিলার ছলনা এবং অভিনয় সফল হলো। ইউসুফ (আঃ) দোষী সাব্যস্ত হলেন। শাস্তি স্বরূপ তাঁকে জেল খানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেই আল্লাহর নিকট তাঁকে জেলে পাঠাবার আরজি পেশ করেছিলেন। জেলই তাঁর জন্য নিরাপদ স্থান ছিল। কেননা আজীজে মিসরের ঘরে জুলেখার কামার্ত লোলুপ দৃষ্টি হয়তো তাঁকে পাপের কাজে ফাঁসিয়ে দিতো। আল্লাহ তাঁর প্রিয় ইউসুফের সাহায্য করেছেন এবং তাঁকে জেলখানায় নিরাপদে রেখেছেন। ইতিপূর্বে মহল্লায় এ মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আজীজে মিসরের স্ত্রী এক যুবক ছেলের প্রেমে মগ্ন হয়ে গেছে। তার প্রেমের আবেদন প্রত্যাখান করায় জুলেখা সে যুবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে এবং তাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অচিরেই সে যুবক জেলে যাবে। এ কথা যখন জুলেখার কানে আসলো সে পাড়ার মহিলাদেরকে তার বাড়ীতে খাবার দাওয়াত দিল। মহিলাগণ যখন খাবার শুরু করলো এবং ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাবার মুখে তোলার প্রস্তুতি নিল ঠিক সে সময় জুলেখা পানি পান করাবার অজুহাতে ইউসুফ (আঃ)

কে সবার সামনে হাজির করলো। উপস্থিত মহিলাগণ এ রকম আশ্চর্য সুন্দর এক যুবককে সামনে দেখে বিমোহিত ও বিমুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সৌন্দর্যের আলোচ্ছটায় দিশেহারা হয়ে তারা ছুরি-কাঁটা খাবারের বদলে নিজেদের আংগুলে চালিয়ে দিল। বাহ্যিক দিক থেকে মনে হচ্ছিল যে তারা খাবার খাচ্ছিল। আসলে কিন্তু তারা ইউসুফের রূপের মোহে আবিষ্ট হয়ে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। জুলেখা যখন তাদেরকে বললো যে তোমরা খাবার ছেড়ে কি করছো অমনি সবাই লজ্জিত হয়ে বলতে লাগলো এটাতো কোন মানুষ নয় বরং ফেরেস্তা। জুলেখা তাদেরকে মানতে বাধ্য করলো যে নারী সৌন্দর্যের পাগল। নারী, প্রেম এবং সৌন্দর্য্য এক জায়গায় একত্রিত হলে তা কখনো গোপন থাকেনা বরং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা সবাই আমার বদনাম করছিলে যে আমি ইউসুফের প্রেমে পড়েছি। এখন দেখা গেল যে তোমরাও আমার দলে রয়েছ।

ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় অনেক দিন থাকলেন। জেলের ভেতরই আল্লাহ্ তাঁকে নুবুয়্যত দান করলেন এবং স্বপ্নের তাবীর বর্ণনার ক্ষমতা দিলেন। তিনি জেলের ভেতরেই দ্বীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। জেলের কয়েদীদের অনেকেই তাঁর দাওয়াত কবুল করলো। এমন কি জেলার নিজেই আল্লাহ্‌র দ্বীন গ্রহণ করলো। ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং সুনাম জেল খানার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। একদিন শাহী দরবারের দুইজন লোক সাজা পেয়ে জেলখানায় কয়েদী হয়ে আসলো। এদের একজন ছিল শাহী বাবুর্চি আর অন্যজন শরাব পান করাবার সাকী। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এ যে তারা মিসরের রাজাকে বিষ খাওয়াবার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তাদের কেসের বিচার হবার আগেই তারা দু'জনে দুটো স্বপ্ন দেখলো এবং ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করলো। বাবুর্চি যে স্বপ্ন দেখেছিল তা হলো-সে তার মাথার উপর টুকরীতে করে তৈরী খাবার রুটি নিয়ে যাচ্ছিল আর কাক সেগুলো উড়ে এসে নিয়ে যাচ্ছিল। আর 'সাকী'র স্বপ্ন ছিল এরকম-সে গাছ থেকে খেজুর এবং আংগুর পাড়ছিল এবং সেগুলো থেকে রস নিংড়িয়ে নিচ্ছিল। ইউসুফ (আঃ) বাবুর্চির স্বপ্নের অর্থ করে তাকে জানালেন যে তার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং সে নিহত হবে। আর 'সাকী'কে জানালেন যে তার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হবে না সে নির্দোষ প্রমাণিত হবে এবং পুনরায় শাহী দরবারে চাকুরীতে ফিরে যাবে। সে খুব খুশী হয়ে ইউসুফ (আঃ)-কে ধন্যবাদ জানাল এবং জিজ্ঞেস করলো সে তাঁর কোন কাজে আসবে কি-না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে জেল থেকে বের হবার পর তাঁর কাজ করে দেবে। তিনি বললেন যে রাজার নিকট জানাবে যে আমি নির্দোষ। এবং আমি যেন জেল থেকে বের হতে পারি এমন রাস্তা বের করতে চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে মিসরের রাজা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে সাতটি মোটা তাজা গরু অন্য সাতটি রোগা পাতলা গরুকে খেয়ে ফেলছে। একদিকে একটি ক্ষেতের ফসল শস্য দানায় ভরপুর, অন্যদিকে একটি ক্ষেত রয়েছে যার ফসল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং সেখানে শস্য মোটেই নেই বললেই চলে। হঠাৎ রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন তিনি তার দরবারে এ স্বপ্ন বর্ণনা করে দরবারীদের নিকট এর অর্থ জানতে চাইলেন। দরবারীগণ বললো এটা অর্থহীন একটা দুঃস্বপ্ন। এর কোন অর্থ রয়েছে বলে মনে হয় না। রাজা এ কথা মেনে নিতে পারলেন না। সদা স্বপ্নের কথা ভেবে চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। সাকী যে রাজার খুব কাছাকাছি থেকে তাকে মদ ঢেলে দিচ্ছিল সে বললো যে আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যিনি আপনার স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারবে। রাজা বললো যাও তাকে নিয়ে আস। সাকী জেলখানায় গিয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে দেখা করল এবং তাঁকে তার সাথে আসার জন্য অনুরোধ করলো। ইউসুফ (আঃ) বললেন প্রথমে আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করাও। যখন নির্দোষ হয়ে জেল থেকে খালাস পাবো তখনই আমি যাবো। কয়েদী অবস্থায় রাজার নিকট যাবো না। রাজা তাঁর কেস দ্বিতীয়বার বিচারের ব্যবস্থা করলেন। জুলেখাকে ও আনা হলো এবং সব ঘটনা জিজ্ঞাসা করা হলো। জুলেখা স্বীকার করলো যে সব দোষ তার ছিল। ইউসুফ ছিল একেবারে নির্দোষ। কখনো আমার দিকে বদ নজরে তাকায়নি। তিনি বেগুনাহ আর আমি পাপী।

স্বপ্নের অর্থ ছিল এইযে, সাত বছর খুব ভাল ফসল হবে। এর পর সাত বছর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হবে। উত্তম ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রথম সাত বছরের উদ্বৃত্ত ফসল জমা রাখতে হবে। রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরবর্তী সাত বছরের ফসল ঘাটতি পূরণ করতে হবে। রাজা তার স্বপ্নের অর্থ জানতে পারলেন। সাথে সাথে পেলেন একজন ঈমানদার, বিশ্বস্ত এবং সৎ যুবক যে তার খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবে। রাজা ইউসুফ (আঃ) কে সম্মানের সাথে বড় পদে নিয়োগ করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকজন দূর-দুরাঞ্চল থেকে শস্য কেনার জন্য মিসর আসতে লাগলো। কেনান থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইগণও শস্য কেনার জন্য সেখানে আসলো। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি। তারা যখন খাদ্য শস্য নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-'তোমাদের ঘরে অন্য কোন যুবক পুরুষ রয়েছে কি। যদি থাকে তাহলে আগামীতে তাকেও সাথে নিয়ে আসবে। তার জন্য উটের পিঠ বোঝাই করে খাদ্য শস্য দেওয়া হবে। তারা যখন বাড়ী ফিরলো তখন দেখতে পেল যে খাদ্যের থলিতে তাদের দেয়া খাদ্যের দাম ফেরৎ দেয়া হয়েছে। এ অনুগ্রহ দেখে তারা খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার তাদের সৎভাই বিন

ইয়ামীনকে সাথে নিয়ে খাদ্য-শস্য আনতে যাবার-জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো। অনেক কষ্টে বৃদ্ধ বাপকে রাজী করিয়ে বিন ইয়ামীনকে সাথে নিয়ে তারা আবার মিসর আসলো। ইউসুফ (আঃ) তাঁর আপন ছোট ভাই বিন ইয়ামীনকে চিনে ফেললেন। তাকে নিজের সাথে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সবার উত্তম মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন। অবশেষে তাদেরকে জানালেন যে তাদের হারানো ভাই ইউসুফই হলেন আজকের মিসর সরকারের বড় খাদ্য কর্মকর্তা। সবাই আনন্দিত হলো। কোলাকুলি করলো। ইউসুফ (আঃ) সবাইকে ঘরে ফেরৎ পাঠালেন এবং তাদের বৃদ্ধ বাপ এবং সৎ মা সহ সবাইকে নিয়ে মিসর আসার জন্য বলে দিলেন। এভাবে ইউসুফ (আঃ) কৈশোরে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সত্যে পরিণত হলো। মা-বাবা মিসর এসে শাহী মহলে ইউসুফের সাথে বসবাস করতে লাগলেন। ইউসুফ (আঃ) নিজ সৎ ভাইদের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। কেননা আল্লাহ্ অনুগ্রহকারী, ক্ষমাকারী। মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার কারীদেরকে ভালবাসেন। ইউসুফ (আঃ) এর সততা, আনুগত্য, সংযত যৌবন, উত্তম আচরণ, নিষ্কলুষ চরিত্র, ত্যাগ, সত্যবাদিতা ইত্যাদি ছিল এ কাহিনীর মূল উপজীব্য। ইউসুফ (আঃ) এর স্বপ্ন যে চাঁদ- সুরুজ ও এগারটি নক্ষত্র তাঁকে সিজ্‌দা করছে-এভাবে বাস্তবায়িত হলো। কেননা মা-বাবা, দশ সৎ ভাই ও এক আপন ভাই সবাই আজ তাঁর কাজে খুশী এবং তাঁর মান-সম্মান ও প্রতিপত্তিকে মেনে নিয়েছে। এটাই তাঁর কৈশোরে দেখা স্বপ্নের 'তাবীর'।

এর পর আসে ১৩ নং সূরা রা'দ। এতে রয়েছে আল্লাহ্‌র কুদরতের বহিঃপ্রকাশের উল্লেখ। সৌরজগত, চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রের এক সম্পূর্ণ আলাদা জগত এবং জীবনচক্র রয়েছে। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের গতি বজায় রেখে চলেছে। এদের দ্বারা আল্লাহ্ অনেক বড় বড় এবং সূক্ষ্ম কাজ সম্পন্ন করান। দিন থেকে রাত এবং রাত থেকে দিন বের করা, বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তন, আর মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা ও জড় পদার্থের উপর এর প্রভাব, এসব গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করেন। জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জগতের খাদ্যের ব্যবস্থা করা আল্লাহ তায়ালা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আসমান থেকে বৃষ্টি ঝরা, মেঘের আনাগোনা, বিদ্যুৎ চমকানো, বজ্রপাত হওয়া, কুয়াশা পড়া ইত্যাদি সবই আল্লার কুদরত এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের নিদর্শন। এসব কুদরতী কর্মকান্ডের ফলে পৃথিবীর বাসিন্দাগণ যে শস্য, ফসল, ফল, ফুল পায় সেগুলো আর উর্বরা জমির উৎপাদিকা শক্তি, এবং মৃত জমির আবার জীবন পাওয়া সবই আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআন এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা কে يُدَبِّرُ الْأَمْرَ বলে আখ্যায়িত করেছে। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা এবং জগতের সুসমন্বিত জীবন পদ্ধতি আল্লাহ্ তায়ালাই পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে মাটির গঠন সর্বত্র প্রায় একই রকম। আকাশ থেকে সব জায়গায় একই রকম বৃষ্টির পানি পড়ে। তবুও দেখা যায় যে এ পানি থেকেই হয় বিভিন্ন রং-এর ফুল, নানা রকম শস্য, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ফল, এদের ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ, প্রভাব, আকার, আকৃতি ও ধরণ। কুদরতের কি আশ্চর্য সৃষ্টি।

এসব ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাকের কুদরতী কারিগরীর এক অপূর্ব নিদর্শন। এসব কিছু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে তাঁর মর্জি মোতাবেক হয়ে যায়। সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন একজন নারী তার গর্ভে কি লালন ও ধারণ করছে। তার ছেলে জন্ম নেবে না মেয়ে তা তিনি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি, স্বভাব এবং ভাগ্য সব তিনিই জানেন। আল্লাহ্র নিকট কোন কিছু গোপন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্ দু'জন ফেরেস্তা তার কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া কেরামান কাতেবীন নামে দু'জন ফেরেস্তা প্রত্যেক মানুষের রোজ নামচা তৈরী করছে। তাঁরা দিনরাত মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম কথা বার্তা লিপিবদ্ধ করছে। এমন মনে করুন যে কাঁধের উপর ভিডিও ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট এবং টেপ রেকর্ডার রেখে সবকিছু সহজে রেকর্ড করে নিচ্ছে। এভাবে রেকর্ড করে আকাশে 'ই'ল্লীন' বা 'সিজ্জীন' এর ষ্টোরে জমা রাখা হয়। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখানো হবে যে তোমরা দুনিয়ায় কি কি কাজ করতে। প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধা এ দু'ফেরেস্তার ডিউটি বদল হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন মধ্য দিনের নামাজ অর্থ্যাৎ আছরের নামাজ পড়ার উপর এতোটা জোর দিয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি নিজের ভাল-মন্দ বিচার না করে মর্জি মতো জীবন যাপন করে ধ্বংস ডেকে আনে। যখন আকাশে মেঘের সাথে বিদ্যুৎ চমকায় এবং প্রচন্ড আওয়াজে বজ্রপাত ঘটে তখন চারিদিকে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে সময় ফেরেস্তারা আকাশে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ্ পাকের তাছবীহ্ পড়তে থাকে। তারা এ ভয়ে ভীত থাকে যে এ বজ্রপাতের দরুন যেন কোন মানুষ হোক না সে কাফের ও গুনাহগার ধ্বংস না হয়ে যায়-জ্বলে না যায়। আল্লাহ্ তায়ালা যখন চান তখন এ বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত দিয়ে যে কাউকে ইচ্ছা ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ্পাক সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা করে তৈরী করেছেন। তবে আল্লাহ্ তায়ালা উভয়কে হুকুম দিয়েছেন যে তোমরা মিলে-মিশে এমন অবস্থা তৈরী কর যেন এ পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বসবাসের উপযোগী হয়। উভয় এ হুকুম পালন করলো এবং বললো হে প্রভু, আমরা তোমার হুকুমের সামনে মাথা পেতে দিলাম এবং মেনে নিলাম। এ পৃথিবীতে জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরী হয়েছে এভাবেই।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র একাদশ রজনী

(সূরা রাদ, ইব্রাহিম, হিজর)

তের পারার অর্ধেক থেকে চৌদ্দ পারার শেষ চতুর্থাংশ পর্যন্ত

সূরা রা'দ এর ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। এখানে কুরআন মাজীদ বলছে৷ যেসব ব্যক্তি নিজেদের ওয়াদা পালন করে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আল্লাহ তায়ালা যেসব সম্পর্ক রক্ষা করার এবং যেসব বিধিমালা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো যথাযথভাবে রক্ষা ও পালন করে, যাদের অন্তরে সদা আল্লাহ্র ভয়-ভীতি রয়েছে, যারা নিজেদের সমস্যাগুলো ধৈর্য ও ছবরের সাথে সমাধান করে, নামাজের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নিয়মিত আদায় করে, নিজেদের ধন-সম্পদ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য খরচ করে, তাদের বিরোধীদের অভদ্র ও অন্যায় আচরণ অনুগ্রহ ও সুন্দর আচরণ দিয়ে মোকাবিলা করে— এদের জন্য আল্লাহ তায়ালা আখিরাতের সুন্দর ঠিকানা এবং মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছেন যেখানে তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। অধিকাংশ লোক এটা জানে না যে এ কুরআন মাজীদ কেমন প্রভাব, নিদর্শন ও প্রমাণসম্পন্ন কিতাব। এর প্রভাব ও আভ্যন্তরীণ শক্তি এতো প্রচন্ড যে, যদি আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করেন, তাহলে এর প্রভাবে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত সোজা দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে, কবর থেকে মৃত ব্যক্তিগণ জীবিত হয়ে উঠে সবার সাথে কথা বলতে শুরু করবে। মনে হয় এরা এসব স্বচক্ষে দেখে তারপর এ পবিত্র কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী ও তাকেই এজন্য জওয়াবদিহি করতে হবে। সর্বশেষ ফায়সালা তার কাজের ভিত্তিতেই হবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট জগতের সব কিছু আগে থেকেই "উম্মুল কিতাবে" লিখিত রয়েছে এবং তা "লৌহে মাহফুজে" সুরক্ষিত রয়েছে।

এরপর পবিত্র কুরআনের চতুর্দশ সূরা ইব্রাহিম আরম্ভ হয়। এ সূরায় বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র কুরআন "লৌহে মাহফুজের উম্মুল কুরআন" থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে যা অজ্ঞতা, কুফর ও শিরক এর অন্ধকার থেকে মানুষকে ঈমানের আলোতে নিয়ে আসে। জগতের চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় দৃশ্যাবলী মানুষের আরামপ্রিয় প্রকৃতিকে বিভ্রান্ত করে। প্রত্যেক ব্যক্তি কামনা করে যে, সে যেন কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই সহজেই নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির চাহিদা মতো জীবন-যাপন করতে পারে। এটা হলো বাঁকা পথ। জীবনকে এ পথে পরিচালিত করার জন্য মিথ্যা অজুহাত, নানারকম ওজর-আপত্তি ও নিত্য নতুন ফন্দি বের করে নিজেকে ধোকা দেয়ার জন্য সবাই সচেষ্ট থাকে। এরা নামাজ-রোজা আদায় এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগী করাকে বিরক্তিকর মনে করে। অতীতের জাতিগুলোর মধ্যেও এ কুস্বভাব বিদ্যমান ছিল। বনী ইসরাইলের অন্যায় ও অপরাধের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পবিত্র কুরআন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।

তাদের পরিণামও শুনানো হয়েছে। বিষয় ছিল মাত্র এক দফার। তাদের কাছে দাবী ছিল তারা যেন অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসপোষণ করে মুখে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবদু নেই— এ কলেমা উচ্চারণ করে। কিন্তু তারা এজন্য মোটেই তৈরি ও রাজী হলো না। উপাস্য যে একজন রয়েছে এটা তারা মানতো। বলতো যে আল্লাহ্ আছেন। তবে আল্লাহ্র শরীক এবং বিকল্প অন্য উপাস্যও রয়েছে বলে তারা মানতো। কিন্তু পবিত্র কুরআন তাগিদ দিচ্ছিল একথার উপর যে প্রথমে অস্বীকার কর অন্যসব উপাস্য ও মাবুদকে। তারপর বল যে আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। হে মানব জাতি! তোমরা জানোনা যে, কালেমা তাইয়্যেবার ভেতর কি কি বরকত ও গুনাগুণ রয়েছে এবং কি তার গুরুত্ব ও মহাত্ম! দ্বীনের ভিত্তি এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের ভিত্তির উদাহরণ হলো- যেমন একটি ছোট বীজ। দ্বীন ও ঈমানের এ বীজ মুত্তাকী লোকদের অন্তরে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে একটি বড় বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এতো বড় বৃক্ষ যে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে আকাশের সীমা পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। সাথে সাথে এর মূল মাটির ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। এর ঠাণ্ডা ছায়ায় জীবনের পথযাত্রী মুসাফির পায় অন্তরের শান্তি, দুনিয়ার প্রশান্তি, আখিরাতের আনন্দদায়ক জীবনের মজা, এবং নিদ্রার আরাম। এ বৃক্ষের ফল মোমেন বান্দাদের উপর থোকায় থোকায় ঝুলছে। আল্লাহ্র নেক বান্দাগণ নিজ কর্মের দ্বারা নিজ হাতে এ ফল এক থেকে দশ গুণ পর্যন্ত নিচ্ছে এবং জমা করছে। এই কালেমা তাইয়্যেবার উপর ঈমান ও একীনের বুনিয়াদ এবং এর উপরই জীবনের ভিত্তি। আর এতেই রয়েছে সবার নাজাতের উছিলা।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কি করেছেন ? তিনি শৈশবেই এ কলেমা তাইয়্যেবার অর্থ জেনে নিয়েছিলেন। এমন ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন যেখানে বহু সংখ্যক উপাস্য দেবতা প্রতিদিন তৈরি হতো পাথর দিয়ে। তিনি সেগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রিও করতেন। বলতেন হে মানুষ! আমার টুকরী থেকে নিজ নিজ উপাস্য দেবতাদেরকে পছন্দ করে নাও। এগুলো তোমাদের কোন কাজে আসবে না। শুধু ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য নিয়ে যেতে পার। ইব্রাহিম (আঃ) তো শুধু একজন মাত্র খোদাকে জানতে ও চিনতে চেষ্টা করেছেন। বাকী খোদাদেরকে কড়ির দামে দৈনিক বিক্রি করে ঘরে ফিরতেন। তাঁর দ্বীন ও ইমান আল্লাহ্র পছন্দ ছিল। সে যুগে একমাত্র ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ্কে চিনে ছিলেন। তিনি কলেমা তাইয়্যেবার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, তা মানতেন এবং সে মোতাবেক আমল করতেন ও জীবন-যাপন করতেন। এ কলেমা তাইয়্যেবা মানার পর তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পবিত্র কুরআন এ সব কিছু বর্ণনা করেছে। অবশেষে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ পরিচিতি ও মারেফাত অর্জন করেন। সত্য কথা, সৎ কাজ ও ঈমানের দৃঢ়তার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে জগতের ঈমাম ও নেতা বানিয়েছেন। তদুপরি তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা মক্কা শরীফে তাঁর ঘর বানিয়েছেন যেখানে ইব্রাহিম (আঃ) কালেমা তাইয়্যেবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ঘোষণা দিলেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর ছেলে ইসহাক (আঃ) এবং ইসহাকের ছেলে ইয়াকুব (আঃ) থেকে এ ওয়াদা নিয়েছেন যে তারা এ কালেমায়ে তাইয়্যেবার উপর কায়েম থাকবেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। এ

কথাও সে প্রতিশ্রুতিতে ছিল যে তাদের বংশধর বণী ইসরাইল এ ওয়াদার খেলাফ কিছু করবে না। কিন্তু তারা এ ওয়াদা রক্ষা করেনি। ফলে নবুয়্যত ও ইমামত বনী ইসমাইলের হাতে স্থানান্তরিত হলো। এ ঘরে এক নবী আসলেন এবং কালেমা তাইয়্যেবার ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। এভাবে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওয়াদার নবায়ন করলেন এবং মক্কার মরুভূমিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর আওয়াজ বুলন্দ করলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর।

এর পর সূরা হিজর শুরু হয়। প্রথমে রয়েছে الٓرٰ। এ সূরাতে আল্লাহ্র কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শণ বর্ণনা করে তাঁর একত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তবুও অবিশ্বাসীগণ এসব বিশ্বাস করে না বরং এগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চায়। এরা ইসলামী দাওয়াতের উপর অযথা ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করে এবং এ নিয়ে হাসি-তামাশা করে। পবিত্র কুরআন প্রথমেই আদম এবং শয়তানের কাহিনী বলে ঘোষণা করেছে যে, পৃথিবীতে মাত্র দুটি শক্তি কাজ করছে। আদমের কর্মপদ্ধতি হলো মানবতা, ভদ্রতা, আল্লাহর আনুগত্য, ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং লজ্জিত হওয়া আর শয়তানের পদ্ধতি হলো- আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া, অহংকার করা, ভুল ও অজ্ঞতার উপর জেদ করা, এর স্বপক্ষে অযথা তর্কে লিপ্ত হওয়া এবং সেটাকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা।

এ দু'পদ্ধতির অনুসারীগণ নিজেদের আলাদা আলাদা কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে। এ দু'পদ্ধতির পরিণাম আখিরাতে প্রকাশ্যে দেখা যাবে। সবাই নিজ নিজ কাজের ফল ভোগ করবে। যারা ছিরাতে মুস্তাকীম তথা আল্লাহর পথে, মানবতার পথে থাকবে আল্লাহ তাদের গুণাহ মাফ করার আর তাদের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের ক্ষমা করা ও গুণাহ্ মাফ করার জন্য এক অমূল্য নোছখা দান করেছেন। তা হলো সমগ্র কুরআনের নির্যাস এবং সার-সংক্ষেপ। সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফাতেহা কুরআনের শুরুতে দেয়া হয়েছে ভূমিকাস্বরূপ। এতে আল্লাহ মানুষের সামনে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহ্র দরবারে মনের বাসনা পেশ করা ও দোয়া করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এ হলো সে সাত আয়াত সম্বলিত মূল্যবান নোছখা যা হিজরতের পূর্বে জিবরাইল (আঃ) মক্কা শরীফে মহানবী (দঃ)-কে প্রায়শঃ শুনাতেন এবং প্রত্যেক নামাজের প্রতি রাকয়াতে প্রথমে এ সূরা পড়ার তাগিদ দিতেন। মহানবী (দঃ) যখন আল্লাহ্র দর্শনের জন্য তাঁর দরবারে হাজির হন তখন উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র প্রশংসায় এ সূরা তেলাওয়াত করেন। আল্লাহ এ কাজ বেশ পছন্দ করেন এবং নির্দেশ দেন যে তাঁর প্রত্যেক বান্দা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি রাক্য়াতে এ সূরা তেলাওয়াত করবে। যারা এটা নিয়মিত করবে তাদের জন্য আমি দোজখের আগুন দূর করে দেব এবং আমার রহমত ও মাগ্ফিরাতের দরজা

খুলে দেব। এটাই সূরা ফাতেহার মূল বক্তব্য। এ সূরা তেলাওয়াত করলে কবরে মৃত ব্যক্তির আজাব মাপ হয়। এ সূরা সবার মনের কামনা ও বাসনা পূরাণ করে। এ সূরা সবার নাজাতের এক অমোঘ নোছখা।

আল্লাহ্ সেসব জাতির অবস্থার এক বিশ্লেষণ এ সূরার শেষে বর্ণনা করেছেন যারা খোদার গজব ও অসন্তোষের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে একই ঘরে নবীর স্ত্রীও ভিন্ন আকীদা পোষণ করতে পারে। পুরুষের জন্য স্ত্রীর চেয়ে আপন আর কে আছে ? কিন্তু চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার কারণে কেউ সোজা রাস্তায় থাকে আর কেউ ভ্রান্ত পথে চলে যায়। এটাই ভাগ্যের ব্যাপার-তাকদীরের খেলা।

এরপর হাজ্বর জাতির কাহিনী। যাদের নামে এ সূরার নামকরণ হয়েছে। এরা ছিল বড় বড় প্রকৌশলী। পাহাড়ের গা চিরে বড় বড় খুঁটি বানিয়ে অনেক বিশাল ও সুন্দর ইমারত নির্মাণ করতো। এতো শক্তি ও মজবুত ইমারতের মধ্যে যারা বাস করতো তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। নিজের তৈরি দালান-কোঠা ধ্বংস হয়ে যাবে এ খবর তারা মোটেই জানতে পারেনি। তাদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং বে-হিসাব ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য তাদের কোন কাজেই আসেনি। খোদার গজব থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারেনি। ভূমিকম্পের আকারে যখন আল্লাহ্র গজব আসলো তখন তারা নিজেদের ঘরের ছাদের নীচে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্র নাফরমান, কাফের, মুশরেক পূঁতিদূর্গন্ধময় জীবন যাপন করে। কিন্তু আল্লাহ্র নবী এদের অবস্থা দেখে হতাশ হন না। বরং তিনি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জোরদার করেন এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

হে মানব জাতি! কিয়ামতের দিন সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ্ কিয়ামতের ওয়াদা করে রেখেছেন। সে দিনকে ভয় করো যেদিন সবার হিসাব নিকাশের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এগুলো অজানা জগতের কথা। কুরআন তোমাদেরকে এগুলো শুনাচ্ছে। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জান না। জন্মের পূর্বে তোমরা কোথায় ছিলে ? কিভাবে তোমার অস্তিত্বের উদ্ভব হলো ? কখনো কি নিজের অস্তিত্বের মূল-বীর্যের বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছ ? নিজের অস্তিত্বের রহস্যই যে জানে না— যে এক বিন্দু পানি থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে সে কিভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্বের রহস্য ভেদ করার সাহস দেখায় ? মানুষ যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও নেয়ামতের হিসাব করতে চায় তাহলে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে তবুও সে এটা গুনে শেষ করতে পারবে না। তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নেয়ামত অস্বীকার করবে। পৃথিবীতে একটু ঘুরে ফিরে দেখ-আল্লাহ্র নেয়ামত অস্বীকারকারীদের কি পরিণাম হয়েছে ? আজ তাদের কোন নাম নিশানাও নেই।

যেসব লোক আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে নানা রকম কষ্ট স্বীকার করেছে– নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাথে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। এর বদৌলতে তারা আখিরাতে অনেকগুন বেশি ছওয়াব পাবে। কেননা তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করেছে, নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করেছে। আল্লাহ্

নিশ্চয়ই তাদেরকে এর বদলায় নেকী দান করবেন। হে মানুষ! রাসূলুল্লাহ (দঃ) থেকে দ্বীনের কথা বার্তা শিখে নাও। যদি তোমরা কম জান তাহলে জ্ঞানী ও খোদাভক্ত লোকদের নিকট গিয়ে জ্ঞান অর্জন কর। তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে। পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু ও এর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে সব কিছু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে। এগুলো পড় এবং এ গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। তাহলে উপদেশ ও হেদায়েতের অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে। লোকজনের আকীদা বিশ্বাসের অনেক অদ্ভুত বিষয় রয়েছে। তাদের ঘরে যদি ছেলে জন্ম নেয় তারা খুশী হয়। আর যদি মেয়ে জন্ম নেয় তাহলে মন খারাপ হয়ে যায় এবং মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অন্যের কাছে নবজাতকের খবর গোপন করে এবং লজ্জা অনুভব করে। মেয়ে অন্যকে বিয়ে করবে এবং জামাইর ঘরে চলে যাবে ভেবে মনে মনে দুঃখিত হয়। অজ্ঞতা ও পশুত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন যখন তারা মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটির নীচে পুঁতে আসে। আল্লাহর উপর সামান্যতম ভরসা নেই। আল্লাহ্ই তো তাদেরকে ছেলে- মেয়ে দান করেন এবং তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ মানুষের জন্য উপকারী ও খাদ্য হিসেবে পশু সৃষ্টি করেছেন। পশুর দুধ শিশুদের লালন-পালনের জন্য এবং পশুর গোস্ত মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য হালাল করেছেন। তবুও তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছো না। তোমরা কেমন জ্ঞানহারা হয়েছ ? মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। মৌমাছির প্রতি তাকিয়ে দেখ। তার জ্ঞানই বা কতটুকু! মৌমাছিকে এ জ্ঞান কে দান করছে যাতে সে গাছের উঁচু ডালে এবং পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় নিজ ঘর বানায়, মৌচাক তৈরি করে যেন তা মানুষের শত্রুতার হাত থেকে নিরাপদ থাকে। এদের পারিবারিক শৃংখলা দেখ। এদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের তুলনায় এক বিস্ময়কর শৃংখলা মেনে চলে এরা। পরিবারের প্রধান যে রাণী তার কাজ শুধু ডিম দেয়া ও বাচ্চা ফুটানো। বাচ্চার লালন-পালনের দায়িত্বে রয়েছে এক ঝাঁক দাসী ও চাকরাণী। এদেরকে আল্লাহ্ এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে রানী ব্যতীত অন্য কারো সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নেই। চাকরাণী মৌমাছিগুলোর কোন জৈবিক কামনা নেই। তারা পুরুষ ও নয় এবং নারী ও নয়। মাঝামাঝি এক ধরনের লিঙ্গ এদের। এবং পুরুষ মৌমাছিদের দায়িত্ব হলো বাইরে বাইরে কাজ করা। এরা সকাল-সন্ধ্যা বাগানে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফুলের রস নিংড়িয়ে মধু সংগ্রহ করে। এরা দিন -রাত এ কাজে ব্যস্ত থাকে। এরা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার এ মধু থেকেই সেরে নেয়। তাদের পেটে যে মধু জমা থাকে তা থেকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে এবং বাকীটুকু মৌচাকে রেখে দেয়। সবার একই দায়িত্ব। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মধু তা তাদের নয় সেটা হলো মৌচাকের মাধ্যমে সবার সম্পদ। এটা সবার কাজে আসবে। সকলের প্রয়োজন মেটাবে। এটাতো হলো মৌমাছির জ্ঞান-বুদ্ধি। অন্যদিকে মানুষ যা রোজগার করে তার সবটুকু নিজেদের জন্য জমা করে রাখে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ সেটা আল্লাহর রাস্তায় ভাই- বোনদের জন্য ব্যয় করে না। বরং বলে যে এ সম্পদ একান্তই তার। কেননা সে এটা অর্জন করেছে। মানুষ কি তাহলে মৌমাছির চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেল যে এরকম চিন্তা করে ? তার উচিত মৌমাছির জ্ঞান-গরিমা ও

বুদ্ধিমতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ তাঁর কর্ম কৌশলের কেমন করে উদাহরণ দেন তা চিন্তা করার বিষয়। মানুষ যদি তার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সামান্যতম গবেষণাও করে তাহলে সে আল্লাহ্‌র এসব কুদরতী কাজকর্মে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এবং বিচিত্র নির্দশণাবলী ও আশ্চর্য রকমের তামাশা দেখতে পাবে। এ সব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজ জীবনকে সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ঢেলে সাজাতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা চোখ-কান, জ্ঞান-বুদ্ধি, স্বাস্থ্য দিয়েছেন বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ করে তাঁর কুদরতী-নিদর্শন বুঝার জন্য। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সমগ্র জীবন তার সামনে আদর্শ হিসেবে রয়েছে। এবং পবিত্র কুরআন তার হেদায়েতের জন্য এক খোলা কিতাব হিসেবে রয়েছে।

পবিত্র কুরআন বলছে- হে মানুষ! অলসতা ও গাফলতী অনেক হয়েছে। দুনিয়া ধোকার জায়গা। জীবন খুব সংক্ষিপ্ত। কিয়ামত অতি নিকটে। একদিন দুনিয়া অবশ্যই ধ্বংস হবে। নিজ নিজ হিসাব তৈরি কর। জীবনের সব ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। অপব্যয় আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। ন্যায়নীতি মেনে চলো, আল্লাহতায়ালা সব পর্যায়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সততার মাধ্যমে সুন্দরভাবে লেন-দেন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ছদকা-খয়রাত বেশী করে করো। এতে পাপ মোচনের পথ বেরিয়ে আসে। হে মানুষ! কথায় কথায় আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেয়োনা। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। এটা বড় রকমের গুনাহ্। ওয়াদা খেলাপীর সাজা থেকে বাঁচার জন্য কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হয়। যে লোক কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলে তার উদাহরণ হলো সে নারীর মতো যে দিন-রাত সূতা কেটে কেটে একটা বান্ডিল তৈরী করলো অতঃপর তা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হলো কষ্ট করে কিছু অর্জন করার পর তা নষ্ট করে ফেলা। এ ধরনের দূর্বল কাজের উদাহরণ হলো মাকড়সার জ্বালের তৈরী ঘরের ন্যায়।

হে মানুষ! তোমরা যখন কুরআন মজীদ পড়ার ইচ্ছা কর তখন সর্ব প্রথম শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। তাহলে তোমরা আল্লাহর আশ্রয়ে এসে যাবে এবং ওয়াসওয়াসা ও বাজে চিন্তা থেকে তোমাদের অন্তর মুক্ত হয়ে যাবে। আর এ জন্য পড়তে হবে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. আল্লাহর নামের রহমত ও বরকতে মোমেনের অন্তরে শান্তি ও একাগ্রতা আসে। আল্লাহই বিশ্বাসীদের আকীদা ও আমলের হেফাজতকারী। যদি নিজ অজান্তে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় এবং পাপে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে অন্তরের ভৎর্সনার আওয়াজে লজ্জিত হয়ে পড়। আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম লংঘন করার সময় মনে রাখবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন। তাহলে গুনাহ করতে নিশ্চয়ই তোমার লজ্জা হবে। আল্লাহ সব গুনাহ মাপ করেন। তোমার দ্বীন তোমার আকীদা, ইব্রাহীমী দ্বীন ও আকীদা। এটা চিরস্থায়ী দ্বীন। নামাজ; রোজা ও আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী দিয়েই তোমরা পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দুটো নেয়ামত দান করেছেন॥ধৈর্য্য এবং নামাজ। এ দুটো শক্ত করে ধারণ করো। এর মধ্যে তোমার কল্যাণ ও নাজাত রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র দ্বাদশ রজনী

(সূরা বনী ইসরাইল, কাহাফ)

চৌদ্দ পারার তিন চতুর্থাংশ থেকে পনের পারার শেষ পর্যন্ত

আগের আয়াতগুলোতে নামাজ ও ছবর এ দুই নেয়ামতের বর্ণনা ছিল। আর নামাজ হলো বিশ্বাসী মোমেনদের মিরাজস্বরূপ। এটাই সে মিরাজ যার বর্ণনা এ সূরাতে রয়েছে। আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে তাঁর দীদারের মাধ্যমে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর প্রিয় ফেরেস্তা জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন। সে মোতাবেক তিনি মহানবী (দঃ)-কে স্বাগত যানাবার জন্য রওয়ানা হলেন। সূরা হিজর-এ উল্লেখিত সাত আয়াত সম্বলিত সূরা (ফাতিহা) আল্লাহর প্রশংসাপত্র হিসেবে সাথে নেয়ার জন্য জিব্রাইল (আঃ) সুপারিশ করেন। এ সূরা বান্দাহ আজ সরাসরি আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। আল্লাহর প্রশংসা, সৃষ্টি ক্ষমতা, অনুগ্রহ, প্রভুত্ব ইত্যাদি বিষয় এ সূরাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অন্য কোন সূরায় তা এভাবে হয়নি। এ দোয়া আল্লাহ্ নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন। মিরাজের এ সফর শুরু হয় কাবা শরীফের চত্বর থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে উর্ধ্বাকাশে। এ সফরে আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে বড় বড় নিদর্শণসমূহ দেখিয়েছেন। বনী ইসরাইলের বিস্তারিত ইতিহাস পবিত্র কুরআন বর্ণনা করেছে। বনী ইসরাইলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের থেকে নবুওয়্যত ও নেতৃত্ব বনী ইসমাইলের নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ইসলামের সূর্যোদয় ঘটে। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মহানবী (দঃ) এর এ মেহমানদারী এ সত্যের বাস্তব প্রমাণ। কুরআনে মজীদের তালীম ও শিক্ষা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর শিক্ষাই। কিন্তু বনী ইসরাইল এটাকে লালন করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য মুহাম্মদ (দঃ) কে বেছে নেয়া হয়েছে। মহামহিম আল্লাহ্ তায়ালা নিজে তাঁর দরবারে ডেকে নিয়ে তাঁকে এ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। সূরা 'নাজমে' পবিত্র কুরআন এ সত্য বর্ণনা করেছে। তূর পাহাড়ে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাইলের জন্য নয়টি ফরমান দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْئَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (আমি মূসাকে নয়টি পরিষ্কার নিদর্শন বা ফরমান দিয়েছিলাম বিষয়টি বনী ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।) কিন্তু বনী ইসরাইল

এসব ফরমান ভুলে গিয়েছিলো। সূরা তাওবায় এ ফরমান সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তায়ালা মহানবী (সাঃ) কে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে তাঁর আরশ থেকে চৌদ্দটি ফরমান দিলেন এবং বললেন আপনার উম্মতের জন্য এ সওগাত নিয়ে যান এবং তাদেরকে এ সুখবরও দিয়ে দিন যে আজ থেকে তাদের অনেক মুছিবত দূর করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে এ দোয়া শিখিয়ে দিন

قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ ..... اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا-

মিরাজের দিন যে চৌদ্দটি ফরমান দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ॥

১। ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যে হবে।

২। আল্লাহর পর সবচেয়ে প্রথম অধিকার হলো মা-বাবার। তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করো, তাঁদের সেবা-যত্ন কর, এবং তাঁদেরকে কখনো কষ্ট দিওনা।

৩। গরীব আত্মীয়-স্বজন এবং অভাব গ্রস্তদেরকে আর্থিক সাহায্য কর॥তাদের অধিকার তাদের নিকট পৌঁছে দাও।

৪। অপব্যয় কর না।

৫। কৃপণতা কর না, মানুষকে 'করজে হাছানা' দিয়ে সাহায্য কর। যদি তা না পার তাহলে ভাল ব্যবহার দিয়ে তাদের মন জয় কর।

৬। ন্যায়নীতি অনুসরন কর এবং অধিকার ও কর্তব্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। আল্লাহ্ ইহ্সান তথা অনুগ্রহকে পছন্দ করেন।

৭। ব্যাভিচার, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা থেকে দূরে থাক।

৮। কোন মানুষকে হত্যা করো না।

৯। এতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। এতিমের সাথে সৎব্যবহার কর।

১০। ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর।

১১। মাপার সময় ওজনে কারচুপি করো না।

১২। অহংকার ও গর্ব করো না।

১৩। আত্মসাৎ, চুরি ও ডাকাতি করো না।

১৪। কারো পেছনে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হবে না। এবং দারিদ্রের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

এসব বিষয়ের খেয়াল রাখবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের হাত, পা, চোখ, কান, নাক, তথা শরীরের অঙ্গগুলোকে তোমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। সেগুলো তোমাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে সাক্ষী দেবে। তোমরা কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না। তোমাদের ভিডিও ফিল্ম তোমাদেরকে দেখানো হবে। তোমাদের ভিডিও ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার সব কিছুই যত্নসহকারে সংরক্ষিত আছে। মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বেহেস্ত, দোযখও সফর করেছেন। গুনাহগারদের অবস্থা তাঁকে দেখানো হয়েছে। হযরত ছালেহ (আঃ) এর উটনীকে হত্যাকারীদের অবস্থাও দেখানো হয়েছে। ঝাক্কুম ফল কিরকম তাও তাঁকে দর্শন করানো হয়েছে। এ গাছের তেতো ফলের বিষাক্ত পানি সে লোকদেরকে দোজখে পান করানো হচ্ছে। তাঁকে এ সব দেখানোর উদ্দেশ্য হলো তিনি যেন তাঁর উম্মতকে সব কিছু বলেন ও শুনান এবং তাদেরকে সেদিন সম্পর্কে সতর্ক করেন যেদিন তাদের ব্যাপারে খোদায়ী ফায়সালা শুনানো হবে। মোমেন বান্দা যখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে তখন আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি কথা হয় এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিরাজমান থাকে না কোন পর্দা। আর ইবাদতের সময় আল্লাহ্ বান্দার অনেক নিকটবর্তী হয়ে যান। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতকে তাদের নবীর নামে ডাকা হবে এবং নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। আমাদের মহানবী (দঃ) এ ক্ষেত্রে অন্য নবীদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবেন। তাঁকে বলা হয়েছে তিনি যেন নিজ উম্মতকে হেদায়াত করেন, নামাজের পাবন্দীর জন্য তাগিদ দেন। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর্যন্ত জোহর, আসরও মাগরিবের নামাজের সময় নির্ধারিত রয়েছে। আর মাগরিবের পর রয়েছে এশার নামাজ। অন্য দিকে খুব ভোরে ফজরের নামাজ তো অবশ্যই পড়তে হবে। কেননা প্রতি ভোরে ফেরেস্তাদের ডিউটি বদল হয়। তারা আল্লাহ্‌র দরবারে হাজিরী দিতে যায়। সেখান থেকে সারাদিন জনগণের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে তারা দুনিয়াতে আসে। রাতের শেষ প্রহরে যারা নামাজ পড়ে তারা ফরজ নামাজের বাইরে নফল নামাজ বেশী করে পড়ে। যারা অতিরিক্ত এ নামাজ স্বেচ্ছায় নিয়মিত বেশী বেশী করে আদায় করে তাদের মর্যাদা 'মাকামে মাহমুদ' পর্যন্ত পৌছে যায়, যা "শাফায়াতে কুবরা"র মর্যাদা। হে রাসূল! আপনি এখন হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এর জন্য প্রয়োজনীয় দুয়া আপনাকে শিখানো হয়েছে। মুসলমানদেরকে এ সুখবর শুনিয়ে দিন। লোকজন আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে এটা আল্লাহ্‌র একটা হুকুম মাত্র। এটা আল্লাহ্‌র হুকুমে আসে এবং তাঁর হুকুমে যায়। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। পবিত্র কুরআন উত্তম বিষয়বস্তু ও সুন্দরতম কাহিনী সম্বলিত হেদায়াতের উৎস হিসেবে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। এ কিতাব কিয়ামতের দিনের ভয় দেখায়, দোযখের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে, এবং মোমেন ও মুত্তাকীদের জন্য সুখবর বহন করে। প্রতিদিন এর তিলাওয়াত কর। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য রহমত ও বরকত।

এর আয়াতগুলোতে রয়েছে রোগীদের জন্য শেফা বা আরোগ্য। দূর্বলদের জন্য রয়েছে এতে জীবনের পয়গাম। সৎলোকদের জন্যে রয়েছে এ কিতাবে সব রকম সমস্যার সমাধান। আল্লাহ্‌র অনেক রকম নামাবলী রয়েছে। তাঁকে যে নামেই ডাক না কেন তোমার মুশকিল আছান হয়ে যাবে, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সব সময় নিজের অন্তর ও মুখে আল্লাহ্‌র জিকর জারী রাখ।

এ সূরার পর শুরু হয়েছে সূরা 'কাহ্‌ফ'। সূরা ইউসুফ-এর পর এটা দ্বিতীয় কাহিনী। এ সূরাতে-"আছহাবে কাহ্‌ফ', সিকান্দার জুল ক্বারনাইন, খিজির (আঃ) এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ব্যাপারে ইহুদীরা মহানবী (দঃ)-কে নানা রকম প্রশ্ন করেছিল। আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে কুরআন মজীদ-এ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। কুরআন মজীদ বলে গুহাবাসীদের কাহিনী বিচিত্র ধরনের। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে- كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا এ কাহিনী হলো হযরত মূসা (আঃ) অনুসারী কয়েকজন যুবকের। যাদের সংখ্যা ছয় কি সাত ছিল। তারা সে সময়ের কুফরী ও শেরেকী অবস্থা দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শহর থেকে দূরে গিয়ে এক গুহায় বসবাস করা শুরু করলো। সাথে ছিল তাদের কুকুর যে গুহার মুখে বসে তাদেরকে পাহারা দিত। তারা সেখানে থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও তাছবীহ্‌তে ব্যস্ত থাকতো। কখনো কখনো তাদের চোখে ঝিমানী আসতো কখনো বা ঘুম। একবার যখন তাদের ঘুম এলো তখন তা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হলো। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো তারা কতো দিন ঘুমিয়েছিল। একজন বললো-আমারা তো কালই শুয়েছিলাম। একদিন বা একদিন থেকে সামান্য কিছু বেশী সময় ঘুমিয়েছি। অথচ এ ঘুমে তারা তিনশত বছর কাটিয়েছিল। তাদের একজন বললো আমার খুধা লেগেছে। যাই শহর থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসি। অন্য একজন একটি স্বর্ণ মুদ্রা বের করে বললো যাও এটা নিয়ে শহর থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসো। তবে সাবধানে যাবে যেন কেউ আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। কেননা এতে আমাদের একাগ্রতা ও একাকীত্ব নষ্ট হবে। সে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে খাবার দাবার কিনে বিনিময়ে মুদ্রাটি দিল। দোকানদার স্বর্ণমুদ্রা দেখে অবাক হয়ে গেল। যেহেতু দেশের প্রচলিত মুদ্রা থেকে ছিল তা ভিন্ন। এ মূল্যবান মুদ্রা এ ব্যক্তি কোত্থেকে নিয়ে এল ? দোকানদার জিজ্ঞাসা করলো-ভাই তুমি কোত্থেকে এসেছো ? ঐ ব্যক্তি এ প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল এবং জিনিসপত্র দোকানে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলো। দোকানদার তার পিছু নিল। তার দেখাদেখি অন্য লোকজনও তার পেছনে দৌড়াতে লাগলো। গুহাবাসী লোকটি গুহার নিকট পৌছেই ভেতরে ঢুকে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এ যে পাহাড়ের একটি বড় পাথরের টুকরা লাফ দিয়ে এসে গুহার দরজা বন্ধ করে দিল। লোকজন দৌড়ে সেখানে এসে দেখলো কোন মানুষ নেই এবং গুহার মুখ বন্ধ। পাথরটি কেউ সরাতে পারলো না। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কেউ কেউ বলতে লাগলো এটা নেক লোকদের মাজার। এখানে একটি বোর্ড লাগিয়ে দাও যেন সহজেই চেনা যায়। না হয় এক সময় সবাই ভুলে যাবে।

এভাবে কুরআন মজীদ 'আছহাবে কাহ্ফ' এর এ অতি আশ্চর্য কাহিনী বর্ণণা করেছে। আল্লাহ চান তো মৃত্যুর দীর্ঘ দিন পরও কাউকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। এরা তিন শত বছর ঘুমিয়ে থাকার পরও ভাবলো যে মাত্র একদিন আগেই ঘুমিয়েছিল। এর মধ্যে এ সত্য নিহিত রয়েছে যে আল্লাহ স্থান ও কালের সব রকম পার্থক্যের উর্ধ্বে। তদুপরি দুনিয়াবী সময় এবং আখিরাতের সময় মোটেই এক নয়। এখানকার পঞ্চাশ হাজার বছর আখিরাতের এক দিনের সমান।

মৃত্যুর পর জীবনের এ শিক্ষণীয় ঘটনায় এ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের জওয়াব রয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা হযরত মূসা (আঃ) এবং খিজির (আঃ)-এর। আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন তিনি যেন 'মাজমাউল বাহরাইন' (দু'সমুদ্রের সংযোগস্থল) নামক স্থানে গিয়ে এক বুজুর্গ ও সাধকের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর সাথে কিছু সময় থেকে বেশ কিছু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। মূসা (আঃ)-এর কাছে ছিল সৃষ্টির পরিচালনার জ্ঞান আর সে সাধকের নিকট ছিল সৃষ্টি তত্ত্বের জ্ঞান। বুজুর্গের সাথে থেকে তিনি যেন এ জ্ঞান অর্জন করেন। বুজুর্গ ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে এক নৌকায় আরোহণ করেন। হঠাৎ খিজির (আঃ) চলন্ত নৌকায় একটি ছিদ্র করে দিলেন। নৌকায় পানি উঠতে শুরু করলো। তাঁরা দু'জনে হাত দিয়ে পানি সেচে কোন রকমে তীরে আসলেন। মূসা (আঃ)-এর মনে প্রশ্ন জাগলো কেন তিনি অযথা বিনা কারণে এ নৌকাটিকে ফুটো করে এটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলেন। আবার পথ চলতে চলতে দেখা গেল খিজির (আঃ) একটি নিরীহ ছেলেকে ধরে তার ঘাড় মটকে মেরে ফেললেন। অর্থাৎ বিনা কারণে একজন মানুষ হত্যা করলেন। মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেও কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর চলতে চলতে এক গ্রামে গিয়ে যখন পৌছিলেন তখন রাত হয়ে গেল। খিজির (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন তিনি যেন গ্রামবাসীদের নিকট থেকে কিছু খাবার চেয়ে আনেন। তাঁরা দু'জনই ছিলেন ক্ষুধার্ত। মূসা (আঃ) এক বাড়ীতে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। এক ব্যক্তি দরজা খুলে বের হয়ে আসলো কিন্তু খাবার চাওয়ার কথা শুনে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। তাঁরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটালেন। কিন্তু এ অবস্থায়ই খিজির (আঃ) বললেন চলুন এ ব্যক্তির পড়ন্ত দেয়ালটি মেরামত করে দেই। দেয়ালটি পড়ে গেলে তার খুব অসুবিধা হবে। তাঁরা দু'জন সারা রাত এ দেয়াল মেরামত করে দিল। এ সব দেখে মূসা (আঃ) অবাক হলেন। বললেন আপনি এসব কি করছেন ? আমার কিছুই বুঝে আসে না। তাই আপনার সাথে বেশীক্ষণ থাকা যাবে না। খিজির (আঃ) বললেন ঠিক আছে। আপনার পক্ষে আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আমার কার্যধারা এক রকম আর আপনার অন্য রকম। এবার শুনুন আমি কেন এ সব কাজ করেছি। নৌকাটি ছিল এক বিধবা মহিলার আয়ের একমাত্র উৎস। সে দেশের

বাদশাহ্ ছিল অত্যাচারী। যেসব নৌকা ভাল পেত খাজনা বাকীর অজুহাতে বাদশাহর লোকজন সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিত। সেজন্য আমি নৌকাটি ফুটা করে দিলাম। যেন বাদশাহর লোকজন এটা ভাল নয় বলে না নেয়। আর সে নিরীহ ছেলেটিকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল তার পরহেজগার মা-বাবাকে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ করে দেয়া। এ ছেলে বড় হয়ে ব্যাভিচারী, ডাকাত, বদমায়েশ ও হত্যাকারী হতো। অথচ তার বাবা-মা ছিল অত্যন্ত খোদাভীরু ও ভদ্র লোক। এ ছেলে জীবন্ত থাকলে তারা শান্তিতে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতে পারতো না। এ জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্র হুকুম এটাই ছিল।

আর দেয়াল মেরামতের ঘটনার পেছনে যে রহস্য ছিল তা হলো এ যে, ঐ দেয়ালের নীচে কয়েকজন এতিম শিশুর ধন-সম্পদ লুকায়িত ছিল। ঐ ঘরের মালিক ছিল এতিম শিশুদের মরহুম বাবা। বাবার ইন্তেকালের পর চাচার তত্ত্বাবধানে তারা থাকতো। চাচা ছিল জালিম ও অত্যাচারী। আপনি দেখেছেন যে, সে মুসাফিরকে খাবার দিতে অস্বীকার করে দরজা বন্ধ করে দিল। এতিম শিশুদের বাবা ইন্তেকালের আগে কিছু সম্পদ ঐ দেয়ালের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছা এ শিশুরা যখন বড় হবে, তখন যেন তারা এ সম্পদ বের করে নিজেদের অধিকারে আনতে পারে। সুতরাং তারা বড় হওয়া পর্যন্ত যেন এ সম্পদ গচ্ছিত থাকে। যদি দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে তাহলে এ সম্পদ বেরিয়ে পড়বে এবং জালিম চাচার হাতে পড়বে। সেজন্য প্রয়োজন ছিল দেয়ালটি মেরামত করার। এ কারণে আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় দেয়ালটি মেরামত করে মজবুত করার কাজটি করেছি। এসব হলো লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত ইলমে গায়েবের অংশবিশেষ যা থেকে আল্লাহ্ আমাকে সামান্য কিছু দান করেছেন। 'ইলমে গায়েব' পূর্ণভাবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না। সুতরাং আমি যে সব কাজ করেছি সেগুলো আল্লাহ্র নির্দেশেই করেছি। এ রহস্য আপনি বুঝবেন না। তাই আপনার চলার পথ আলাদা, আর আমার চলার পথ আলাদা।

বস্তুতঃ এ জগতে দু'রকমের জ্ঞান একই সাথে চলে। একটা হলো বাহ্যিক জ্ঞান যা দ্বারা প্রত্যেক কাজের পেছনে যে প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে তা বুঝা যায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্মফল, পরিণতি ইত্যাদি এ জ্ঞানের আওতাধীন। অন্যটা হলো- 'ইলমে গায়েব'। যে সব কাজের পেছনের রহস্য বুঝে আসে না সেসব কাজ এ 'ইলমে গায়েবের' আওতায় পড়ে। জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে তার পেছনে কি কারণ রয়েছে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কেউ ধরতে পারে না। যেমন অনেক সময় মানুষ বলে যে, আমার এক আত্মীয় হার্টফেল করে মারা গেছে। কিন্তু বলতে পারে না কেন হার্টফেল করলো। আসলে আল্লাহ্র হুকুমেই এ রকম হয়ে থাকে। তার হায়াত শেষ, এবং আল্লার হুকুমে তার মৃত্যু হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র ত্রয়োদশ রজনী

(সূরা কাহাফ, মারইয়াম, তোয়াহা ও আম্বিয়া)

ষোল পারার শুরু থেকে সতের পারার এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত।

সূরা কাহ্ফ-এর ধারা চলছে। সিকান্দার জুল-ক্বারনাইন-এর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন জানিয়েছে যে তিনি নেকদিল, নরম স্বভাব এবং আল্লাহ্র অনুগত বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাঁর ছিল এক বিরাট শক্তিশালী বাহিনী। অনেক দেশ জয় করেছিলেন তিনি। একবার দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে নিজ দেশ পারস্য থেকে বেরিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের অনেক অঞ্চল দখল করে অবশেষে এমন এক জাতির দেশে উপনীত হলেন যারা সূর্য পূজা করতো। তিনি যখন সেখানে পৌছলেন তখন এলাকার লোকজন সব ভয়ে পালিয়ে গেল। এরা সব গরীব ও অভাবী ছিল। ইয়াজুজ মাজুজ তাদের উপর অত্যাচার করতো-তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে যেত। তারা সিকান্দার জুল-ক্বারনাইনের নিকট একত্রিত হয়ে বলতে লাগলো জাঁহাপনা! আপনার অনেক বড় ও শক্তিশালী সেনা বাহিনী রয়েছে। আমাদেরকে এদের অত্যাচার থেকে বাঁচান। এসব অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। পাহাড়ের পেছনে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী বাস করে। রাতে পাহাড়ী পথে চুপে চুপে আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে হত্যা ও লুটতরাজে লিপ্ত হয় এবং গবাদি পশু ও শস্যাদি নিয়ে যায়। সিকান্দার বললেন তোমরা শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। আমি পাহাড়ের সব রাস্তা বন্ধ করে দেব। এ পাহাড়ের মুখে শক্ত দেয়াল তৈরী করে তাদের প্রবেশ পথ চিরতরে বন্ধ করে দেব। কেননা ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী দেয়াল টপকে যেমন আসতে পারবে না তেমনি দেয়াল ভেঙ্গেও আসতে পারবে না। লোহার মজবুত চাদর দিয়ে শক্ত দেয়াল তৈরী করে সিকান্দার নিজ দেশ পারস্যে ফিরে গেল। আল্লাহ্র যখন হুকুম হবে-তাঁর যখন মর্জি হবে তখন এ দেয়াল নিজে নিজেই ভেঙ্গে পড়বে। অথবা আল্লাহ্র যখন হুকুম হবে তখন ইয়াজুজ-মাজুজ এ দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হবে এবং যেখানে আল্লাহ্র মর্জি হবে সেখানে গিয়ে ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হবে। এভাবে যাবতীয় কুদরতী ব্যবস্থা আল্লাহর মর্জির উপর চলে। অনেক লোক এটা বুঝতে পারে না। অথচ সবকিছু আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। তিনিই ঘটনা প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং অবস্থাকে তাঁর ইচ্ছা মাফিক রূপ দেন।

এরপর সূরা 'মারয়াম" শুরু হয়েছে। ك - ه - ى - ع - ص পাঁচটা 'হুরুফে মুক্বাত্তায়াত' দিয়ে এ সূরা আরম্ভ হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তুর কিছু বিবরণ আমরা সূরা আলে ইমরানে দেখেছি। সে সূরাতে হযরত জাকারিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি

ছিলেন নিঃসন্তান। পরে আল্লাহ তাঁকে হযরত ইয়াহইয়ার মতো উত্তম সন্তানও বংশধর দান করেন। তাঁকে হযরত জাকারিয়ার পর নবুয়্যত দিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেন। হযরত ইয়াহইয়ার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা রহমতের সালাম পাঠিয়েছিলেন। হযরত ইয়াহইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার সাথে সাথে হযরত ঈসা বিন্ মারয়ামের জন্ম বৃত্তান্তও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এর আগের সূরাগুলোতে বিবি মারয়াম এবং হযরত ইসা (আঃ)-এর সম্বন্ধে বিবরণ পড়েছি। এ সাথে সাথে চতুর্থ বারের মতো হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁকেও বৃদ্ধ বয়সে হতাশ হয়ে যাবার পর সন্তান দান করা হয়েছে। যেহেতু এ তিন ঘটনা প্রায় একই রকম তাই এখানে তিনজন নবীর ঘটনাই এক সাথে বর্ণিত হয়েছে। সন্তান দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ বংশধর কার কি রকম হবে তাও আল্লাহ্ই নির্বাচন করেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে ছেলে দান করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের সন্তান হবার ব্যাপারে হতাশ হবার পর। এটা এক ধরণের পুরস্কার। আর মারয়ামকে যেভাবে হযরত ইসা (আঃ) দান করা হয়েছে সেটা ছিল আল্লাহ্র কুদরত ও হযরত ইসা (আঃ)-এর মোজেজা। আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন এবং যেভাবে চান সেভাবেই করেন। এদের সবাইকে নবুয়্যত দান করেছেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে নবী বানাবার পর সন্তান দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাঁর বয়স বেড়ে তিনি বৃদ্ধ হবার পরও কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে পড়ে ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর হতাশা দূর করে তাঁকে সন্তান দিলেন। হযরত ইসহাক জন্ম নিলেন এবং নবীও হলেন। বিবি মারয়াম ছিলেন আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীকৃত। তাঁকে স্বামী ছাড়াই সন্তান দিলেন। আবার সে সন্তানকে নবুয়্যত দিলেন। এর পর প্রথম বারের মতো হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর উল্লেখ এসেছে। তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন। এজন্য তাঁর নাম ইদ্রিস হয়েছিল। আল্লাহ্ দুইজন ফেরেস্তাকে আসমান থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন তারা ইদ্রিস (আঃ)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে। পবিত্র কুরআন সূরা বাকারায় উল্লেখ করেছে যে ওদের নাম ছিল হারুত ও মারুত। শয়তান এদেরকে বিভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সূরা বাকারায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ সেখানে ঘোষণা করেন যে আমি ইদ্রিসকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছি। তিনি সাধারণ মৃত্যুবরণ করেননি। ইসা (আঃ)-এর ন্যায় তাঁকেও জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এভাবেই দেখা যায় যে হযরত ইদ্রিস (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনার ভেতর বেশ মিল রয়েছে। আদম সন্তানদেরকে জ্ঞানও ইল্ম শিক্ষা দেবার জন্য এসেছিলেন হযরত ইদ্রিস (আঃ) এবং আরো অনেক নবী। এ ধারা বরাবরই চালু ছিল। তবে মাঝখানে যখন দীর্ঘ বিরতি পড়তো তখন মানুষ কুফরী ও শেরেকীতে জড়িয়ে পড়তো। এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে এমন এক জাতির নিকট পাঠানো হয়েছিল যারা মূর্তি পূজা করতো। তাদেরকে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবার পর নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। এরপর আসে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর যুগ।

এ সূরা শেষ হবার পর শুরু হয়েছে সূরা তোয়াহা। এ সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন - হে প্রিয় রাসূল ! আপনার অবস্থার সাথে মূসার অবস্থার অনেক মিল রয়েছে। মুসাকেও বনী ইসরাইল অনেক বিরক্ত করেছে।– বারবার মুজেজার দাবি জানিয়েছে। মুজেজা দেখার পরও তারা ইমান আনেনি। এরা আপনার নিকট ও বারবার মুজেজার দাবি জানাচ্ছে। আমি জানি এরা মুজেজা দেখেও ঈমান আনবে না। আপনি চিন্তিত ও হতাশ হবেন না। আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবেন। এ সূরায় মূসা (আঃ)-এর নবুয়্যতের কাহিনী শুনানো হয়েছে। কিভাবে তাঁকে তূর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নবুয়্যতের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, নয়টি ফরমান ও মুজেজা দেয়া হয়েছে। আর ফেরাউনের বন্দীদশা থেকে বনী ইসরাইলকে মুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শুনানো হয়েছে তাঁর জন্ম, দুধ পান, শৈশবে ফেরাউনের শাহী মহলে লালন-পালন ইত্যাদির বিস্তারিত ঘটনাবলী।

মূসা (আঃ) যৌবনে কেন মিসর থেকে পালিয়ে মাদায়েন গিয়েছিলেন? এর পেছনে কি রহস্য ছিল? সেখানে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সাথে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর মেয়েদের সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। তারা মুসা (আঃ)কে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। হযরত শোয়েব (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা হুকুম দিলেন তাঁর এক মেয়েকে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে বিয়ে দেবার জন্য এবং তাঁর হাতের লাঠি হযরত মূসা (আঃ)-কে দিয়ে দেবার জন্য। আল্লাহ্ তায়ালা শোয়েব (আঃ)-কে জানালেন যে মূসা (আঃ)-কে নবুয়্যতের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিয়ের মহরের মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছিল দশ বছর। এ মেয়াদ তিনি হযরত শোয়েব (আঃ) এর বাড়িতে কাটিয়েছেন এবং নবুওতী দায়িত্ব পালনের তালীম নিয়েছেন। এরপর তিনি তার স্ত্রী সায়েরা (আঃ) কে সাথে নিয়ে নুবয়্যত অর্জন করার জন্য রওয়ানা হলেন এবং নবুয়্যত লাভ করলেন। ফেরআউনের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর কারণে তার লশকরসহ তাকে সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। পরে বনী ইসরাইলের সৎলোকদেরকে ফেরআউনের প্রাসাদ ও বাগান ইত্যাদির অধিকারী করা হয়েছে। মূসা (আঃ) এর ঘটনায় সামেরী নামে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্যজনক কাহিনী ও বর্ণিত হয়েছে। সে মূসা (আঃ) এর উম্মতের একজন ছিল। কিন্তু বেজায় চতুর ও হুশিয়ার ছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর অবর্তমানে সে বনী ইসরাইল জাতিকে গো-বাছুরের পূজায় লাগিয়ে দিয়েছিল। স্বর্ণালঙ্কার গলিয়ে গো-বাছুরের মুর্তি বানিয়ে কারিগরী নৈপুণ্যতা দিয়ে গো-বাছুরের ভেতর থেকে এক রকম আওয়াজ বের করার ব্যবস্থা করলো। লোকদেরকে বলল দেখ তোমাদের উপাস্য মাবুদ তোমাদের ডাকছে তার সামনে মাথা নত করার জন্য। সবাই একথা শুনে গো-বাছুরের সামনে সিজদায় পড়ে গেল। অবশেষে মূসা (আঃ) যখন এসব জানতে পারলো তখন তিনি সামেরীর এ কাজের জন্য প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, নিন্দা জানালেন এবং তার প্রতি লা'নত দিলেন ও বদ দোয়া করলেন।

পবিত্র কুরআন এ সূরায় আদম ও শয়তানের ঘটনা আবারও বর্ণনা করেছে এবং বলতে চেয়েছে যে শয়তান সৃষ্টির আদি থেকেই আদম ও মানব জাতির শত্রু। কিন্তু

মানুষ নিজেও স্বভাবের দোষে একে অন্যের শত্রু হয়ে যায়। পুরুষ ও মহিলা যখন শত্রুতায় লিপ্ত হয় তখন শয়তানের ভূমিকা পালন করে। এ জন্য পবিত্র কুরআনের হেদায়াত তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং কুরআন পড়তে থাকুন। প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিন। সব সময় খোদার ইয়াদ ও জিকিরে ব্যস্ত থাকুন। সেসব ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বেশী পরিমাণ ধন-দৌলত এবং আরাম-আয়েশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কৌশল যে তিনি কাউকে বেশী সম্পদ দেন এবং কাউকে কিছুই দেন না। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। শেষ ফয়সালা ক্বিয়ামতের দিন হবে।

এর পর সূরা আম্বিয়া শুরু হয়েছে। এ সূরা ক্বিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। ঐ দিনের ব্যাপারে যেন কেউ অমনোযোগী না থাকে। ক্বিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে। সেদিন অতি ভয়ঙ্কর এবং কষ্টদায়ক হবে। মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গিয়েছে। তাঁকে ছেড়ে অন্য দেবতাদের উপসানায় লিপ্ত। তাদের থেকেই নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে। এমন কি নবীকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে ফেলেছে। কেমন কেমন শিরক ও কুফরীর কাজ করে। ক্বিয়ামতের দিন এদের ফায়সালা ও বিচার হবে। আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক। তিনিই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি দুটোকে আলাদা উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য এ দুটোর অবস্থান ও পরিবেশ আলাদা। এমন মহান যে সত্ত্বার কেবল তাঁরই ইবাদত করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা জগতের সব কিছু এক সাথে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর জমিনকে আসমান থেকে পৃথক করা হয়েছে। প্রত্যেক বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মাটি ও পানি থেকে জীবনের উৎপত্তি এবং মাটি ও পানির ভেতরই এর সমাপ্তি ঘটবে। তারপর ক্বিয়ামতের দিন সবাইকে জিন্দা করে সেভাবেই উঠানো হবে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু হবে। কিন্তু ব্যক্তির আসল সত্ত্বার মৃত্যু নেই। শুধু ব্যক্তির কাঠামোর মৃত্যু হবে। এ কাঠামো আল্লাহ তায়ালা আবার তৈরী করে দেবেন। ক্বিয়ামতের দিন সবার হিসাব হবে। দাঁড়ি-পাল্লায় সবার আমলনামা রাখা হবে এবং ঠিকমতো ওজন করা হবে। কারো সাথে সামান্য অন্যায় করা হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেদিন নিজ নিজ কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। এইজন্য এখন থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং নিজেদের কর্ম পদ্ধতি সংশোধন করা উচিত। হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য রয়েছে পবিত্র কুরআন। আমাদের উচিত দৈনিক পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা এবং হেদায়াত লাভ করা। মূসা (আঃ)কে হেদায়াত ও নছীহতের জন্য তাওরাত দেয়া হয়েছিল। একইভাবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দেয়া হয়েছিল সহীফা। এসব কিতাবে হিদায়াত ও নছীহতের সম্পূর্ণ নিদর্শনসমূহ রয়েছে। তবুও মানুষ এগুলো অস্বীকার করে। পবিত্র কুরআনে তো এসব নির্দশন আরো বেশী স্পষ্ট। এর পরও যারা পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করে এটা তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ'র চতুর্দশ রজনী

(সূরা-আম্বিয়া, হজ্ব, মুমিনূন, নুর)

সতের পারার এক চতুর্থাংশ থেকে আঠার পারার অর্ধেক পর্যন্ত তিলাওয়াত

এ সূরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর মক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফেরদেরকে সর্বশেষ সুযোগ দিয়ে শেষবারের মতো সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে খুব শীঘ্রই এ দাওয়াত ও তাবলীগ মক্কা থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। সময় খুব কম। এখনো ঈমান আনার সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ গ্রহণ কর। এটা জাদু-টোনা সংক্রান্ত কোন কথা নয়। এটা আল্লাহর ওহী এবং তাঁরই কালাম। এ কুরআন গায়েব যিনি জানেন তাঁর বাণী। এ সূরায় নেতৃস্থানীয় নবীদের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ (দঃ) এসব শুনে মনে শান্তনা লাভ করেন। আগের তারাবীহতে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কাহিনী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি কিভাবে কালদানীদের মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে একে একে সব মূর্তি ভেঙ্গে, হাতুড়ি সব চেয়ে বড় মুর্তির কাঁধে রেখে বেরিয়ে এসেছেন। যখন প্রমাণিত হলো যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)ই মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছেন তখন শাস্তি স্বরূপ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতে নমরুদের অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে রূপান্তরিত করে তাঁর প্রিয় খলীলকে নিরাপদে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকা ও আল্লাহর উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা ইবরাহিমী ঈমানের বৈশিষ্ট। এ ধরনের মজবুত ও খাটি ঈমানদারীর পুরস্কার স্বরূপ তাঁর ছেলে ইসহাককে নবুয়্যত দেয়া হয়েছে এবং বনী ইসরাইলের মধ্যে হাজার হাজার নবীর ধারা অব্যাহত ছিল। দ্বীনে ইব্রাহিমীর মূল দাওয়াত ছিল-নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা এবং সদকা খয়রাত করা। পবিত্র কুরআন লুত (আঃ) এর কাহিনী ও শুনিয়েছে এবং নূহ (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছে। আর হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান(আঃ) উভয়কে নবুয়্যত এবং হুকুমত (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা) একসাথে দেয়া হয়েছিল। তাঁদের সময় এক চাষীর ছাগল-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং অনেক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার ফায়সালা হয়।

হযরত দাউদ (আঃ) কে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অপূর্ব বিচার ক্ষমতা দান করা হয়েছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) কে শেখানো হয়েছিল জ্বিন-পরী তাবেদার বানাবার বিদ্যা।

তিনি পশু-পাখীর ভাষা বুঝতে পারতেন। বাতাসকে তাঁর অনুগত করা হয়েছিল। আরো শেখানো হয়েছিল লোহা দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করার প্রণালী, নানা রকম বাসন-কোসন তৈরী করার কৌশল এবং সমারাস্ত্র উৎপাদন করার কারিগরী জ্ঞান। এরপর শুনানো হয়েছে হযরত আইয়ুব (আঃ) এর ধৈর্যের কাহিনী যা থেকে "ছবরে আউয়ুবী" কথার প্রচলন হয়েছে। ধৈর্য্যের ফলে আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করেন। অতঃপর হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক এবং 'জুলকিফল'-এর ন্যায় ধৈর্য্যশীলদের উল্লেখ রয়েছে। এঁরা সবাই আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন। এ সূরায় রয়েছে হযরত ইউনুস জুন্নুন (আঃ) এর ঘটনা। মাছের পেটে গিয়েও তিনি আল্লাহর তাছবীহ ভুলেননি এবং নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করেছেন। এতে আরো রয়েছে হযরত জাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর উল্লেখ। বিবি মারয়াম এর সতীত্বের সত্যতা পুণরায় উল্লেখিত হয়েছে। আবার ইয়াজুজ মাজুজের কথা এসেছে। যেহেতু যুগের বিভিন্নতা সত্বেও সব নবীদের মূল শিক্ষা ছিল একই, তাই সবার ঘটনা একত্রে এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের সবাই আল্লাহর ইবাদত এবং সৎকাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর শুরু হয় সূরা হাজ্ব। এ সূরা মদীনায় নাজিল হয়েছে। ক্বিয়ামতের উল্লেখ দিয়ে এ সূরা আরম্ভ হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। মোমেনদেরকে জান্নাতের সুখবর দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, ফেরেস্তা-জ্বীন সবাই নিজ নিজ পন্থায় আল্লাহর ইবাদত এবং নিজ নিজ মুখে আল্লাহর তাছবীহ ও জিকির করে। কিন্তু মানুষ এক্ষেত্রে গাফলতি করে। অলসতা করে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। পবিত্র হারামে লোকদের আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কাবা নির্মাণ করে তার চত্বরে নিজের নামাজের জায়গা ঠিক করেছেন যেন লোকজন দূর দূরান্ত থেকে সব সময় হজ্ব করার জন্য এখানে সমবেত হয়। এ কারণে হজ্ব ফরজ করা হয়েছে। হজ্বে এসে লোকজন নিজেদের গুনাহ মাফ চায় এবং পাক পবিত্র জীবন যাপন করার পতিজ্ঞা করে। এ সূরায় কোরবানীর পদ্ধতি ও শেখানো হয়েছে। এ সূরায় আরো বলা হয়েছে হে মানুষ! এ জগত আল্লাহর সৃষ্টি। সর্বত্র তারই রাজত্ব বিরাজমান। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর ধরা বড়ই শক্ত। তার কর্তৃত্ব থেকে পালিয়ে কোথাও যাবার কোন অবকাশ নেই। নেক কাজ কর সুফল পাবে। দ্বীনে ইব্রাহিমীর উপর স্থির থাকবে। কুফরী ও শেরেকীর কোন কাজ করবে না। তোমাদের নাম রাখা হয়েছে মুসলমান। অর্থাৎ

আল্লাহর হুকুমে সন্তুষ্ট ও রাজী এবং তাঁর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণকারী। কাফের মুশরেকদের মতো আচরণ করবে না এবং আল্লাহর সাথে অবাধ্যতার আচরণ করবে না। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (দঃ)-কে তোমাদের জন্য সাক্ষী বানিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তৌবা কর-আল্লাহর কাছে গুনাহ মাপ চাও। নেক আমলের জিন্দেগী গ্রহণ কর ও জাকাত আদায় করতে থাক। আল্লাহর দ্বীনকে শক্ত হাতে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী।

এরপর শুরু হয় ২৩ তম সূরা আল- মুমেনুন। মক্কী যুগের একেবারে শেষ দিকে এ সূরা নাজিল হয়েছে। এতে যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। এদেরকে السَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ বলা হয়ে থাকে। এদের পরিচয় হলো-(১) এদের নামাজের মধ্যে খুশু-খুজু অর্থাৎ একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা রয়েছে। (২) এরা অর্থহীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন। (৩) নিয়মিত জাকাত আদায় করেন (৪) নিয়মিত সময় মতো নামাজ পড়েনও (৫) ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার নিকটেও যান না। (৬) আমানতদারী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। এরাই জান্নাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং প্রকৃত মানুষ। সূরা হজ্বে মানুষের অতীত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় মোমেনরেদকে জান্নাতের অধিকারী ও উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। মানুষের জন্ম ও নারী পুরুষের মিলন থেকে বংশ বিস্তারের যে ধারা চলে আসছে তার উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার এবং জগতে ইসলামের ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরা। মুসলমানের সন্তান মুসলমান হয়ে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেবে এটাই আল্লাহ তায়ালা চান।

আল্লাহ তায়ালা আরো চান যে তারা নিজেদেরকে ভাল মানুষ ও আদর্শ মুসলমান হিসেবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরবে। মুসলমান রূপে জীবন যাপন করে এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়িত করে জগতে সুখ ও শান্তি আনবে।

এ সূরার কয়েক জায়গায় قرن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রত্যেক মুসলমানের নিজ ঘরের একাকীত্ব থেকে বেরিয়ে মুসলমান সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করায় যে সময় তা। এর অর্থ শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ, অর্থ উপার্জন এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আরাম-আয়েশ করে জীবন শেষ করে দেয়া নয়। হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের জাতি

কোন না কোনভাবে তাদেরকে অস্বীকার করেছে। কেননা দ্বীনের শিক্ষা ভিত্তিক জীবন তাদের নিকট মোটেই পছন্দীয় ছিল না। নিজ ইচ্ছেমতো জীবন যাপনই তাদের প্রিয় ছিল। এজন্য তারা নবীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করতো-তাদের আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করতো। তাদের এ কুফরী ও শেরেকীর মূল কারণ ছিল দুটো– তারা ক্বিয়ামত ও আখিরাতে বিশ্বাস করতো না। তাদের ধারণা ছিল যে কোন দিন ক্বিয়ামত আসবে না। তেমনি তারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো মৃত্যুর পর মানুষকে কিভাবে জীবিত করা হবে? বস্তুত এ দুটো বিষয় সহজে মানুষের বুঝে আসেনা। আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হলো এ বিষয় দুটো। এগুলো যার বুঝে আসেনা সে পথভ্রষ্ট হয়। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ অবিশ্বাস চালু রয়েছে। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল হবার মূল কারণ এ অবিশ্বাস। হে রাসূল! আপনি চিন্তিত হবেন না এবং অন্তরে দুঃখ পাবেন না। যাদের ঈমান মজবুত ছিল তারা আপনার দলভুক্ত হয়ে গেছে। যারা ঈমান আকীদার ব্যাপারে এখনো সন্দিহান তারা কখনো ঈমান আনবে না। বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ছাহাবাদের এ ক্ষুদ্র দলের উপর আপনাকে ভরসা রাখতে হবে। যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে হিসাব থেকে বাদ দিন। আমি কারো উপর তার পক্ষে যে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাই না। আর আমি কারো সাথে বেইনসাফী ও অন্যায় করতে চাই না।

এর পর পবিত্র কুরআনের ২৪ তম সূরা আননূর শুরু হয়েছে। এ সূরার একটি বৈশিষ্ট হলো এ যে এতে উপদেশবাণী যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে কতিপয় গুনাহর শাস্তি। কিছু গুনাহ্ এমন রয়েছে যেগুলোর জন্য শুধু তৌবা করাই যথেষ্ট নয় ববং প্রকাশ্য জনসমক্ষে ও পাথর মেরে সেজন্য শাস্তি দিতে হয়। যেন অন্য লোকজন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ব্যভিচার এবং অন্যান্য যৌনাচার এ ধরণের গুনাহ। অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার দ্বারা মুসলমান সমাজ যেন ধ্বংস না হয়ে যায় সেজন্য এসব শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ। শয়তান চায় না যে মানুষ লজ্জা-শরমের অধিকারী হোক। সে সৃষ্টির আদি থেকেই আদম ও হাওয়ার লজ্জার স্থান উন্মুক্ত করার ফন্দি বের করার জন্য সচেষ্ট ছিল। আল্লাহর হুকুম হলো (১) ব্যভিচারের শাস্তি প্রকাশ্য জনসমক্ষে ১০০ বেত্রাঘাত। অপরাধী পুরুষ হোক বা নারী। (২) ব্যাভিচারী নারী-পুরুষের সাথে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখা যাবে না এবং তাদের সাথে বিয়ে শাদীর সম্পর্ক ও স্থাপন করা যাবেনা। (৩) ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীকে অবশ্যই চাক্ষুস সাক্ষী পেশ করতে হবে। অন্যথায় ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়ার জন্য তাকে

বেত্রাঘাত করতে হবে। এভাবে মিথ্যা স্বাক্ষী দানকারীকেও এ শাস্তি পেতে হবে। (৪) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সন্দেহ দেখা দেয় এবং একে অন্যকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাহলে এ জন্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। যদি কোন প্রমান না থাকে তাহলে আল্লাহ এক সুন্দর পদ্ধতির মাধ্যমে এ বিষয়ের নিস্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন। যে স্বামী ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছে সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে সে সত্য বলছে এবং তার বিশ্বাস যে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে যে যদি তার অপবাদ মিথ্যা হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত ও আজাব পড়ুক। এভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর ন্যায় চারবার আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বলবে যে সে সত্যবাদী এবং তার স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার বলবে যে যদি তার স্বামী সত্যবাদী না হয় তাহলে তার উপর যেন আল্লাহর লা'নত পড়ে। ইসলাম ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজের প্রসার চায় না। যেমন চায় না এর অযথা চর্চা। এ ধরনের কাজকে ইসলাম পাপ বলে ঘোষণা করেছে। (৫) নেককার পুরুষ, পরহেজগার ও সতী নারীকেই বিয়ে করবে আর অসৎ চরিত্রহীন ও ব্যভিচারী নারী পুরুষ একে অপরকে বিয়ে করতে পারে। সৎ নেককার পুরুষ কোন অসতী বা ব্যভিচারিণী নারী অথবা নেক ও সৎ নারী কোন অসৎ, ও ব্যভিচারী পুরুষকে বিয়ে করবে না। (৬) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হয় ততক্ষণ সে নিরপরাধ। (৭) হে মানুষ বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করবে না। শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন মহিলার সাথে খোলামেলা মিশবে না এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। (৮) পুরুষ ও নারী একে অপরকে বারবার তাকিয়ে দেখবে না বরং নিজেদের চোখ সদা নিম্নমুখী রাখবে। লজ্জা, শরম ও শালীনতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। নারীর জন্য শরীর ঢেকে রাখা এবং শরীয়তসম্মত পর্দা মেনে চলা ও নজর অবনত রেখে ভদ্রভাবে চলা ফেরা করা আল্লাহর হুকুম (৯) সাজ-গোজ করা নারীর প্রাকৃতিক ও আইনগত অধিকার। নারী নিজ রুচি মোতাবেক প্রয়োনীয় সাজ-গোজ অবশ্যই করবে। তবে তা হতে হবে তাদের স্বামীদের জন্য। পর পুরুষ এবং সমাজের সবার সামনে প্রদর্শনীর জন্য এটা করা বৈধ নয়। তারা যা করবে ঘরের মধ্যে করবে। বাইরে তামাশা দেখাবার জন্য নয়। (১০) ইসলাম অবিবাহিত জীবন পছন্দ করে না। কুমারী মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। বিধবা মহিলাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। অবিবাহিতা মেয়েদেরকে ঘরে বেশী দিন না রাখাই ভাল। (১১) বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট সময় ঘরে প্রবেশ করা বা আরামে ব্যাঘাত ঘটানো শোভনীয় নয়। প্রত্যেকের উচিত অন্যের বিশ্রাম ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা। (১২) খাবার-দাবারের জন্য ঘর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের ঘরে খাবার গ্রহণ করা যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। অপরিচিত লোকদের ঘরে খাওয়া

দাওয়া করা ঠিক নয়। আম দাওয়াত হলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা। (১৩) যখন কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন ঘরে বসবাসকারীদের প্রতি সালাম জানাবে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করবে। (১৪) যে ব্যক্তি গরীব অভাবগ্রস্ত এবং বিয়ে শাদীতে খরচ করার মতো অর্থের মালিক নয় তার জন্য বিয়ে না করাই উত্তম। তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজের কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আল্লাহর হুকুম পালন করলে আল্লাহ নিশ্চই তার জন্য কোন পথ বের করে দেবেন।

আল্লাহর সত্তায় রয়েছে নূর আর নূর, আলো আর আলো। ঈমান ও বিশ্বাসের মাধ্যমে এ নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে অন্তরকে আলোকিত করে। যেসব ঘরে দিন-রাত আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, তাঁর নামের বেশী বেশী জিকির করা হয় সেখানে আল্লাহর নামের বরকত এবং তাঁর রহমত বেশী পরিমাণে নাজিল হয়। আল্লাহর নূরের ধ্যান ও কল্পণা কোন মানুষ করতে পারে না। তবে তাঁর বরকত ও রহমত মানুষ অবশ্যই অনুভব করে। সুতরাং হে মানুষ ঘরে ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের চর্চা জারী রাখ। রোজার ফরজ আদায় কর। জাকাত ও সদকা খয়রাত নিয়মিত প্রদান কর। সৎ-সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জীবিকা প্রশস্ত করবেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করবেন। পশু-পাখি তাদের নিজস্ব ভাষায় সকাল বিকাল আল্লাহর নামের তাছবীহ পড়ে। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা। তার উচিত অন্যদের তুলনায় বেশী করে আল্লাহর জিকির, তাছবীহ এবং নামাজে রত থাকা। সবাইকে বুঝাবার জন্য আল্লাহ নিজস্ব আয়াত ও আহকাম বর্ণণা করেছেন। এর উপর আমল করা মুসলমানদের উপর ফরজ।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র পঞ্চদশ রজনী

(সূরা-আল ফুরক্বান, শুয়ারা, নামল)

. আঠার পারার অর্ধেক থেকে উনিশ পারার তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত

পূর্বের তারাবীহ'র ধারা বজায় রয়েছে। হে মানুষ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য হলো রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদর্শ চরিত্র অর্জন কর। সব কিছুই তাঁর জীবনে পাওয়া যাবে। যেসব লোক রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করে তাদের সাথে আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা আছে যে তাঁর প্রিয় রাসূলের সুন্নাতের বরকতে তাদেরকে আখিরাতে সুখ-শান্তি এবং নাজাত দান করবেন। মোমেনদের জন্য ইসলাম পছন্দ করা হয়েছে। যারা ইসলামের হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলবে, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আনুগত্যে জীবন কাটাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হবে। মনে রাখবে এ জমিন আসমানে যা কিছু হচ্ছে, সব কিছু আল্লাহ্ তায়ালা জানেন। তিনি এটাও জানেন যে তোমরা সবাই জিন্দা হয়ে তাঁর দরবারে সমবেত হবে।

এরপর শুরু হয় সূরা আল-ফুরক্বান। আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র বিশ্বকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ, পরিমাপ ও আকারে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির এ বিশাল কারখানায় প্রত্যেক বস্তু তার জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে। এটাই তার তাকদীর-ভাগ্য। এ তাকদীর ও পরিমাপ কখনো মিথ্যা হয় না। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া কোন মামুলী বিষয় নয়। এটা শুধু কিস্‌সা কাহিনী নয়। এতে জাতিসমূহের কুফরী, শেরেকী এবং সত্যকে অস্বীকার করার শাস্তির যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে সব থেকে আমাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এ সব লোকতো ক্বিয়ামতকেই অস্বীকার করে। যে দিন এরা কিয়ামত দেখবে সে দিন দোযখের আগুন প্রত্যক্ষ করবে। ক্রোধ বশতঃ তাদেরকে গ্রাস করতে চাইবে। তারা যখন সেদিকে তাকাবে তখন তারা বুঝতে পারবে ক্বিয়ামত কী এবং দোজখ কী?

এটাতো তোমাদের সৌভাগ্য যে তোমাদের একজনকেই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের হেদায়েতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। যিনি তোমাদেরকে কল্যাণের সঠিক রাস্তা বাতলাচ্ছেন। তোমাদের জন্য দিন রাত চিন্তিত থাকেন। নিজের দুঃখ কষ্টের জন্য

তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এদের মতো অতীতের অনেক জাতি ও নবীদেরকে অস্বীকার করতো। তাদের যুক্তি হলো এ যে কুরআন কেন একত্রে অবতীর্ণ করা হয়নি ? কেন এটা অল্প অল্প করে দীর্ঘ দিন ধরে অবতীর্ণ করা হলো ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ধৈর্য শক্তির জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। কুরআনের ভার তাঁর উপর পড়ে। এক সাথে অবতীর্ণ হলে তিনি এ ভার সইতে পারতেন না। প্রাচীন জাতিসমূহের ধ্বংসের কাহিনী পবিত্র কুরআন বর্ণণা করেছে। কুরআন মজীদ পড়ে সে সব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজস্ব প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে নিজেদের মাবুদ বানায় এবং নিজ ইচ্ছানুযায়ী জীবন-যাপন করে। আল্লাহ্ তায়ালার নেক ও সৎ বান্দাদেরকে চেনা খুব সহজ। মোমেনও কাফিরের মাঝে খুব সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এক বিশ্বাসী মোমেন যখন মাটির উপর চলবে খুব বিনয়ের সাথে চলবে। রাস্তায় চলার সময় যদি জাহেল, বদমায়েশ এবং অসৎ লোকদের দেখা পায় তখন তাদেরকে সালাম জানিয়ে আস্তে ধীরে পার হয়ে যায়। এরা নামাজও জাকাত নিয়মিত আদায় করে। রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং আল্লাহ্র কাছে পাপের ক্ষমা চায়। খোদার ইবাদতে রাতের শেষ প্রহর কাটায়। আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করে এবং বলে, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও, কেননা দোজখের আগুন ভীষণ ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসকারী। নিশ্চয়ই জাহান্নাম বড় মন্দ ঠিকানা। এ সব লোক ব্যয় করার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। অপব্যায় করে না। শেরকও কুফরী করে না। অশ্লীলতা ও কুকর্মে লিপ্ত হয় না। বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাক। তাদের অন্তরে রয়েছে কিয়ামতের ভয়। এরা আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মানুষ। জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্তরে তাদের স্থান নির্ধারিত।

এরপর পবিত্র কুরআনের ২৬ নং সূরা আশ শুয়ারা আরম্ভ হয়। طسم দিয়ে এ সূরা শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে এ সত্য প্রমাণ করা যায় যে আল্লাহ এক ও একক। তিনি ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যেন মানব জাতিকে কুফর, শিরক এবং অসৎ জীবন থেকে বাঁচানো যায়। মূসা (আঃ) ফেরআউনের নিকট এসেছিলেন আল্লাহর বাণী নিয়ে। কিন্তু সে তাকে নবী বলে মানতে অস্বীকার করলো। পবিত্র কুরআন হযরত মূসা (আঃ)-এর শৈশবের কাহিনী এ সূরায় বর্ণনা করেছে। তারপর তাঁর নবুয়্যত এবং ফেরাউনের দরবারে উপস্থিতির যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাদু দিয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সত্য বিজয়ী হলো এবং অসত্য বাতিলও পরাজিত হলো। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআন নিজ মূলনীতি বর্ণনা করেছে যে, যারা জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করে সত্যের উপর স্থির থাকে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে,

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই একদিন তাদের সাহায্য করবেন এবং তাদের ধৈর্যের বদলা দিবেন। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা সত্যের অনুসারীদেরকে পরীক্ষা করেন। বনী ইসরাইল ফেরআউনের বন্দীশালায় একশত বছরের মতো গোলামী ও অবমাননাকর জীবন-যাপনের পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। মূসা (আঃ) কে নবুয়্যত ও মোজেজা দিয়ে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করেন যেন তিনি বনী ইসরাইলকে ফেরআউনের মতো জালেমের হাত থেকে মুক্ত করেন। যদি কোন মোমেন আল্লাহ্র ও রাসূলের উপর সঠিকভাবে ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে তাহলে আল্লাহ কখনো তাকে কাফিরের গোলামীতে রাখেন না। আলাহ তায়ালা ফেরআউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং বনী ইসরাইলকে ফেরআউনের পরিত্যক্ত বাগান, দালান-কোঠা ও সম্পদের মালিক বানিয়েছেন আর মিসরের শাসন ক্ষমতা দান করেছেন। নূহ (আঃ) এর জাতিরও এ অবস্থা হয়েছিল। সমগ্র দুনিয়া বৃষ্টি ও বন্যার পানিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং পরে এক নয়া বসতি গড়ে উঠেছিল। কাফির-মুশরিকগণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আ'দ ও ছামুদ জাতিও এভাবে ধ্বংস ও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। লূত জাতি ও মাদায়েনের জনগোষ্ঠিও একইভাবে খতম হয়ে গিয়েছিল। এইসব ঘটনা হলো শিক্ষামূলক। এসব জেনে শুনেও যদি কোন জাতি ঈমান না আনে তাহলে তাদের পরিণামও এ রকম হবে এবং তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হে রাসূল! আপনি আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করুন। তাঁর জিকিরে লিপ্ত হয়ে পড়ুন এবং কাফিরদেরকে তাদের অবস্থানে ছেড়ে দিয়ে সময়ের অপেক্ষা করতে থাকুন।

সূরা শুয়ারার পর কুরআন মজীদের ২৭ নং সূরা-সূরা নামল শুরু হয়েছে। এ সূরা طس দিয়ে শুরু। কুরআন মজীদ প্রকাশ্য হেদায়াত ও নছীহতের কিতাব। এটা মুত্তাকীদের হেদায়াতের জন্য এসেছে যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করে। যেসব লোক আখিরাতের উপর ঈমান রাখেনা তারা তাদের বদ আমলসমূহকে ভাল বলে মনে করতে থাকে এবং তাদের ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকে আখিরাতের আজাবের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। পরিণামে তারা ভীষণ আজাব ভুগতে থাকে। কুরআন মজীদ এক প্রচন্ড শক্তির অধিকারী সত্বার কাছ থেকে হেদায়েত ও নছীহতের কিতাব হিসেবে এসেছে। এতে অনেক নবীর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কেননা প্রত্যেক যুগে নবীগণ নিজ নিজ জাতির নিকট আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে হেদায়াত ও দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। অবশেষে মুহাম্মদ (দঃ) কে একই দাওয়াত ও শিক্ষা দিয়েই মানব জাতির নিকট পাঠানো হয়েছে। তিনি কোন নতুন শিক্ষা নিয়ে আসেননি। সুতরাং এতে অবাক ও বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। যারা তাঁর এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পরিণামও প্রাচীণ জাতিসমূহের মতোই হবে যারা কুফরী ও শের্কেকীর কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এ সত্য সবার স্মরণ রাখা উচিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র ষষ্টদশ রজনী

(সূরা-নামল, ক্বাসাস, আনকাবুত)

উনিশ পারার শেষ চতুর্থাংশ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত

সূরা নামলের তিলাওয়াতের ধারা চলছে। এর সূরার আলোচ্য বিষয়-রিসালাত, নবুয়্যত, তৌহিদ-এবং শাস্তি ও পরিণামের আইন-কানুন। طس দিয়ে এ সূরা শুরু হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণনার পর দাউদ (আঃ)-এর নবুয়্যত ও বাদ্‌শাহীর অবস্থা বর্ণণা করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র অনেক অনুগ্রহ ছিল। তিনি তাঁকে জগতের যাবতীয় নেয়ামত দান করেছেন। এ অনুগ্রহের একটি বিশেষ দিক হলো এটা যে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মতো একজন সুযোগ্য পুত্র তাঁকে দান করেছেন এবং তাঁকে নবুয়্যত ও হুকুমত (রাজত্ব) দুটোতেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। এটা বনী ইসরাইলের জন্য ছিল এক অনন্য গৌরব। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলাইমান (আঃ) দুজনেই এটা স্বীকার করতেন এবং এজন্য আল্লাহ্ তায়ালার শুকর আদায় করতেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা লৌহা দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র তরীর কৌশল শিখিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র জিকির ও স্মরণে জীবন-যাপন করতেন। রাজত্ব, বাদশাহী এবং নবুয়্যত সব কিছুই ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর হুকুম ছিল যেন সরকারী কোষাগার থেকে পরিবারের খরচের জন্য কিছুই ব্যয় করা না হয়। নিজে কষ্ট করে কারিগরী বিদ্যা থেকে যন্ত্রপাতি তৈরী করতেন, সেগুলো বাজারে বিক্রি করতেন এবং যা আয় হতো তা দিয়ে সংসারের খরচ মেটাতেন। এভাবে খোদার ইবাদাত-বন্দেগীর মাঝে জীবন কাটিয়েছেন। পাথর ও কীটপতঙ্গ তাঁর সাথে মুনাজাতে শরীক হতো। হযরত দাউদ (আঃ) যখন মুনাজাত করতেন এবং আল্লাহ্‌র জিকির করতেন তখন নদীর প্রবাহ থেমে যেতো। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন লোকজনের বিরোধ ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবার। কারো সাথে এ ক্ষেত্রে সামান্যতম বেইনসাফীও যেন না হয় তা খেয়াল রাখতে তাকে বলা হয়েছিল। এর পর হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন আল্লাহ্ তায়ালা এ নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দিলেন। যদি মোমেন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় করতে থাকে তাহলে আল্লাহ পাক তা আরো বৃদ্ধি করে দেন। হযরত সুলাইমান

াঃ) বেশী করে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর আদায় করতেন। সে জন্য আল্লাহ্ তাঁর
তা হযরত দাউদের চেয়েও তাঁকে বেশী নিয়ামত দান করেছেন। শয়তান, জ্বীন,
ত্য-দানবকে তাঁর অনুগত বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাকে এমন বিদ্যা শিখানো
াছিল যার বদৌলতে জগতের সব বড় বড় দানবীয় শক্তি তাঁর অনুগত ছিল এবং তাঁর
ক্তিকে ভয় পেতো। বাতাস তাঁর অনুগত ছিল। পশু-পাখি এমন কি পীপিলিকার
াও তিনি বুঝতেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর অধিকারে ছিল যুদ্ধাস্ত্রের এক
াল ভাণ্ডার। যুদ্ধের ঘোড়া ও উট সজ্জিত তাঁর ছিল এক শক্তিশালী সেনা বাহিনী।
বার হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর লশকর নিয়ে এক প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন।
সময় পীপিলিকার একটি দীর্ঘ সারিও সে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত সুলাইমান
ঃ)-এর লশকর আসতে দেখে এক পীপিলিকা অন্য সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে
লো যে তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে পড়। হযরত সুলাইমানের সৈন্যরা আসছে। পায়ের
চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। হযরত সুলাইমান (আঃ) পীপিলিকার কথা শুনে হেসে
লেন এবং আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন যে আল্লাহ্ পীপিলিকাকে কত বুদ্ধি
ছেন যে তারা নিজেদের এবং তাদের জাতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করছে। হুদহুদ
এসে ইয়েমেনের সাবা অঞ্চলের রাণী বিলকিসের ঘটনা হযরত সুলাইমান (আঃ)
জানিয়েছিল। এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় তিনি কত বড় নবী ও বাদশাহ্
ন। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এবং অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রীয়
াগার থেকে কোন কিছু ব্যক্তিগত কাজে খরচ করার অনুমতি ছিল না। হযরত
দ (আঃ)-এর মতো তিনিও নিজ পরিশ্রম লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসার চালাতেন। নিজ
টুপি বানাতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে যা আয় হতো তা দিয়ে
রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতেন। সৎ উপার্জন এবং হালাল খাওয়া নবীদের
ও বাধ্যতামূলক ছিল। সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনার পর আ'দ ও ছামুদ এবং হযরত
হও হযরত সোয়েব (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এরা কিভাবে ধ্বংস হয়েছে
ান তা শুনিয়েছে। লূত জাতির ঘটনা বড় শিক্ষণীয়। হযরত লূত (আঃ) ছিলেন
হ্র নবী। তাঁর স্ত্রী-তাঁর তাবলীগে প্রভাবান্বিত হননি। সে সব কুফরী, শেরেকীও
কাজে কাফেরদের সাথী ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী লূত (আঃ), তাঁর
দার সাথী এবং তাঁর মেয়েগণসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে রক্ষা করেছেন।
নাফরমান স্ত্রী কাফেরদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ সূরায় বিশ পারা শুরু
ছ। এখানে রেসালাতের পর তৌহীদের উল্লেখ রয়েছে। মানুষ আল্লাহ্কে ছেড়ে

মিথ্যা মাবুদদের ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ এ সব মাবুদ তাদের কোন সাহায্য করতে পারে না। শিরক এবং কুফরের পক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তথাপি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এ ভ্রান্ত পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। পৃথিবীতে ভ্রমনে বেরিয়ে পড়। তাহলে দেখবে প্রত্যেক যুগে এ রকম বহু জাতি প্রত্যেক দেশেই ছিল। যারা আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য এবং নাফরমান ছিল। ক্বিয়ামতের ভয় অনেকের নেই বরং উল্টো জিজ্ঞেস করে যে ক্বিয়ামত কখন আসবে ? আল্লাহ্ এ সব কাফির এবং মুশরিকদেরকে বেশ ভালভাবেই জানেন। প্রত্যেকের অবস্থা তাঁর নিকট লৌহে মাহফুজের কিতাবে আগে থেকেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এর পর পবিত্র কুরআনের ২৮ নং সূরা ক্বাসাস শুরু হয়েছে। طسم দিয়ে এ সূরা শুরু। এ সূরায়ও নবীগণের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। আরো কয়েকটি সূরার মতো মূসা এবং হারুনের সাথে ফেরআউনের কথা বার্তার উল্লেখ এ সূরাতেও আছে। মূসা (আঃ)-এর শৈশব এবং জন্মের বৃত্তান্ত একটু বিস্তারিতভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে দ্বীনের দুশমনের ঘরে মূসা (আঃ)-এর লালন পালন আল্লাহ্র কুদরত ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই ছিল। ফেরআউনের স্ত্রীর হযরত মূসা (আঃ)-এর মা হওয়া এবং গোপনে তার হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন- এ সবই ছিল আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত।

আল্লাহ্ তায়ালা যখন যেটা যেভাবে চান সেটা তখন সেভাবে করেন। তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হবার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মূসা (আঃ) ফেরআউনের শাহী মহল থেকে বের হয়ে মাদায়েন শহরের দিকে গেলেন। সেখানে দু'জন যুবতী মেয়ের সাথে হঠাৎ করে তাঁর দেখা হলো। মূসা (আঃ) তাদের সাহায্য করলেন। এ বিষয়ের বিনিময় তাঁকে যথাযথভাবে দেয়া হলো। হযরত শোয়েব (আঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা হুকুম দিলেন যে মূসা নামে যে যুবক আপনার বাড়ীতে এসেছে তার সাথে আপনার এক মেয়ের বিয়ে দিন। এটা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত ও ইচ্ছা। হযরত শোয়েব (আঃ) এর পয়গম্বরী লাঠি যা তিনি ব্যাবহার করতেন এবং এখন ঘরে পড়ে আছে সেটা প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ) এর নবুয়তী আমানত ছিল। হযরত মূসা (আঃ) বিয়ের মোহর বাবদ দশ বছর হযরত শোয়েবের ঘরে ছাগল চরালেন অতঃপর হযরত শোয়েবের অনুমতি নিয়ে নিজ স্ত্রী হযরত সায়েরাকে নিয়ে মিসরের দিকে রওয়ানা করলেন। হযরত শোয়েব (আঃ) নিজ হাতের লাঠি হযরত মূসা (আঃ) কে উপহারস্বরূপ দিয়ে বললেন এ লাঠি আসলে আপনার আনামত হিসেবে এতোদিন আমার কাছে ছিল। এখন এটা সাথে করে নিয়ে যান। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) দুটো আমানত পেলেন। মেয়ে ও লাঠি। মূসা (আঃ) পথ চলতে গিয়ে রাস্তায় আলোর ঝলক দেখলেন। এটা

কৃতপক্ষে ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আহবান ও নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রের আলো দিয়ে মূসা (আঃ) কে তূর পাহাড়ে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে নবুয়্যতে ষিত করলেন। ততক্ষণে হযরত শোয়েব (আঃ) এর লাঠি মূসা (আঃ) এর লাঠিতে রিণত হয়েছে। নবীদের এই নিদর্শন আল্লাহর নিদর্শন হয়ে গেল। এ লাঠি মাটিতে লার পর সাপ হয়ে গেল। এ মোজেজা নিয়ে মূসা (আঃ) ফেরআউনের দরবারে লেন। মূসা (আঃ) এবং ফেরআউনের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হলো এবং ফেরআউনের দ্বত্যপূর্ণ আচরণের পরিণামে সে সমুদ্রে ডুবে মরলো। মূসা (আঃ) বনী ইসরাইলকে ফরআউনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের স্বদেশ ফিলিস্তীনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। সা (আঃ) বনী ইসরাইলের শেষ যুগে এসেছিলেন। তাঁর পর এসেছিলেন হযরত ঈসা বনে মরিয়াম (আঃ)। এরপর ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে শুরু হলো শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) র যুগ। মহানবী (সঃ) এর নিকট মক্কার কাফেরগণ মোজেজা দাবি করতে লাগলো। হুদীগণ তাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে বলেছিল আল্লাহর নবী কখনো মোজেজা ব্যতীত াসেন না। তারাও মোজেজার দাবি করতে লাগলেন। রাসূলল্লাহ (দঃ) নিজেও চ্ছিলেন যে তাঁকে যেন কোন মোজেজা দেয়া হয়। কিন্তু সে সময় তাঁকে মোজেজা দয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছিলনা। পবিত্র কুরআন হলো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা। এতো বড় মোজেজার পর অন্য কোন মোজেজা তাঁর প্রয়োজন ছিল না। হেদায়াত ও নছীহত গ্রহণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্যে জোটেনা। যাদের অন্তর নরম এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই একমাত্র হেদায়েত ও নছীহত গ্রহণ করতে পারে। াদের মন সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দন এবং নছীহত নছীব করেন। এ সূরায় পবিত্র কুরআন কারুনের ঘটনা বর্ণনা রেছে। আল্লাহ তাকে অঢেল ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। তার ধন ভান্ডারের চাবি বহন রার জন্য চল্লিশটি উটের প্রয়োজন হতো। লোকজন তার প্রাচূর্য্য, ঐশ্বর্য এবং ন-সম্পদের চাকচিক্য দেখে কামনা করতো যেন তাদেরও সে রকম অগাধ সম্পদ হয়।

আল্লাহ তায়ালা কারুন এবং তার ধন-ভান্ডার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। তার ত্যু ছিল বড়ই মর্মান্তিক ও করুণ। যেসব লোক গত কাল পর্যন্ত কারুনের মতো ধন-দৌলত পাবার অভিলাষী ছিল, তার করুণ মৃত্যু দেখে তারা শোধরে গেল এবং তৌবা রলো। আল্লাহর ভয়ে তারা বলতে লাগলো আমরা এমন সম্পদ এবং মৃত্যু চাইনা। াল্লাহর নিকট সবাইকে যেতে হবে এবং নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে। মানুষ নিয়ার ধন-দৌলত পেয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায় এবং তাঁর নেয়ামতের নাশোকরী করতে রু করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন।

এর পর আসে পবিত্র কুরআনের ২৯ নং সূরা আনকাবুত। মানুষ মনে করে যে াল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করেছেন। তারা মনে করে যে তারা ালিকবিহীন ষাঁড়ের মতো অবাধে চলাফেরা করবে। ইচ্ছা মতো যা কিছু মনে চায়

তছনছ করবে এবং ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হবে তাদেরকে কেউ কিছু বলবে না। এটা তাদের মস্তবড় ভুল ও গোমরাহী। এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তাদের খুব কঠোর সাজা হবে। আল্লাহ মানুষ ও জ্বীন-এ দু'প্রধান সৃষ্টিকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছেন। এদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, নামাজ ও জাকাত আদায় করা এবং সৎ ও পরহেজগার হিসেবে জীবন-যাপন করা। মানুষকে জ্বীনের চেয়ে বেশী মার্যাদা দিয়ে খলীফার আসনে আসীন করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মতো গুরু-দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ মোমেনদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। লোকদেরকে সর্বাবস্থায় পরীক্ষা করা হবে। প্রকৃত মোমেনদেরকে শক্ত ও কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসের পরীক্ষা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হয়। মোমেন বান্দা আল্লাহর দীদার ও তাঁর সন্তুষ্টির যত বেশী প্রত্যাশী হবে তার পরীক্ষা ও তত কঠিন হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীদার লাভ করবে। মানুষ যতটুকু পরিশ্রম ও কষ্ট করবে সে ততটুকু ফল পাবে। চাই এ পরিশ্রম ও কষ্ট দুনিয়ার জন্য হোক-বা আখিরাতের জন্য আল্লাহ কারো পরিশ্রম ব্যর্থ করেন না। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে কোন পথ বেছে নেয়ার। সে সততা, পরহেজগারী ও আল্লাহর বন্দেগীর পথ যেমনি গ্রহণ করতে পারে তেমনি পারে শয়তানের আনুগত্য, নাফরমানী ও ফাসেকী জীবনের রাস্তা বেছে নিতে। যে পথই সে গ্রহণ করুক না কেন তার ফল সে ভোগ করবে। যদি মানুষ সৎ জিন্দেগী বেছে নেয় তাহলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তার গুনাহ কম হবে। সৎ জীবন থেকে উত্তম জীবন আর হতে পারে না। দান ছদকা থেকে উত্তম কাজ আর নেই। আর আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী, আল্লাহর যিকর, নামাজ, জাকাত ইত্যাদির পর সব চেয়ে উত্তম কাজ হলো মা-বাবার সেবা, তাদের সাথে ভাল আচরণ এবং তাদের আনুগত্য। প্রথমে মা-বাবাকে খাওয়াবে তারপর স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এরপর যদি কিছু থাকে তাহলে নিজে খাবে। কিছু না থাকলে অভুক্ত থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তিনি মোমেনদেরকে পরীক্ষা করেন। কখনো ধন- দৌলত ও সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কখনো বালা মছিবত ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। সুখে থাকলে আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং দুঃখ কষ্টে থাকলে ছবর করা-ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ মোমেনদের সাহায্যকারী প্রভু। পবিত্র কুরআন প্রকাশ্য প্রমাণস্বরূপ এসেছে। বরং পবিত্র কুরআন একটা সুস্পষ্ট মোজেজা। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর কাজ শুধু জগতের সামনে তা পেশকরা। এ জগত মোটেই খেলার সামগ্রী নয়। এর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তবে আখিরাত হলো আসল ঠিকানা। সব সময় ধৈর্য ও ছবরের সাথে কাজ করলে সফলতা আসে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র সপ্তদশ রজনী

(একুশ পারা)

(সূরা আনকাবুত, রুম, লোকমান, সাজদা, আহ্জাব)

হে আল্লাহর রাসূল! যে কুরআন আপনার উপর অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা আপনি পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজ অব্যাহত রাখুন। নামাজ পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, জঘণ্য খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহর স্মরণ এবং জিক্র এক বিরাট জিনিস। আপনার কাজ খুবই কঠিন। বড় খারাপ লোকের সাথে আপনার পাল্লা পড়েছে। তাদের সাথে আপনি খুবই নম্র সুন্দরভাবে কথা বলুন। তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে থাকুন। তাদের হেদায়েত ও নছিহত করতে থাকুন। কোন সময় কোন সুন্দর উপদেশ ও হেদায়েতের বাণী তাদের হৃদয় খুশি করতে পারে। এবং তারা ঈমান আনতে পারে। হে প্রিয় বন্ধু! আপনি এই মহান গ্রন্থের পূর্বে কোন লেখাপড়া জানতেন না। এবং কখনো লেখা পড়ার কাজ করেননি। তথাপি এরা সবকিছু জানা সত্ত্বেও আপনাকে বলে যে আপনি এই বই নিজেই রচনা করেছেন। কারও দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। কতই অবুঝ লোক এরা। এই গ্রন্থের আয়াতসমূহ স্পষ্ট হেদায়েত ও নছিহত সম্বলিত। যা অন্তরকে স্পর্শ করেই ছাড়ে। কিন্তু ওদের হৃদয় বড় কঠিন। মেজাজ অহমিকা ও শয়তানীতে ভরা। এরা অত্যাচারী। কুরআন মজীদের ন্যায় পবিত্র গন্থকে অস্বীকার করে। আপনার কাছে আল্লাহ্র আযাব দাবী করে। যদি আল্লাহ আযাব নাযিল করেন তাহলে এরা কোথায় যাবে? ধূলার সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন এদেরকে সব কিছু দেখানো হবে। তখন জাহান্নামের আগুন এরা নিজের চোখে দেখবে। কতদিন পর্যন্ত এরা বিদ্রোহ, নাফরমানী, শিরক ও মূর্খতার জীবন যাপন করবে? একদিন না একদিন সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যু স্পর্শ করবে। এবং সকলকে মৃত্যুর পর আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। মুক্তি ও ক্ষমা শুধু তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর এবং আখিরাতের উপর। যারা পূত পবিত্র ও সৎ জীবন যাপন করেছে তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্তের অশেষ নেয়ামত যেঁখানে তারা অনন্তকাল সুখে থাকবে। দুনিয়ার এই জীবন দু-চার দিন খেল তামাশার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এবং অচিরে এই খেলার সমাপ্তি ঘটবে। পরকালের জীবন অনন্তকালের জীবন। এই কথাটি ওদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিন। আমি এই মক্কা নগরীকে হযরত

ইব্রাহীমের সময় থেকে নিরাপত্তা ও শান্তির ধাম বানিয়েছি। ইবাদতের এই কেন্দ্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের ঘর। কিন্তু এখানে মানুষের উপর অত্যাচার ও পীড়ন করা হয়। এখানে ফিতনা-ফাসাদের পরিকল্পনা রচিত হয়। মক্কায় হাজারো প্রতিমাও মূর্তির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বদলে কতই না নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত। এই সব জালিম লোক আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করতে ও পিছপা হয় না। এদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যারা বিশ্বাসী ও ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

সূরায়ে রুম শুরু হচ্ছে। আলিফ, লাম, মীম দিয়ে যে সব সূরা শুরু হয়েছে তার সংখ্যা হলো ছয়। প্রথম দুটি সূরা আল-বাকারাহ ও আলে-ইমরান এক সাথে একের পর এক শুরু হয়েছে। এ দুটি সূরাতে ধর্মের হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর চারটি সূরা আনকাবুত, সূরায়ে রুম, সূরায়ে লোকমান ও সূরায়ে সিজদাহ আলিফ, লাম, মীমের বিযুক্ত অক্ষর দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। এই চারটি সূরা একই সাথে একের পর এক এসেছে। এদের বিষয়বস্তু একই রকম। তাহলো ঈমান ও ইসলাম।

সূরায়ে আনকাবুতে মুশরিক ও কাফিরদের জীবনের উপমা মাকড়শার জালের ন্যায় একটি দূর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর ঘরের সাথে তুলনা করে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে মাকড়শা কতইনা কষ্ট ও পরিশ্রম করে নিজের লালা দিয়ে তৈরী সূক্ষ্ম সূতা দিয়ে সুন্দর করে নিজে ঘর বানায়। কিন্তু এই ঘর এত দূর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর যে বাতাসের একটি মাত্র ধাক্কায় সে নিজের ঘরসহ উড়ে যায়। নিমেষে ঘর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এর পর সূরায়ে রুমে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহর ইচ্ছা কিভাবে কাজ করে। কোন বস্তু বা জিনিসের মধ্যে ক্রিয়া বা শক্তির প্রভাব অতটা জরুরী নয় যতটা এর জন্য আন্তরিকতা ও কর্মের সংকল্প জরুরী। এবং সংকল্পের এই আন্তরিকতা আল্লাহ্‌র আদেশ ও তার বিধান অনুযায়ী নিজের কাজ করতে থাকে। সূরায়ে আনকাবুতে ঐশী গ্রন্থের অধিকারী অর্থ্যাৎ ইহুদীদেরকে ঈসায়ীদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে তারা এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তারা তাওহীদপন্থী। এজন্য তারা মুসলমানদের খুব কাছের লোক। এক আল্লাহ্‌র উপর উভয়ের আকীদা ও বিশ্বাস। পক্ষান্তরে ঈসায়ীদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক। সূরায়ে রুমে বলা হয়েছে যে ঈসায়ী অগ্নি উপাশকদের চেয়ে ভাল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে অগ্নিপূজা ছিল ইরান বা পারস্য দেশের ধর্ম। এরা পারসী বিশ্বাসের অনুসারী ছিল। এবং রোম ছিল ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী। এরা ঐ সময় সবচেয়ে বড় দুই সুপার পাওয়ার বা পরাশক্তি ছিল। সেই সময় ইসলাম তার প্রাথমিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল। আল্লাহ্‌তয়ালা মুসলমানদের

এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম আগামীতে অগ্নি উপাসকদের চেয়ে ঈসায়ীদের দ্বারা অধিক উপকৃত হবে। মুসলমানদের মক্কা থেকে হাবসার দিকে হিজরত করার প্রথম আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যেখানকার বাদশাহ ছিলেন একজন ঈসায়ী। এই সময় রোমের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল যে, যদিও এই সময় পারস্য রোমের উপর বিজয়ী কিন্তু আগামী বছরগুলোতে রোমীয়রা পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে এবং রোমীয়রা বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে তিনি যাকে ইচ্ছা সাফল্য সম্মান ও রাজত্ব প্রদান করবেন। তাঁর সংকল্প, ইচ্ছা ও আদেশ সবখানে কার্যকরী হবে। আল্লাহ্কে যদি জানতে চাও তাহলে তার সত্বা ও গুণাবলীর উপর চিন্তা করে দেখ যে, তিনি কেমন করে দুনিয়ার কাজ পরিচালনা করেন। তিনি মৃত্যু ও জীবনের মালিক। নিখিল সৃষ্টির সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। দুটি বিপরীত নারী ও পুরুষ জাতির মধ্যে কেমন করে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করেন যাতে তারা পরস্পর জীবনের সাথী ও জীবনের অংশীদার হয়ে যায়। একে অন্যের মধ্যে প্রশান্তি ও সুখ উপলব্ধি করে। আর যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞ হতে চাও, আল্লাহর উপকার স্বীকার করতে চাও তাহলে দিবা রাত্র আল্লাহর ইবাদত কর। আছরের সময় খুবই বরকতময় সময়। এই সময় আল্লাহর গুণকীর্তনের জন্য খুবই শুভ ও বরকতময় সময়। নিখিল বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি এই সময় আল্লাহর নামকীর্তনে ব্যস্ত থাকে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে যে, সর্বত্র আল্লাহর শক্তি ও মহিমার নিদর্শনসমূহ এবং আল্লাহর প্রচন্ড ও অনুপম রূপ দেখতে পাবে। আকাশ থেকে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ ও বিজলীর চমক, যমীনকে শস্য শ্যামল করা, মৃত যমীনে প্রাণ সঞ্চার করা, এ সব কিছু আল্লাহর দান। মানুষ এবং সকল প্রাণীকে খাদ্য যোগান দেয় যমীন। তবুও আল্লাহ্কে অস্বীকার করা হয়। হে মানুষ সকল! আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। দ্বীনে হানীফ, দ্বীন ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। যার উপর আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে পয়দা করেছেন। মানুষ ধর্মকে টুকরা টুকরা করেছে। পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন দল ও মতের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকে নিজের ধর্ম ও পথ নিয়ে গর্ব করে। নিজের পছন্দ ও মনের কামনা-বাসনার উপর জীবনের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে। ইসলাম ধর্মতো মানুষের প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও ইচ্ছাকে ধর্মের মূলনীতিসমূহের মধ্যে একত্রিত করেছে। যাতে মানুষ নিজে প্রকৃতিগত প্রয়োজন ও ইচ্ছানুযায়ী ধর্মের পথে চলতে পারে এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে কখনও অন্যমনস্ক না হয়। যারা নিজের বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে তারা যালিম ও অত্যাচারী। ইসলাম ধর্মে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। শুধু তাই মানতে হবে যা রাসূল (সাঃ) নির্দিষ্ট করেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। খবরদার! দ্বীন ইসলাম থেকে কখনও পৃথক হবে না। শিরক ও

নাফরমানীকে ইসলামের মধ্যে জায়গা দিবে না। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ধর্মকে টুকরো টুকরো করবে না। হে মানুষ সকল! আল্লাহ নিজের বান্দাদের খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা তাকে অঢেল দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকুচিত করে সামান্যতম রুটির মুখাপেক্ষী করে দেন। এ তার ইচ্ছা তার ইরাদা। তিনিই ভাল জানেন। যাদের তিনি প্রয়োজনের অধিক দেন তাদেরকে তিনি আদেশ দেন যে, অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বিধবাদের অংশ। ওদের দিয়ে দাও।এ তোমাদের সম্পদ নয়। জমা করে রেখোনা। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের বঞ্চিত করে রাখ আল্লাহ্ এটা পছন্দ করেন না। দান খয়রাত মানুষের মুক্তি মোচন করে। অজ্ঞ লোক নিজের রিযিক বাড়াবার জন্য সুদের কারবার করে। এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে।

আল্লাহ্ এর থেকে রক্ষা করেছেন এবং যাকাতের ব্যবস্থা করেছেন। যাকাত প্রদান কর। এর ফলে তোমাদের টাকা পয়সা বৃদ্ধি পাবে। তোমরা এ রহস্য অবগত নও কিন্তু আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। আল্লাহ্র আদেশ পালন কর এবং নিয়মিত যাকাত আদায় কর। আল্লাহ্ তোমাদের ধনী করবেন। হে মানুষ! এমন কিছু করোনা যাতে আল্লাহ্র বিধান বিস্মৃত হও, আল্লাহ্র আদেশ অবহেলা কর এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিধান প্রতিষ্ঠা কর, নিজের মনের বাসনা অনুসরণ কর এবং ধর্ম থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থেকে দূরে চলে যাও। যখন তোমরা আল্লাহর নাফরমান ও অবাধ্য হও তখন আল্লাহ্ই তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির ও ফেতনা ফাসাদকারী লোক সৃষ্টি করবেন যারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তোমাদের মধ্যেই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকবে। তারা ফেতনা-ফাসাদ লুট-পাট, ডাকাতি, হত্যা ও অপহরণ প্রভৃতি জঘণ্য কাজ করে তোমাদের অস্থির করে তুলবে। এবং যখন জুলুম ও অন্যায় অধিক মাত্রায় বেড়ে যায় তখন আল্লাহর কুদরতী আইন বদলা নিতে শুরু করে। এবং তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও শাস্তি অদৃশ্যভাবে চেপে বসে। তখন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাও। যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে একটু ঘুরে ফিরে দেখ। এই ভ্রমণ ও পর্যটনের মধ্যে যে সব ধ্বংসাবশেষ ও বিরান জনপদ দেখতে পাবে সেগুলো গভীরভাবে দেখ যে, আজ তাদের নাম নিশান পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। হে মানুষ সকল! আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র কাছে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহর নবী ও পয়গম্বরগণ মানুষকে শান্তি, সত্য ও হেদায়েতের পথ ও রাস্তা কী তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজের বান্দার উপর অশেষ রহমত ও করুণা করে থাকেন। যাদের উপর আল্লাহ্ করুণা করেন তারা খুশী হয়। আর যাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ ও গযব আপতিত হয় তারা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট ও অভিযোগকারী হয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও সমীচিন বিবেচনা মতে যাকে ইচ্ছা

তাকে পরীক্ষা করেন। যাতে তিনি দেখতে পান কে কে তার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয় না। আর কারা বিপদে পড়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাঁকে স্মরণ করে। বিপদ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুসারে আসে এবং যায়। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মৃত্যু দান করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন। এ সব কিছু তার ইচ্ছা ও খুশীর উপর নির্ভর করে। আল্লাহর হুকুম এই যে কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে। যে দিন আসবে ঐ দিন সকলের হিসাব নেওয়া হবে এবং সেই অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা শুনানো হবে। আল্লাহর কিতাব কুরআন তোমাদের হেদায়েত ও নছিহতের জন্য এসেছে। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কর্মপদ্ধতি তোমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যা কুরআন পাঠ কর। ঐ অনুসারে আমল কর। এবং জীবনকে কুরআনের আলোকে গড়ে তোল। এ গ্রন্থ কিয়ামত পর্যন্ত সঠিক ও সত্য পথের দিক নিদের্শনা করবে এবং সুন্দর জীবনের উপদেশ দিবে। কখনও পরিবর্তিত হবে না। যদি তোমরা আল্লাহর এই কিতাবের উপর আমল কর এবং অন্তরে পর জগতের বিশ্বাস রাখ তাহলে তোমাদের জন্য মুক্তি ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিয়ামত বড় ভয়ংকর দিন হবে। ঐ দিন আল্লাহর আদালতে আমল পরিমাপের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। ঐ দিন আসার পূর্বেই তোমরা নিজেদের পাপ কাজ থেকে তওবা কর। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও মাগফিরাত চাও। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী গাফুরুর রাহীম। এই কুরআন সব কিছু স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী এক মহান গ্রন্থ। এতে নানা ধরনের উপমা দিয়ে বুঝানো হয়েছে। যে হতভাগ্য, যালিম ও পাপী সে কোন দিন কুরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারবেনা। আল্লাহ্ এমন লোকদের অন্তরে সীল মেরে দিয়ে থাকেন। যারা পাষাণ হৃদয় তাদের কাছ থেকে পুণ্য করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। হে আল্লাহর রাসূল। আপনি ধৈর্য ধারণ করতে থাকুন। সহনশীলতা ও ধৈর্যের রাস্তা আকড়ে থাকুন। আল্লাহ্র নিকট আপনার ধৈর্য ধারণ খুবই পছন্দনীয়। আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য।

তারাবীহ্ অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে। এদিকে সূরায়ে লোকমান শুরু হচ্ছে। বিষয়বস্তু একই। মুসলামানদের শান্তনার বাণী শুনানো হচ্ছে। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতায়। যা কিছু ঘটে সব আল্লাহর ইচ্ছা ও ইরাদা অনুসারে ঘটে। হজরত লোকমান একজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। একই সাথে বাদশাহ্ও ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে অশেষ জ্ঞান ও হেকমত দান করে ছিলেন। লোকমান নিজের পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ হাজারো বছর আগের। কিন্তু আজও তা অম্লান আছে এবং চিরকাল থাকবে। এবং মুসলমানদের জন্য তাহা কুরআনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এবং ধর্মের একটি অংশ করা হয়েছে।

কুরআন হিকমত ও জ্ঞানের এক উজ্জ্বল গ্রন্থ। এর থেকে ছোট ছোট উপদেশ পাওয়া যায়। মনোমুগ্ধকরভাবে যদি কোন কথা বলা হয় তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হয় এবং অন্তর স্পর্শ করে। ঐ উপদেশ শুনুন ঃ

১। আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে কাকেও শরীক করোনা। শিরক খুবই বড় পাপ।

২। পিতামাতার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাঁদের হকের প্রতি খেয়াল রাখবে। তাঁদের আদেশ মান্য করবে। পিতা-মাতার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করবে। তাঁদের অবাধ্যতা করবেনা। সু-সন্তান পিতা মাতার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বরকত ও কল্যাণের উৎস।

৩। আল্লাহ্‌র ইবাদত ও সাধনার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবে। তোমার যা কিছু চাওয়ার আছে আল্লাহর কাছেই চাইবে। তিনিই প্রার্থনা শ্রবনকারী।

৪। আল্লাহ্ অন্তর ও বাহির সবকিছু অবগত। কোন গোপন কথা কোন কিছু তাঁর থেকে গোপন থাকেনা। আল্লাহ সব সময় তোমাকে দেখছেন।

৫। নিয়মিত নামাজ আদায় করবে এবং অন্যকে নামাজ পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। নামাজ নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে।

৬। তোমার জীবন বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণ করবে। এবং সহনশীলতা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করবে। ধৈর্য ইবাদতের পর্যায়ে পড়ে।

৭। মানুষের সাথে বিনয়, নম্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের সাথে মিলবে। অহমিকা, গর্ব থেকে দূরে থেকো।

৮। মানুষের সাথে যখন কথা বলবে তখন নিম্নস্বরে ও মধুর বচনে কথা বলবে। চীৎকার করে কথা বলবেনা। সবচেয়ে খারাপ ও কর্কশ আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।

৯। সুন্দর ও অনুপম চরিত্রের অনুশীলন কর। শিষ্টাচারের প্রতি খেয়াল রেখ। ছোটদের সাথে মমতা ও বড়দের প্রতি সম্মান দেখাবে।

১০। সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলবে। ঐ দিনকে ভয় করবে যেদিন পিতা পুত্রের কেউ কারও কাজে আসবে না।

১১। আখিরাতের উপর বিশ্বাস রেখো। পরকালের ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই ভাল জানেন যে গর্ভবতী নারীর পেটে যে বাচ্চা পয়দা হচ্ছে সে কেমন। সে নারী না পুরুষ। আগামী কাল কে কোন কাজ করবে। আগামীকাল দিন কেমন করে শুরু হবে। কে কখন পয়দা হবে। কোথায় সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। কোথায় মরবে এবং কোথায় তার কবর হবে।

নূতন সূরা 'সিজদা' শুরু হচ্ছে। মহাজ্ঞানের ভান্ডার এই গ্রন্থের হেদায়েত এবং যার উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সে মহান রাসূলের সত্যবাদিতা এমন এক সত্য বর্ণনা করে যা আলিফ, লাম, মিম , দ্বারা আরম্ভ হয়েছে ঐ সব সূরার বিশেষ বিষয়বস্তু। যেরূপ কুরআন পূর্বের সমস্ত ঐশী গ্রন্থসমূহের শেষ সংস্করণ এবং ধর্মীয় শিক্ষার নির্যাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) সমস্ত পয়গাম্বরের উত্তরাধিকারী এবং শেষ নবী যিনি সত্বা ও গুনাবলীর একটি পূর্ণ নমুনা এবং যিনি সমস্ত পয়গম্বরদের শিক্ষা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য দিনরাত চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থাকেন। এর জন্য তিনি কোন বিনিময়ের আশা রাখেন না। তাঁর একমাত্র ধ্যান হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা। আল্লাহ প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের প্রিয় বন্ধুকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাকে পথ দেখাচ্ছেন। আল্লাহর কাছে তার বন্ধু বড়ই প্রিয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে এবং যিনি এই গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন তার সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। সৃষ্টির এই কারখানায় আল্লাহর সত্বা ও গুনাবলী ও মহিমার নিদর্শনসমূহ দেখার পরও যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনেনা, আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা মৃত্যুর পর যখন হুশ ও চেতনা শক্তি হারাবার পর আখিরাতকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে তখন আর কি হবে। পরিণতিতো সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। আল্লাহ্‌র ফয়সালা অটল। হে মানুষ সকল! এখনও সময় আছে। জীবন তোমাদের অবকাশ দিয়েছে। তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। মাগফিরাত চেয়ে নাও। তিনি তওবা কবুল করেন। তিনি ক্ষমাকারী। নিজের আমল সংশোধন কর। বিশ্বাস পবিত্র রাখ। পুণ্য ও পবিত্র জীবন যাপন কর। যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে মনের পবিত্রতা ও ইসলামের শান্তিময় বিধানের পর। এই নিখিল বিশ্ব, এর উত্থান ও পতন, এবং বিভিন্ন জাতির ধ্বংস ও বিনাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। হে রাসূল! ধৈর্য ধারণ করুন। সাহসে বুক বেঁধে প্রতিক্ষা করুন।

এর পর সূরায়ে আহযাব শুরু হচ্ছে। জাহেলী যুগে তিনটি বিষয় প্রসিদ্ধ ছিল: (এক) জ্ঞানী বুদ্ধিমান শক্তিধর ব্যক্তির মধ্যে দুটি হৃদয় থাকে। (দুই) নিজের স্ত্রীকে মর্যাদা ও সম্মান দেখাবার খাতিরে নিজের মা বলে আহবান করা। (তিন) পালক পুত্রকে সত্যিকার সন্তানের সম মর্যাদা প্রদান করা। এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র হুকুম হলো এটা যে কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় থাকা অসম্ভব। এটা সঠিক নয়। সকল মানুষ একই রকম। তাদের শারিরীক গঠন ও বুদ্ধি একই রকম। দুটি হৃদয়ের অধিকারী কেউ নয়। অবশ্য তাদের ক্ষমতা, প্রতিভা ও বুদ্ধি বিভিন্ন হতে পারে দ্বিতীয় বিষয়টি খুবই নিন্দাজনক ও ভৎর্সনাযোগ্য। তোমাদের স্ত্রী মায়ের মর্যাদা পেতে পারে না। মায়েদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। স্ত্রীর স্থান মায়ের স্থান থেকে অনেক নিম্নে। তোমরা স্ত্রী পরিবর্তন করতে পার এবং দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনতে পার। কিন্তু মাকে বদলাতে পারনা। মুখের কথায় কেউ সত্যিকার মা হয় না। স্ত্রী ও মায়ের মর্যাদা পৃথক ও আলাদা। কেউ স্ত্রীকে মা মনে করে যদি ডাকে তাহলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তোমাদের মুখে

বলা পুত্র সত্যিকার পুত্রের স্থান ও মার্যাদা পেতে পারে না। সত্যিকার সন্তান তোমাদের উত্তরাধিকারী হবে, পালিত পুত্র নয়। তোমরা পালিত পুত্রকে তাদের আসল জন্মদাতা পিতার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকবে। তাদের সঠিক জন্মের কথা গোপন করবে না। ইহা পাপের কাজ। রাসূলুলাহর (সাঃ) মর্যাদা সকল মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ও উঁচু। তাঁর মার্যাদা তোমাদের কাছে তোমাদের বাপ দাদার চেয়েও অধিক। রাসূলুল্লাহর স্ত্রীগণ মুসলমানদের কাছে মাতৃতুল্য। তাদের সম্মান পবিত্রতা ও মর্যাদার খেয়াল রাখবে। আল্লাহ সকল রিস্তা ও সম্পর্ক কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সকলের মর্যাদা ও অবস্থান পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এসব কথা সংরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ) থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আদমের পরে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুব থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। ইসা ও মরিয়ম থেকেও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে। আল্লাহ্র হুকুম পালন ও মান্য করবে। এই সূরাতে মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের সাথে ইসলামের লড়াই জংগে খন্দক জংগে আহযাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সূরার নাম আহযাব ও গাযওয়ায়ে খন্দক উভয়ই। আহযাব অর্থ সেনাবাহিনী। বিভিন্ন দলের সম্মিলিত বহিনীর নাম আহযাব। ঐ সব কাফির ও ইয়াহুদীদের সাথে মুসলমানদের একটি পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি ছিল। তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। এর ফলে যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল চুক্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়া। এবং তাদেরকে মদীনা থেকে নির্বাসন দিয়ে দূরে বহিষ্কার করেছিলেন। তাদের ঘর, দুর্গ, বাগিচা সবকিছু মালে গণিমাত হিসাবে মুসলমানদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময় হুজুর পাকের সহধর্মিনীগণ নিজেদের জন্য সম্পদ, সোনা এবং অন্যান্য ভোগের সামগ্রী-চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন। এবং সতর্ক করে দেন। এর ফলে তাঁর স্ত্রীগণ অসন্তুষ্ট হন। হুজুর পাক (সাঃ) তখন বলেন যে সব নারী আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ইচ্ছা ও বশ্যতার বিপরীত অসন্তুষ্ট হয়, ক্রোধ প্রকাশ করে ও অসুখী থাকে তাদেরকে রাসূলুল্লাহর ঘর ত্যাগ করে মুক্তি লাভ ও বিদায় হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র অষ্টাদশ রজনী

(বাইশ পারা)

(সূরা আহজাব, সাবা, ফাতির, ইয়াসীন)

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পূত পবিত্র সহধর্মিনীগণ মুসলমানদের মা। তাঁদের চরিত্র জীবন পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মপদ্ধতি থেকে আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের অনুগত ও বাধ্য হবে, আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুন সওয়াব প্রদান করবেন। তাদেরকে উত্তম সম্মানজনক রিযিক দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র স্ত্রীদের জন্য বৈধ নয় যে তাঁরা অপরিচিত পরপুরুষের সাথে কথা বলে। অথবা তাদের প্রশ্নের জওয়াব দেয়। প্রয়োজন পড়লে নম্র ও নিম্নস্বরে জওয়াব দিবে। নামাজ নিয়মিত পড়বে। যাকাত আদায় করবে। পাক-পবিত্র থাকবে। ভিতরে বাহিরে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকবে। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকবে। এই হুকুম সাধারণ নর-নারীর উপরও প্রযোজ্য। কোন মুসলিম নর অথবা নারীর জন্য অনুমতি নেই যে সে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে। অথবা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে দলিল, প্রমাণ, তর্ক-বিতর্ক, ওজর-আপত্তি, বাহানা ও বৈধতার উপায় খুঁজতে থাকে। যে আদেশ হবে তা পালন করা আবশ্যকীয়। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসুল ভাল জানেন যে, হুকুম কেমন এবং কেন? এখানে হুজুর (সাঃ) এর গোলাম, পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নব যিনি পুত্রবধু ছিলেন শ্বশুর (হুজুর সাঃ) তাকে বিবাহ করেন। মুখে বলা পুত্র সত্যিকার পুত্র হয় না। জাহেলী যুগের পর এ প্রথার সমাপ্তি ঘটেছিল। হে মুসলিম! পরস্পর ভালবাসা ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাক। একে অন্যের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্র জিক্র ও স্মরণে সকাল-সন্ধ্যা মগ্ন থাক।

নারীর বিবাহ ও তালাকের উপর এখানে এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সূরায়ে বাকারাহ ও সূরায়ে তালাকে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্কের মর্যাদা এবং বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময় চারের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি নেই। কাউকেও অনুমতি দেওয়া হয়নি যে চারের অধিক স্ত্রী তাক সাথে রাখবে। অতিরিক্ত স্ত্রী তালাক দিয়ে যাকে পছন্দ হয় তাকে ঘরে রাখবে। এটাই আল্লাহ্র হুকুম। মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয়। মানুষকে রাসুলুল্লাহর মাহফিলের আদব-কায়দা শিখানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহর স্ত্রীর সাথে তার পরে কোন ব্যক্তি বিবাহ করবে না। তারা উম্মতের জননী। রাসুলুল্লাহর মর্যাদা খুবই উঁচু। আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তাগণ উর্ধ্বলোকে সব সময় স্বীয় বন্ধুর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ

করে থাকেন। হে মুসলিম! সব সময় রাসূলুল্লাহর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে। সর্বদা দরুদ পড়বে। এতে আল্লাহ খুশী হন। ফেরেস্তোগণ ও মুসলমানদের সাথে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করেন। এই প্রার্থনা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। যারা মুমিন নর-নারীকে বিনা কারণে উত্যক্ত করে, শারিরীক ও মানসিক ক্লেশ ও কষ্ট দেয় খামাখা তাদের অতিষ্ট করে, আল্লাহ্ তাদের উপর লানত পাঠাতে থাকবে। হে আল্লাহ্র সুহৃদ! আপনি নিজের ও মুসলমানদের স্ত্রীগণকে বলে দিন যে, যখনই তাঁরা কোন প্রয়োজনে ঘরের বাহির হবে তখন যেন তারা নিজেদের চেহারা অবগুণ্ঠন বা বোরকা দিয়ে আবৃত রাখে। পরপুরুষদের থেকে নিজের দৃষ্টি অবনত রাখে। খুব অল্প কথা-বার্তা বলে। এই চাঁদর ও চার দেওয়ালের মধ্যে অবস্থান করা মুসলিম নারীর বিশেষ পরিচয়। নারী পুরষের জন্য সৌন্দর্যের ভূষণ। যাদের অন্তরে কুমতলব ও বেহায়াপনা থাকে তাঁরা নারীর স্বাধীনতা থেকে ফায়দা লাভ করার চেষ্টা করে।পর পুরুষেদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটা আবশ্যক যে নারী নিজেই নিজের হেফাজতের ব্যবস্থা করবে। আল্লাহ্র কর্ম বিধানকে মুসলিম নর নারীর জন্য হুকুমের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। তারা যেন এর অনুস্মরণ করে। কোন ওজর-আপত্তি বা প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্য তারা আল্লাহ্র লানতের শিকার হবে। কিয়ামতে তাদের দ্বিগুন শাস্তি দেওয়া হবে। হে মানুষ সকল! তোমরাও বনী-ইসরাইলের মত আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য হয়োনা। আল্লাহকে ভয় কর। নিজেদের সংশোধন কর। আল্লাহ ক্ষমাকারী।

এরপর কুরআনের ৩৪ তম সূরা 'সাবা' শুরু হচ্ছে। আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি দিয়ে সূরার আরম্ভ। আল্লাহ্ সমধিক অবগত যে দিনে রাত্রে পৃথিবী থেকে কোন কোন মুসিবত, আকাশের দিকে যায়। আর কি কি করুণা ও রহমত আকাশ থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের উপর অবতীর্ণ হয়। বালা মুসিবত বিপদ ও শাস্তি প্রেরণকারী এবং তাদের দূরকারী আল্লাহ। মানুষের দিবারাত্র আল্লাহর আশ্রয় ও মাগ্‌ফিরাত এর জন্য প্রার্থনা করা উচিত। অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্র ভয় ও ভীতি থাকা উচিত। এখানে হযরত দাউদ (আঃ) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দিন রাত আল্লাহর প্রশংসা ও মুনাজাত করতেন। আল্লাহ তার জন্য লোহাকে নরম বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি লৌহ শিল্পে কাজ করতেন। তিনি একজন পুণ্যবান আল্লাহ্র অনুগত বান্দা ছিলেন। তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আল্লাহ্ তাকে অশেষ নেয়ামত দান করেছিলেন। এবং সুলাইমান (আঃ) কে তাঁর উত্তরাধিকারী করেছিলেন। বাতাসকে সুলাইমানের করতলগত করেছিলেন। তামা তার হাতে বিগলিত হয়ে পানির ন্যায় প্রবাহিত হতো। জ্বিন ও শয়তানকে তার অনুগত করেছিলেন। তাদেরকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতেন এবং সর্বদা তাদেরকে ব্যস্ত রাখতেন। যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন জ্বীনরা জানতেও পারেনি যে সুলাইমান কখন মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্র হিকমত কৌশলের জন্য তাঁরা এ খবর পায়নি। তাঁর মৃত্যুর পরও জ্বীনরা তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর কাজ কর্মে নিয়োজিত ছিল। সাবা বাসীদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের ফলের বাগান ছিল। ফসল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র অংশ তারা ফসল থেকে বের করত না। গরীব অভাবগ্রস্তদের দান খয়রাত করত না।

তাদের বাগানের উপর ঝড় ও তুফান আসে। এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ অকৃতজ্ঞদের শাস্তি প্রদান করেন আর কৃতজ্ঞ বান্দাদের আরও বেশী করে নিয়ামত দান করেন। ইহাই আল্লাহর বিধান। আমি হুজুর (সাঃ)-কে মানুষ ও জ্বীন উভয়ের পয়গাম্বর করেছি। উভয়ই হুজুর (সাঃ)-এর উম্মত। জ্বীনদের মধ্যে কাফিরও আছে মুমিনও আছে। শয়তানের সাথী এবং সাগরিদও আছে। মানুষের মধ্যেও এমন লোক আছে যাদের মধ্যে শয়তানের গুন দেখতে পাওয়া যায়। এরপর কুরআনের ৩৫ তম সূরা ফাতির শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার সাথে এই সূরার আরম্ভ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজীর উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ্ রিযিকের নিয়ামতও দান করেছেন। হে মানুষ সকল! তোমাদের এই অকৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করা শয়তানী পন্থা। এ থেকে বিরত থাক। শয়তান তো এই চায় যে তোমরাও তার মত অকৃতজ্ঞ হও। এবং সে তোমাদেরকে সোজা রাস্তা থেকে বিপর্যয়ে নিয়ে যেতে পারে। তোমরা কি শয়তানের অনুসরণ করবে? আল্লাহ্‌কে ভূলে যাবে? আমি শয়তানের সাথে তোমাদেরকে জাহান্নামের আযাবে নিক্ষেপ করব। শয়তান তোমাদের সাথে লেগে থাকে এবং তোমাদের প্রত্যেকটি খারাপ কাজকে সুন্দর করে দেখায়। তোমরা ভাল-মন্দের মধ্যে প্রার্থক্য করনা। হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন যাতে তোমরা বেশী বেশী পূণ্য ও ভাল কাজ কর। দীর্ঘ জীবন ও স্বল্পআয়ু এ সব 'লাওহে মাহফুজ' বা সুরক্ষিত ফলকে আগের থেকেই লিপিবদ্ধ আছে। সেই অনুযায়ী মানুষ জীবন লাভ করে। হে মানুষ! তোমরা নিজের জীবনকে আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত কর। নিয়মিত নামাজ পড়, যাকাত প্রদান কর জীবনকে পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্নরূপে গড়ে তোল। আকীদা বিশ্বাসের পবিত্রতার জন্য জীবনের কাজ ও পবিত্র হওয়া জরুরী। জীবিত ও মৃত এক রকম হতে পারেনা। জীবিত মানুষকেই হেদায়েত ও নসিহত করা হয়। তাদেরকে কুরআন পাঠ করানো হয়। কবরস্থানের মৃত ব্যক্তিদেরকে কুরআন পড়ে হেদায়ত করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (দঃ) জীবন্ত মানুষকে হেদায়েত ও উপদেশ দেওয়ার জন্য এসে ছিলেন। এই কুরআন তোমাদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। তোমাদের ইবাদাত, তোমাদের নামাজ, দান সাদকা আল্লাহর সাথে উত্তম ব্যবসা ও বাণিজ্য। এই কারবারে কখনও ক্ষতি হবেনা। হে মুসলমানগণ! তোমরা সৌভাগ্যবান যে, তোমাদেরকে কুরআনের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। এর দ্বারা তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকবে। প্রার্থনা করতে থাকবে। নিজের মাগ্‌ফিরাত ও ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ প্রার্থনা শুনেন।

এরপর ৩৬তম সূরা ইয়াসীন শুরু হচ্ছে। এই সূরাটি পুরোপুরি আল্লাহর মহাজ্ঞান ও হিকমতে ভরপূর। এতে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) যার উপর এই গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। এর সুবিন্যস্ত আয়াত কুরআন এবং সাহেবে কুরআন এর পরিচয় বর্ণনা করছে। কুরআন স্বয়ং নিজে নীরব এবং হেদায়েতের দফ্‌তর খুলে দিয়েছে। দ্বিতীয়জন কুরআন পাঠ করে সকলকে শুনাচ্ছেন এবং তিনি হেকমত ও

জ্ঞানের কথা শুনাতে, ভয় ও ভীতি প্রদর্শন করতে এসেছেন। এবং সুসংবাদ ও শুনিয়ে যাচ্ছেন। এবং উভয়ই মানুষকে সোজা পথের দিকে নিয়ে যেতে চায়। হেদায়েত ও উপদেশ দেয়। মানুষকে দেখুন, সে কেমন অজ্ঞ। তার কাছে অল্প বুদ্ধি এবং জ্ঞান আছে। কিন্তু এই স্বল্প জ্ঞানের গর্ব ও অহংকার তার গলায় গুমরাহীর বেড়ী ঝুলিয়ে দিয়েছে। অহমিকার এই বেড়ী তার গলায় আটকে থাকার কারণে তার ঘাড় বাঁকা হয়ে গেছে। সে না আগে অগ্রসর হতে পারে না পিছনে হটতে পারে না এদিকে ঝুকে দেখতে পারে না বাঁদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখতে পারে। সে তো নিজের অবস্থা থেকে একেবারে বেখবর এবং ভবিষ্যত ও তার কাছে অজ্ঞাত। তার না নিজের দুনিয়ার খেয়াল আছে না নিজের অবস্থা সম্পর্কে কোন হুশ আছে। নিজের আখেরাত এবং আখেরাতের জীবন সম্পর্কে তার কোন বিশ্বাস ও ধারণা নেই। যেন তার সামনে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সে আগে পিছে কিছুই দেখতে পায়না। দেওয়ালের স্বপ্নে ও চিন্তায় সে মগ্ন। তার কিছু দৃষ্টিগোচর হয়না। মানুষ যদি নিজেই বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর চাদর মুড়ি দিয়ে বেহুশ ও গাফেল হয়ে শুয়ে থাকে তাহলে হেদায়েত ও উপদেশের কোন বাণী তাকে জাগ্রত করতে পারে? বরং আল্লাহ্ তার উপর অপমান ও লাঞ্ছনার আর একটি চাদর বিছিয়ে দেন। গাফেল হয়ে ঘুমাতে থাক। পূর্বের জাতিসমূহের সাথে কি করা হয়েছে। তারাও নবীর শিক্ষা এবং সত্যের দিকে আহবান থেকে গাফেল হয়েছিল। নিজের আখিরাত এবং পরিণাম সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিল। নবীকে, ঐশীগ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহকে অবিশ্বাস করেছিল। তাদের অস্বীকার করেছিল। তাদের পরিণতির কথা কুরআন এদেরকে শুনাচ্ছে। যাতে তারা ঐসব ঘটনা ও কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নাফরমানী, অজ্ঞতা, দুনিয়ার আসক্তি, অবাধ্যতার গ্লানি এবং তামাশা তাদেরকে এতদূর আচ্ছাদিত করে রেখেছে যে ঈমানের কোন বাণী হেদায়েতের কোন কথা তাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। তারা কুরআন শুনে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেনা যে কি পড়া হচ্ছে কি শুনানো হচ্ছে। তুমি তাদের যতই ধমকাও, বুঝাও কোন ভাবে তারা মানবেনা। তাদেরকে ভয় দেখানো, ধমকানো সব বরাবর। বুঝানো ও হেদায়েত করা তাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে যারা বুঝার শক্তি রাখে। যাদের হৃদয় নরম। যারা জীবন্ত তারাই শুনে। যারা মৃত, বধির এবং অন্ধ তাদের তুমি কি বুঝাবে, কি ভয় দেখাবে। কবরে কি মৃত ব্যক্তি হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করতে পারে? তোমার সকল পরিশ্রম বৃথা যাবে। মানুষের ভাগ্যে লেখা হয়েছে কে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে অথবা গোমরাহ থেকে যাবে। একথা প্রথমে 'লাওহে মাহ্ফুজে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত আছেন। তিনি সব কিছু জানেন। এই সূরায় সাত মুবিনের বর্ণনা রয়েছে। এই সূরা কুরআনের অন্তর। মুমিনের হৃদয় ঐ সপ্ত মুবিন দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে। এবং তারা হেদায়েত পেতে থাকবে। এই সূরার মহিমাময় প্রভাব এইযে, যদি মৃতের উপর পড়া হয় তাহলে মৃত জীবিত হবার উপক্রম হয়। মৃত্যুকালীন বেহুশীর সময় পাপীদের উপর পড়লে রূহ শান্তি পায়। তাদের প্রাণ আযাবের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাহির হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষার সার্বিক দোয়া সম্বলিত এই সূরা।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র উনিশতম রজনী

(তেইশ পারা)

(সূরা-ইয়াসীন, সাফফাত, সাদ, যুমার)

১। সূরার প্রথম মুবিন ইমাম মুবিনে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বব্যাপী। তিনি সব কিছুর মালিক ও প্রভু। সবার নেতা। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর জ্ঞান 'লাওহে মাহফুজে' প্রথম থেকেই লিপিবদ্ধ। তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রথম নেতা এবং শেষ নেতা এবং এই সমগ্র বিশ্বের উপর তিনি সাক্ষী।

২। দোয়ালাল মুবিনে যে আয়াত শেষ হয়েছে তাতে আল্লার সত্ত্বাও গুনাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অমুখাপেক্ষী তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নাই । আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও ইবাদত ত্যাগ করে অন্য কারও ইবাদত করা ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শামিল। সুস্পষ্ট গোমরাহী এবং ধ্বংস।

৩। দোয়ালাল মুবিন। ভাল কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অযুহাত খাড়া করো না। ওজর-আপত্তি, বাহানা তৈরী করবে না। কাজ না করার জন্য তর্ক-বিতর্ক দ্বারা বৈধতা খুজে বেড়িও না। এটা স্পষ্ট গোমরাহী। আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষকে হেদায়েত দান করেন এবং কেবলমাত্র একবারই দান করেন। টাল বাহানার ফলে হেদায়েতের এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এবং তা গোমরাহী ও ধ্বংসের দিকে অবধারিতভাবে ঠেলে দেয়। তখন এই গোমরাহী ও ভ্রান্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারেনা। তোমরা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবে এবং আল্লাহ্ থেকে ও দূরে চলে যাবে।

৪। বালাগ মুমিন। রাসুলুল্লাহ্‌র কাজ হলো দ্বীনের শিক্ষা এবং পূর্ণ কুরআন তোমাদের কাছে পৌছে দেওয়া। তিনি তোমাদেরকে কুরআন পুরাপুরি পাঠ করে শুনিয়ে দিয়েছেন। নিজের কর্মময় জীবন, চরিত্র কুরআন অনুযায়ী তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রসূলের অনুসরণ করা তাঁর কথা মেনে চলা তোমাদের জন্য ফরজ। তোমরা স্বাধীন ও আজাদ। জ্ঞান, বুদ্ধি ইচ্ছা ও কর্মের পূরা স্বাধীনতা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। রাসূলকে মেনে চল অথবা তাঁকে অমান্য করে জীবন অতিবাহিত কর। এটা তোমাদের ইচ্ছা।

৫। আদু-উ-উম মুবিন বা প্রকাশ্য শত্রু। যদি জীবনে সুখ ও শান্তি পেতে চাও তাহলে কুরআনকে আঁকড়ে ধর। প্রত্যহ কুরআন পাঠ কর এবং অপরকে বুঝাও। যে সব লোক মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে হটিয়ে দুনিয়ার খেল-তামাশার মধ্যে লিপ্ত

করে। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার খোঁজে বের হয় এবং দ্বীন ও আখিরাত থেকে গাফিল ও নির্লিপ্ত থাকে তারা মুমিনদের শত্রু। তাদের থেকে সতর্ক থাক।

৬। কুরআনুম মুবিনঃ দুনিয়ার সাফল্য ও পরকালের জীবনের প্রতি যদি খেয়াল থাকে তাহলে কুরআন পড়। কুরআনের হেদায়েতের উপর আমল কর। তোমার রোগের চিকিৎসা কুরআনের আয়াতে শিফার মধ্যে নিহিত আছে। তোমার বিপদ ও সমস্যার সমাধান কুরআনের বর্ণিত জীবন পদ্ধতি, ধৈর্য ও নামাজের মধ্যে রয়েছে। কুরআন তোমার পথ প্রদর্শক। সবকিছুর জ্ঞান হেকমত কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। কুরআন থেকে যদি পথের দিশা গ্রহণ কর তবে পরকালের জীবন শুধরে যাবে। পার্থিব জীবন সহজ ও সফল হবে।

৭। খাছমুন মুবিনঃ তুমি কি জান যে মানব প্রকৃতি কি পরিমাণ ঝগড়াটে? মানুষ নিজকে মহাজ্ঞানী মনে করে। ভেবে চিন্তে দুর দুর থেকে ফিতনা-ফাসাদের বিষয় সন্ধান করে নিয়ে আসে। নতুন নতুন কথা ও প্রমাণাদি বৈধতা প্রমাণের জন্য সৃষ্টি করে বিস্ময়কর ব্যাখ্যা পেশ করে। অন্ধভাবে তর্ক করার ধৃষ্টতা দেখায়। তার অন্তরের অশুভ কদর্যতা ও কথা-বার্তা, স্বার্থপরতার দর্শন মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। এবং দ্বীনের রাস্তা থেকে পৃথক করতে থাকে। দ্বীনকে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে জ্ঞানের কষ্ঠি পাথরে ঘসে ঘসে দেখে। সে নিজেই নিজের শত্রু। নিজেই পাপ, গোমরাহী, অসতর্কতা ও অলসতার দিকে ধাবিত হয়। নিজের নরক নিজেই তৈরী করে। নিজের ধ্বংসের জন্য নিজেই দায়ী। রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ কষ্টে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। ধর্মতো সাধারণতঃ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস ও দৃঢ় ইয়াকীন থেকে বেশী কিছু দাবী করে না। আরবের মুর্খ বুদ্ধু যখন ঈমান ও বিশ্বাসের আলোকে আলোকিত হয় তখন সে আবুবকর, ওমর, উসমান ও আলী হয়ে যায়। এজন্য যে তারা রাসূলের কথা শুনেছিল। অদৃশ্যের পর বিশ্বাস করে তারা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে আর ও দৃঢ় করতে পেরেছিল। আখিরাতকে সুন্দর করতে পেরিছিল। কুরআন বারবার বুদ্ধি, জ্ঞান ও বোধ শক্তিকে আহবান করেছে। এবং বলেছে এই নিখিল সৃষ্টি জগত, জীবন ও মৃত্যুর উপর চিন্তা ভাবনা কর। দুনিয়াতে যা কিছু তোমরা অর্জন করে ঠাট-বাটের ব্যবস্থা করবে তা তোমাদের কাফনের সাথে মিশে চলে যাবে। দোযখের আগুনের চাদর হবে। এবং কবরে তারপরেই তোমাদের শয়ন করতে হবে। বুদ্ধিকে দ্বীনের অনুগত কর। দ্বীনকে বুদ্ধির অনুগত করোনা। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা হবেনা। পৃথিবীর জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অবকাশের সময় খুব কম। আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখ। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ কারও উপর অন্যায় ও যুলুম করেন না।

আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন। তার ইবাদত ও বন্দেগী করার জন্য। খেলা-ধূলা আমোদ-প্রমোদ করার জন্য নয়। কুরআনের হেদায়েত সবার জন্য। যার ইচ্ছা সে ধর্মের পথে চলুক বা অধর্মের পথে চলুক। কিয়ামতের দিন এর নিষ্পত্তি হবে। মানুষ নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ। সে আল্লাহ্র অশেষ নেয়ামত ও করুণার শুকরিয়া আদায় করে না। এক ফোটা অপবিত্র রক্তের দ্বারা তাকে সৃষ্টি করে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনা হয়। এরপরও সে আল্লাহ্র ব্যাপারে, দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে সোচ্চার হয়। আল্লাহ্কে অস্বীকার করে দ্বীন থেকে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়। সে নিজেই নিজের শত্রু। আল্লাহ্ নিরঙ্কুশ শক্তির অধিকারী। যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন বলেন হও এবং তা হয়ে যায়। আখিরাতে দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে। ঐ দিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এরপর কুরআনের ৩৭তম সূরা ছাফ্ফাত শুরু হচ্ছে।

কুরআন তিনটি জিনিসের শপথ ও কছম খেয়েছে। প্রথমে ঐ সব মুমিন মুসলমান যারা যমীনে সারিবদ্ধ হয় এবং আকাশের ফেরেশ্তা যা সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে দন্ডায়মান হয় এদের কসম। দ্বিতীয়তঃ সারিবদ্ধ হয়ে ইসলামের মুজাহিদরা কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্য ও মিথ্যার মাঝে আগে অগ্রসর হয় এদের কছম খাওয়া হয়েছে। এবং ঐ সব নামাজীদের শপথ করা হয়েছে যারা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে কুরআন পাঠ করেন কুরআন শ্রবণ করেন এদের কছম খেয়ে বলা হচ্ছে যে তোমাদের আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে এক-অদ্বিতীয়। তিনিই এই আকাশ ও পৃথিবীর নিখিল জগতের মালিক ও প্রভু। তাঁর বাদশাহী সর্বত্র। একটুখানি চোখ তুলে তাঁর রাজধানী দেখ। কেমন আলো ঝলমল, উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় সৌরজগতের কাফেলা নক্ষত্ররাজি নিয়ে বের হয়েছে। সুরাইয়া নক্ষত্র, উজ্জ্বল তারাও ছায়াপথ। শুধু এই নয়। এখানে আকাশের চৌকিদারও নিজের পরিচয় গোপন রেখে উপরে আকাশসমূহের পাহারা দেয়। শয়তানের যেটুকু শক্তি আছে তার দ্বারা সে আগুন ও ধোঁয়ার আকৃতিতে আকাশ পর্যন্ত চলে যায়। সেখানে আকাশসমূহে ফেরেশতাদের গুনগুন আওয়াজ, আনাগোনা থেকে আল্লাহর ভেদ ও রহস্য, গায়েবী এলমের আন্দাজ করে। পুনরায় এসে পৃথিবীর অধিবাসীদের নিজের শিষ্য চামুন্ডা দ্বারা গায়েবের কথা বলে নিজের বাহাদুরী দেখায়। এরূপ কোন আকৃতি বানিয়ে শয়তান চুপিসারে আকাশের দিকে এলে আকাশের পাহারাদার নক্ষত্র তার পিছনে ধাওয়া করে তাকে ভাগিয়ে দেয়। সৃষ্টির ব্যবস্থা শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ্ নিজের পয়গম্বরদের কথা শুনিয়েছেন। নূহ (আঃ)-এর কাহিনী রয়েছে। হজরত ইব্রাহীম(আঃ)-এর নিজের আওলাদ থেকে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা এক আল্লাহ্র ইবাদত

করবে। এরপর ইসমাইল (আঃ) এর ছোটবেলার সৌভাগ্যের স্বাক্ষর বহনকারী কোরবানীর প্রসিদ্ধ কাহিনী শুনিয়েছেন। যে কাহিনী প্রতি বছর হজ্বের সময় নবায়িত করা হয়। পিতা পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন। ইব্রাহীমের জন্য এ এক বিরাট পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ্‌র হুকুমে মুমিন যে কোন বড় পরীক্ষায় সফল হয়। "ওয়া ফাদায়নাহু বিযাবহিন আজীম" এর সু-সংবাদ শুনিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দিয়েছেন। ইসলামী বিশ্বের সামনে আত্মসমর্পণের অনন্য নজির ও আদর্শ তুলে ধরেছেন। হজ্বকে ইবাদতের স্তম্ভ বানিয়েছেন। এর পর অন্য পয়গম্বরদের উল্লেখ করেছেন। ইলিয়াস পয়গম্বরের কথা প্রথমবারে উল্লেখ করা হয়েছে। লূত এবং তাঁর স্ত্রীর কথা শুনিয়েছেন। যাদের ঘটনায় প্রসিদ্ধ ইউনুস পয়গম্বরের কথা বিস্তারিতভাবে শুনিয়েছেন যে কেমন করে মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল এবং সাগরের তীরে তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিল।

এরপর কুরআনের ৩৮ তম সূরা ص এসেছে। এই সূরার শুরু উপদেশ দিয়ে হয়েছে। এতে দ্বীনের অটল সত্যতার এক মৌলিক কথা শুনানো হয়েছে। মানুষ যা কিছু মুখ দিয়ে বলে যদি অন্তর দিয়ে তা মেনে নেয় তাহলে ঐ কথা অটল হয়ে যায়। যখন কলেমায়ে তাইয়্যেবাহ মুখ দিয়ে বলে তখন তার হৃদয়এর সত্যতা উপলব্ধি করে। এই মৌলিক বাণী তার আকীদা ও বিশ্বাস। এবং এ বিশ্বাস তার কাজের জন্য চালিকা শক্তি হয়ে যায়। মুখ দিয়ে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা যথেষ্ট নয়। কালেমা পড়লেই মানুষ মুসলমান হয়ে যায় না। অন্তরে বিশ্বাসও করতে হবে। এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয় তখন তার দৃষ্টিতে অন্য সকল মাবুদ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আর কোন ইলাহ তার হৃদয়ে জায়গা পায়না যে তার অভাব পূরণ করতে পারে, সাহায্যকারী হতে পারে, সুপারিশ করতে পারে এবং রুজী প্রদান করতে পারে। শুধু এক আল্লাহ্ হয়। তারই নামের ইবাদত বৈধ। তাঁর কাছেই আবেদন নিবেদন করতে হবে। তার কাছেই নামাজে প্রার্থনা করতে হবে। মানুষের নাফস বড়ই নাফরমান ও বিদ্রোহী। তার হাজারো আকাংখা থাকে। লাখো কামনা তার অন্তরে গোপনে বাসা বেঁধে থাকে। মানুষ এর সবগুলো পূরণ করতে চায়। জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত। কি করে এত সব পূরণ হতে পারে। এ জন্য সে নিজের কামনা পূরণ করার জন্য বহু খোদা, বহু মাবুদ, অভাব পূরণকারী ও বিপদ সুরকারী তৈরী করে নেয়। তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে কুফর ও শিরকে পতিত হয়। সে এক আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে যাকে সে শুরুতে স্বীকার করেছিল। কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ হলো এই যে মানুষ নিজকে, নিজের কামনা ও বাসনাকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এবং কুরআনের শিক্ষানুরূপ করবে। ফের দেখুন সে দুনিয়াতে সফলকাম হচ্ছে এবং পরকালেও এটা তার সৌভাগ্যের কারণ হবে। দুনিয়া এই কালেমা

তাইয়্যেবার অধীনে এবং কুরআন এর উপর সত্যবাদিতার ছাপ মেরেছে। এর দৃষ্টান্ত দাউদ ও সুলাইমান পয়গম্বরের কথা শুনিয়ে কুরআন বর্ণনা করেছে। রাজত্ব ও ক্ষমতার মধ্যে ডুবে থেকেও দাউদ (আঃ) সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছেন এবং সঠিক বিচার ও ফয়সালা করেছেন। তার ন্যায়ালয়ের ফয়সালা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী হতো।

বান্দা সব সময় নিজের বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুক। আল্লাহ্‌র কাছে বিচার চাক। তাঁর বিচারালয় থেকে ভীত থাকুক। দাউদের পর সুলাইমান (আঃ) রাজত্ব ও পয়গম্বীর লাভ করেছিলেন। তিনিও পিতার পদাংকে অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও বন্দেগী করেছিলেন। তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। দুনিয়ার তুলনাহীন রাজত্ব ও শক্তির অধিকারী ছিলেন। যে রাজত্ব ও শক্তি বাতাসকে করতলগত এবং শয়তানদের তার বশে এনেছিল। একদিন জিহাদের আকাংখায় সুলাইমান তার অন্তরে রাজত্বের উত্তরাধিকারীর খেয়াল এনেছিল। তার কয়েকজন স্ত্রী ছিল। তাদের থেকে কোন সন্তান হয়নি। বহু চেষ্টা, বহু ইচ্ছা, পয়গম্বরের প্রার্থনা সব ব্যর্থ হল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে উত্তরাধিকারী দান করেন। রাজত্ব বাদশাহী দান করেন। সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী হয়। বান্দার কাজ হলো ধৈর্যধারণ করা। সহ্য করা। প্রভুর ইচ্ছার উপর ধৈর্য ধারণকারী হতে হবে। ধৈর্যের উত্তম দৃষ্টান্ত আইউব নবীর ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাকে আইউবী ছবর তুলনাহীন ছবর বলে অভিহীত করেছেন। এমন ছবর কোন পয়গম্বর প্রদর্শন করেনি। আল্লাহ এই ছবরের ফল ও পুরস্কার উত্তমরূপে দান করেন। তিনি নবুয়্যত ফিরে পান। স্ত্রী, বাল বাচ্চা পুনরায় দান করেন। অর্থ সম্পদ ও স্বাস্থ্যের নিয়ামত সব কিছু আল্লাহ আইউব নবীকে দিয়েছিলেন।

হে মানুষ সকল! আসল কথা কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ জানা। জীবনের উদ্দেশ্য এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে।

এরপর কুরআনের ৩৯ তম সূরা আল যুমার শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হলো কুরআনের প্রথম শিক্ষা। কোন লালসা, কোন বিনিময়ের আকাংখা না করে আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা উচিত। আল্লাহ্ মানুষের উপর যে অশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জানানোর পন্থা হলো ইবাদত। যিকির এবং নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত নিজের রব ও প্রভুর সমীপে দাঁড়ানো। ইহাই হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কিছু বান্দা আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী ও ইবাদতকারী আছেন। অধিকাংশ লোক আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং পথভ্রষ্ট। দুনিয়া পরকালের খেক্ষ। যা এখানে বপন করবে তারই ফসল পাবে। যে আমল করে পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে ঐ সবই পাবে। কুরআন তোমাদের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ঠ প্রত্যহ কুরআন পাঠ কর।

জীবনের শান্তি ও সুখ তোমরা ফিরে পাবে। তোমাদের সমস্যার সমাধান কুরআনে অনুসন্ধান কর। এর প্রতি ছত্রে এবং প্রতি আয়াতে সমস্যার উত্তর ও সমাধান রয়েছে। সমাধান অবশ্যই মিলবে। আল্লাহ সুযোগ কেবলমাত্র একবারই দেন। যদি তোমরা হেদায়েতের সুবর্ণ সুযোগের মর্যাদা না দাও। বে পরোয়া হও তা হলে এই তাওফিক ও সুযোগ তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হেদায়েতের নেক তাওফিক দান করেন। মুমিন ও পরহেজগার লোক আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখে। আল্লাহ এদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট আছে। যে কোন সময় আসতে পারে। শুতে, উঠতে বসতে দিনে কোন এক সময়, রাতে যে কোন সময় যখন সময় পূরা হবে তখন এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। খালি হাতে যেতে হবে। ইবাদাত বন্দেগীর সময় ও অবকাশ শেষ। তাওবা ও ইস্তেগফারের সুযোগও হলোনা। সাথে কি নিয়ে যাবে। পূণ্যবান পরহেজগার ও সৎ মানুষের জন্য বেহেশ্তের নিয়ামত এবং অনন্তকাল সুখ ও শান্তির জীবন হবে। খোদার ফেরেশতা তাদের উপর সালাম করবে। স্বাগতম জানাবে। জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে মুমিন ও পরহেযগার মানুষের ভিড় লেগে যাবে।

অবাধ্য, বিদ্রোহী ও কাফির বিরাট সংখ্যায় দলে দলে দোযখের দরোজা দিয়ে অতিক্রম করবে। দোযখের ১৯ জন ফেরেশতা আছে। তারা প্রশ্ন করবে। হে মানুষ সকল! তোমাদের কাছে কি হেদায়েতকারী দ্বীনের বাণী নিয়ে কোন পয়গাম্বর আসেন নি? আজ তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে এদিকে এসে পড়লে যে। ইহা বড় খারাপ জায়গা, বড়ই মন্দ আবাসস্থল। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ইহা পুরা হবেই। আল্লাহ্র ফেরেশ্তা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশ ধারণ করে থাকবে। সৃষ্টিকর্তা আরশের উপর সমাসীন হয়ে বিচার করবেন। ফেরেশতা আল্লাহর প্রশংসাও গুণ বর্ণনায় মগ্ন থাকবে। এবং পূণ্যবান মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ'র বিশতম রজনী

(চব্বিশ পারা)

সূরা আল-মুমিন, হা-মীম সাজদা

সূলা আল-যুমারের বর্ণনা তেইশ পারা থেকে শুরু হয়ে অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের কোন কিছুর ভয় বা আশংকা হবেনা। মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসেব উপর কাজ করতে থাকবে। আল্লাহ সবকিছু দেখেন। মানুষের হেদায়েতের জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেউ হেদায়েত পেতে চায় সে যেন কুরআন পাঠ করে। আল্লাহতো সকলের খোদা। মুমিনের ও খোদা এবং কাফির ও মুশরিকেরও খোদা। সবাই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সবার উপর করুণাময় ও স্নেহশীল। সবার অভিভাবক ও সবার প্রভু। মানুষ নিজের ইচ্ছা ও মর্জি মুতাবেক কাজ করার ক্ষমতা রাখে। কুফর ও শিরকের জীবন যাপন করতে পারে অথবা দ্বীন, ঈমান আখিরাতের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর জীবনের বিশ্বাসের উপর জীবন অতিবাহিত করতে পারে। পূর্ববর্তী মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা কাফির মুশরিক ও অত্যাচারী ছিল তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাদের মাঝে ইমানদারদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। দুঃখের বিষয় আল্লাহ্র যে মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল মানুষ সেরূপ করেনি। আল্লাহ বিরাট মর্যাদা, মহিমা ও ক্ষমতার অধিকারী। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন কিয়ামত ঘটবে। প্রত্যেক মানুষকে পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে। বেহেশ্ত ও দোযখ দু'টি পৃথক পৃথক অবস্থানের জায়গা। এবং প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী এই দু'টির মধ্যে একটি আবাসস্থল নির্ধারিত করা হবে। এই সূরার পর কুরআনের ৪০তম সূরা আল-মুমিন আরম্ভ হচ্ছে। এ সূরা হামিম দ্বারা শুরু হয়েছে। এই ৪০ তম সূরা থেকে পর পর সাতটি সূরা হা-মীম দিয়ে শুরু হয়েছে। এই সাতটি সূরার বিষয়বস্তু আলিফ, লাম, মীম দ্বারা পর পর যে ছয়টি সূরা শুরু হয়েছে তার বিষয়বস্তু থেকে পৃথক। কিন্তু এই সব সূরার বিষয় একই। অর্থাৎ ঈমান ও ইয়াকীন। এই সাত সূরা হা-মীম দ্বারা এবং কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রত্যেকটি সূরায় কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাতটি সূরায় মুমিনের হৃদয় ও দৃষ্টি থেকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হয়েছে। খোদার মহিমার রহস্য প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি, বোধশক্তি, চিন্তা-ভাবনাকে নাড়া দিয়ে বলা হয়েছে চিন্তা করে দেখ, কান লাগিয়ে শোন, চোখ মেলে দেখ চারিদিকে কি ঘটছে। কে এসব ঘটাচ্ছে। হা-মীম আল্লাহ্র সবচেয়ে মহিমাময় নাম। প্রথম حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ মুমিনের গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণনা করছে। খোদা ও বান্দার মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক বর্ণনা করছে।

আল্লাহ্‌র খাস বান্দাহ্‌কে আল মুমিন বলা হয়। এরা আল্লাহ্‌র হুকুম ও কুরআনের আয়াতসমূহ সর্বান্তকরণে মানে ও বিশ্বাস করে। দুনিয়া এদের চোখে খুবই ক্ষুদ্র। খোদার ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বান্দা, নিজের অবস্থা নিয়ে মগ্ন আল্লাহর বাধ্য, আবেদ, পরহেযগার, রাত্রি জাগরণকারী বান্দা, কুফরের শান শওকাত, বাদশাহী শক্তি ও রাজত্ব দেখে ভীত হয় না। এ সবের লালসা ও আকাংখা তারা করেনা। এ রূপ অমুখাপেক্ষী বান্দা দুনিয়া থেকে চলে যায় এবং দুনিয়ার আকংখাকারী হয় না।

আল্লাহর নিকটতম ফেরেশ্‌তা, যারা আল্লাহ্‌ তায়ালার আরশ ধারণ করে সর্বদা তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় লিপ্ত। তারা মুমিন বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করতে থাকে। উপরের আসমানের ফেরেশ্‌তাদের মুখে তাদের কথার চর্চা হয়। কুরআন মূসা ও হারুনের ঘটনা শুনিয়েছে। ফেরআউনের দরবারে যখন মূসা তাঁর দাওয়াতী বক্তৃতা শেষ করেন তখন ফেরআউন খুবই ক্রুদ্ধ হয় এবং মূসা ও হারুনকে কঠিন শাস্তির আদেশ জারী করে।

২৮তম আয়াতে কুরআন একজন মুমিন বান্দার বর্ণনা করেছে যিনি মূসার বক্তৃতা শুনে ঈমান এনেছিলেন। তিনি নিজের অন্তরে ঈমানের কথা গোপন করে রেখেছিলেন। তিনি বক্তৃতা করেন এবং ফেরআউনকে বুঝান। তিনি মূসাকে সমর্থন করেন। তার বক্তৃতার ফলে ফেরআউনের অনেক পারিষদ ঈমান আনে। এবং ফেরআউন সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। মুমিন যখন দ্বীনের কথা বলে তখন তার কথার এক বিশেষ প্রভাব পড়ে। মানুষ তাব কথায় প্রভাবিত হয়। তার কথা অন্তরে প্রবেশ করে এবং মন ও মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুমিনের দৃষ্টি ও অর্ন্তদৃষ্টি উভয়ই সাধারণ মুসলমান থেকে আলাদা হয়। যখনই সে বলে তখন তার ভিতর থেকে ঈমানের জ্যোতি কথা বলে। মুমিন মানুষের ভৎর্সনা, গাল-মন্দ এবং বেহুদা কথাবার্তা থেকে মনঃক্ষুণ্ন ও ক্রুদ্ধ হয় না। নিজের তবলীগের কাজ সে করে যায়। তাঁর একমাত্র চিন্তা মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেওয়া। আন্তরিকতার সাথে খোদা ও তার রাসূলের পথে ধৈর্য ও তায়াক্কুল করে, খোদার সত্ত্বা ও অদৃশ্য সাহায্যের উপর ভরসা করে। মুমিন নিজের প্রভুর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকে। সে সব সময় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাঁর নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতায় নতমস্তক হয়। সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হয়। তার অনুগ্রহ ও করুণার তালাশ করে। সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহ্‌র যিকির করে। তার শান্তি লাভ হয়। রাত-দিন তাঁর কাজ হলো আল্লাহর যিকির, আল্লাহর গুণকীর্তণ। তার দৃষ্টিতে সে আল্লাহর মহিমায় বৃক্ষের পত্রে পত্রে আল্লাহ্‌কে দেদীপ্যমান দেখে। বিহঙ্গকুলের আওয়াজের মধ্যে আল্লাহর আওয়াজ শুনতে পায়। সূরার অষ্টম রুকুতে অস্বীকারকারী কাফিরদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা খোদার ব্যাপারে বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা, প্রমাণ ও তর্ক-বিতর্ক দ্বারা দ্বীনকে বুদ্ধির অনুগত করে। আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহের কোন তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ উপক্ষো করে। কুরআন খুলে দেখেনা যে কি লেখা আছে। তাদের অবাধ্যতা ও দ্বীন থেকে তাদের গোমরাহী ও অজ্ঞতা তাদেরকে দোযখের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়। তারা সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্থ। মানুষ সততার সাথে

একটু চিন্তা করলে দেখতে পাবে আল্লাহ কি পরিমাণ অনুগ্রহ তাদের উপর করেছেন। তারা এর কি জওয়াব দেয়। পৃথিবীর ইতিহাস সামনে আছে। ইতিহাসের ঘটনাসমূহ আদম থেকে শুরু করে মূসা ও হারুনের সময় পর্যন্ত কুরআন বিভিন্ন জায়গায় শুনিয়েছে। প্রত্যেক স্থানে আমলের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে খোদার একই কানুন কাজ করছে। অত্যাচারীর শাস্তি স্বয়ং অত্যাচারী ঠিক করে নিজেই শাস্তি ডেকে নিয়ে আসে। খোদার আযাবকে যদি কেউ আহবান করে তাহলে ইহা কেমন অবাধ্যতা এবং কুফর ও গোমরাহী! অতঃপর সে কেমন করে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাবে। রাসূলুল্লাহর কাজ, কুরআনের হেদায়েত ও উপদেশ উভয়ের মধ্য থেকে যেটা ইচ্ছা আঁকড়ে ধর। এ দুনিয়া তোমার, দ্বীনের পরলৌকিক জীবন তোমার হিসসা। মুমিন মৃত্যু থেকে কখনও ভয় পায়না। মৃত্যুর সাথে মোলাকাত করা তার কাম্য হয়। মৃত্যুর সময় মুমিন আল্লাহর পরিচয়ের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে থাকে। সে এই দৃশ্যমান জগত থেকে অদৃশ্য জগতে এবং নীরবতা ও মগ্নতার সাথে উর্ধ্ব জগতের পরিভ্রমণ করে। করুনাময় মেহেরবাণ আল্লাহ্র দীদারের সে অপেক্ষা করে। এখন তাকে এখান থেকে যেতে হবে। কোরআন যে মুমিনের উল্লেখ করেছে সে দুটি অংশে বিভক্ত। একটি অংশ বিপদ-আপদ সমস্যা ও অগ্নি পরীক্ষার সাথে ধৈর্য ধারনের পূর্ণ নমুনা। দ্বিতীয় অংশ সুখে, আনন্দের মাঝে কৃতজ্ঞতার বাস্তব প্রকাশ। উভয় অবস্থায় সে সুখী, প্রশান্ত চিত্ত ও আনন্দে বিভোর থাকে। স্বয়ং কুরআন এই সব মুমিনদের দৃঢ়চিত্ত অবস্থাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে যারা বণী ইসরাইলের পয়গাম্বর, অন্তর্ভূক্ত করেছে। এরপর ৪১ তম সূরা হামীম আল সিজদাহ দ্বিতীয় হা-মীম দ্বিতীয় পর্দা উঠাচ্ছে। প্রথম পর্দা প্রথম হা-মীমে আল-মুমিন এর জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অবস্থিত পর্দা উঠানোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবং এই দ্বিতীয় হা-মীম খোদা ও তার বান্দার মধ্যকার পর্দা আল-সিজদা দ্বারা উঠে যাচ্ছে। আমি এমন সিজদা কোথা থেকে নিয়ে আসব? যা আমাকে খোদার সাথে মিলন ঘটাবে। মুমিনের মাঝে এই প্রবল আকাংখা থাকে।

কুরআনের হেদায়েত প্রত্যেক বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু যারা ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে পুণ্যবান ও পরহেযগার হয় তাঁদের সম্বন্ধে কুরাআনের সূরায়ে আল-বাকারাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে-কেবলমাত্র পরহেযগার লোক এর থেকে হেদায়েত ও উপদেশ লাভ করতে সক্ষম। هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ প্রথমেই শুনানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং মুমিন বান্দার নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধ শক্তি, বিদ্যা ও পড়াশুনা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী অংশ লাভ করে। কুরআন সবার জন্য একটি খোলা উন্মুক্ত গ্রন্থ। রাত-দিন কুরআন পাঠকারী আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ্র কাছ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। তা অবশ্যই পাবে। যারা আন্তরিকভাবে এই প্রতিজ্ঞা করে যে আল্লাহ্ আমাদের, আমরা তাঁর আদেশ মানব, তাঁর বন্দেগীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করব এবং এই প্রতিজ্ঞাব উপর অবিচল থাকে তারা এই পূর্ণ নির্ভরতার কারণে এমন সব অলৌকিক ক্ষমতা ও বরকত লাভ করে যে

ফেরেশতা পর্যন্ত তাদের পক্ষে হয়ে যায়। তাদের সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হয়। এবং খোদার কাছে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে। এই সব মুমিনের দুনিয়ার কোন ভয় ও আশংকা থাকেনা এবং আখিরাতের ব্যাপারে তারা কোন সন্দেহের দোলায় দোলেনা। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসা করে বলে اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ তারা আল্লাহ্‌র বন্ধু তাদের কোন ভয় নাই। তারা দুঃখিত হবে না। সূরার পঞ্চম রুকু শেষ হলো।

আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও মাগফিরাতের তরিকা খুব সহজ। যদি তুমি প্রতিটি খারাপ কাজের জায়গায় ভাল কাজ কর, ক্রোধ ও ঘৃণার জওয়াব ভালবাসার মাধ্যমে দাও, বিপদে ধৈর্য ধারণ কর, নামাজের আশ্রয় নাও, পরহেযগারীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ কর, সব সময় আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকিরে ব্যস্ত থাক তাহলে তোমার একটি মাত্র সিজদা সহস্র সিজদাহর প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। কেননা এর দ্বারা দুনিয়া পূজারীদের হাজারো উপাস্য ও খোদার সামনে সিজ্‌দাহকে অস্বীকার করা হয়। যে একবার নিজের খোদার সামনে অবনত হয়েছে, দুনিয়ায় কোন শক্তির সামনে সে আর মাথা নোয়ায় না। এই একটি সিজ্‌দাহ্ মুমিনের জীবনে এতদূর প্রভাব বিস্তার করে যে এই ইবাদতে এমন মজা ও সুখ সে লাভ করে যে শীতের রাতেও লেপ কম্বলের উষ্ণ আশ্রয় ত্যাগ করে ঘুম থেকে উঠে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য তাহাজ্জুদ নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। শেষ রাতে সমগ্র পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন তখন সে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়। আল্লাহ্ দেখেন। ফেরেশতা এই বান্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে তখন আল্লাহ্‌র কাছে এতই প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয় যে সে তখন যা চায় তাই পেয়ে যায়।

সূরার ষষ্ঠ ও শেষ রুকু শুরু হচ্ছে। এই সূরার দ্বিতীয় পর্দা খোদা ও বান্দার মধ্যকার পর্দা অপসারিত হচ্ছে। বান্দা এবং মাবুদ এক হয়ে যায়। বান্দা যখন কুরআন পাঠ করে তখন বান্দা এবং খোদার মধ্যে কোন পর্দা বাঁধা হয়ে উঠে না। খোদার সাথে আলাপচারিতা চলতে থাকে। খোদা তার কথার উত্তর দিতে থাকেন। কুরআন পাঠের এই হলো বরকত। কিয়ামতের দিবস খুবই ভয়ংকর হবে। ঐদিনের চিন্তা ভাবনা ও প্রস্তুতি আগের থেকেই করা উচিত। দুনিয়া চাওয়ার মধ্যে জীবন যাপনের সাথে আখিরাত ও পরকালের পরিণতির চিন্তা করাও উচিত। একদিন খোদার কাছে ফিরে যেতে হবে। কুরআনের আলোকে জীবনকে সুন্দর কর। আখিরাত প্রস্তুত কর। জীবনের সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে। হে রাসূল আমি অচিরে আপনাকে এই দুনিয়ায় আপনার জীবনে আমার মহিমার নিদর্শনাবলী দেখাবো। মক্কায় বিধর্মীদের এবং মদীনার মুশরিকদের চোখ খুলে যাবে। ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব। এই গ্রন্থ সত্য বর্ণনা করে। আল্লাহ্ আপনার দ্বীন ও নবুওয়্যাতের সাক্ষী। আল্লাহ্ কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিয়ামতের দিন থেকে কে ভেগে কোথায় যাবে ? আপনার ভালবাসা ও মমতা মুমিনদের জন্য যথেষ্ট।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র একুশতম রজনী

(পঁচিশ পারা)

সূরা-শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাছিয়া

সূরা حٰمٓ عٓسٓقٓ পঁচিশতম পারার তিলাওয়াত আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল মানুষকে সতর্ক করতে এসেছেন। কাফিরগণ আমার রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলে, ষড়যন্ত্র করে। আকাশের ফেরেশতা এই সব কাফিরদের অবাধ্যতার জন্য অসন্তুষ্ট। তৃতীয় حٰمٓ এর সাথে عٓسٓقٓ ও যুক্ত হয়েছে। এতে কুরআনের ওহী, রাসূলের নবুওয়্যাত এবং মুমিনের বিলায়েত বা নৈকট্যের কথা বলা হচ্ছে। কুরআন তৃতীয় পর্দার অপসারণ করছে। এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। মুমিনের পথ কি হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহর জীবনধারা, তাঁর আনুগত্যের ও অনুসরনের আদর্শ মুমিনের জীবনের পথ হওয়া উচিত। এসব কথা প্রত্যহ কুরআন পাঠের মাধ্যমে জানা যাবে। খোদা اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ সবচেয়ে বেশী করুণাময়। তাঁর করুণার রহস্য তাঁর মহিমার দিগন্তে গুপ্ত রয়েছে। খোদা মানুষের মন তথা সত্তার মধ্যে গোপনভাবে মিশে আছেন। গত তারাবীহ'তে যে সুরা তিলাওয়াত করা হয়েছিল তাতে আল্লাহ ওয়াদা করেছিলেন যে শীঘ্রই পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহর অর্ন্তজগতের মহিমা ও মহাজ্ঞানের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দিবেন। ইহা এই সূরাতে প্রকাশ পাচ্ছে। বান্দার উপর আল্লাহর দুটি অনুগ্রহ আছে। একটি দ্বীন ইসলামের তওহীদের রাস্তা। দ্বিতীয় দ্বীনি শরিয়ত ও বিধানের পথ। এই দুটি জিনিস আল্লাহর পরিচয় লাভের উপায়। এর মাধ্যমে বান্দা খোদার সন্ধানে তাঁর সত্তার পরিচয় লাভের জন্য বের হয়ে পড়ে। তখন আওয়াজ আসে যদি তুমি মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে ভালবাসার গভীর সম্পর্ক গড়ে তোল তাহলে আমি তোমার। এই বিশ্বভুবন কি ছার, লাওহ কলম তোমার। এই সূরায় حٰمٓ এর পর্দা কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা অপসারিত করা হবে। মুমিন কেবল মাত্র পরকাল এবং এর পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে। পৃথিবী থেকে এমনভাবে চলে যায় যে সে কখনও দুনিয়ার খা[illegible] থাকেনা। প্রয়োজন মত দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক থাকে। যে মুমিন দুনিয়ার আ[illegible]লংখা করে, দুনিয়া পাওয়ার জন্য দৌড় ঝাপ ও পরিশ্রম তার সঙ্গী হয়। আল্লাহ তাকে দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি, সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেন এরপর তার কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়। দুনিয়া

তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং দ্বীন তার থেকে বিদায় নেয়। এ সব কিছু তার খুশী ও ইচ্ছানুসারে হয়। যেমনটি সে চেয়েছিল। আল্লাহ নিজের তরফ থেকে প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে দিয়ে থাকেন। ইহাই তাঁর তকদীর। যদি তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অধিক দেন তাহলে সে খোদার বিদ্রোহী ও নাফরমান এবং অহংকারী হয়ে খোদার বিরুদ্ধে বলতে থাকে। আমি কে তা আমি জানি। এই জন্য আল্লাহ الرحمن বা অসীম মেহেরবান। তিনি বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী দেন।

যদি জীবনে আল্লাহর বিধানের খেয়াল না করা হয় তা হলে জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেয়। জীবন মানুষের কর্মও পরিশ্রমের ফল। আল্লাহ মানুষের মনের কথা ভালভাবে জানেন। কে জীবনে দুনিয়া পছন্দ করে। কে আখিরাত, খোদার প্রেম ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে পাগলপারা আল্লাহ ভালই জানেন। মুমিন ও পরহেযগার বান্দাদের উপর আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ সব সময় বর্ষিত হতে থাকে। এরা আল্লাহর স্মরণ থেকে কখনো গাফেল হয়না। মুমিনের ধৈর্য ও দৃঢ়তা আসল বিষয়। যার বর্ণনা এই সূরাতে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমা ও মার্জনার দ্বারা প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। মুমিনের সমাজ, তার ঘর, তার পরিবেশ ইসলামী সমাজ এবং ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। সূরার পঞ্চম রুকু শুরু হচ্ছে। মুমিনের হেদায়েত আল্লাহ্র তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই তাওফিক দান করেন। সব অনুগ্রহ ও দান আল্লাহর তরফ থেকে হয়। দুনিয়ার নিয়ামত, সম্পদ সন্তানাদি সব আল্লাহ প্রদত্ত। যাকে চান তাকে দেন। তোমাদের পরিশ্রম যোগ্যতার দরুন এসব অর্জিত হয়না। এসব আল্লাহর অনুগ্রহের দান। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন কেবল পুত্র সন্তানই দেন। একটিও কন্যা দেন না। আবার যাকে ইচ্ছা করেন তাকে শুধু কন্যা সন্তানই দেন একটিও পুত্র সন্তান দেন না। উত্তরাধিকারী পয়দা করেন না। এসব আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। উত্তরাধিকারীর দ্বারা মানুষের পরিত্যক্ত সম্পদ ভাগ হয়ে যায়। উত্তরাধিকারী না থাকলে সম্পদ বিভাজিত হয় না। বংশের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির মধ্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। মানুষের আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত পেয়ে খুশী হওয়ার বদলে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই হলো আসল গূঢ় কথা যা সূরায়ে حٰمٓ عٓسٓقٓ এ বর্ণনা করা হচ্ছে।

حٰمٓ এর তৃতীয় পর্দা হলো আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছায় খুশীও রাজি থাকা। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে চাও তখনই কুরআন মজীদ হাতে নাও এবং খুলে পাঠ কর। এবং যেখানে যে আয়াতে তোমার অঙ্গুলী আটকে যাবে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নাও। তোমার মনের কথা, তোমার জীবনের সমস্যার সমাধান এর মধ্যে পেয়ে যাবে। ঐ কথা

জানতে পারবে যার জন্য তুমি অস্থির হয়ে পড়েছিলে। প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত করলে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। যখন মুমিন খোদার সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয় তখন কুরআন খোদা ও বান্দার মধ্যকার পর্দা অপসারিত করে।

এরপর সূরা الزخرف শুরু হচ্ছে। ইহা চতুর্থ حم। চতুর্থ পর্দা অপসারিত হচ্ছে। ঐ চতুর্থ পর্দা হলো আল্লাহর আদেশ অবগত হওয়া। حم বিশিষ্ট সূরাসমূহে আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি যে আল্লাহ তিন প্রকারে আপন বান্দাদের সম্বোধন করেন। কোন মাধ্যম ছাড়াই। পর্দার আড়াল থেকে। অদৃশ্য আওয়াজের মাধ্যমে। কোন কিছুর মাধ্যমে। যেমন ওহীর মাধ্যমে ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে অবগত করান। তৃতীয় উপায় হলো ইলহাম অর্থাৎ রূহানী ওহী, অদৃশ্যভাবে বান্দার অন্তরে কোন কথার উদ্রেক করা। অর্থাৎ ওহী মিছালী। খোদা পুণ্যবান মুমিন বান্দাদের ইলহামের দ্বারা জানিয়ে দেন আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা কি? এরা অলিউল্লাহর মর্যাদা লাভ করে। কুরআন মাজীদ হলো রূহানী ও বিশেষ ওহী। যা মৃত অন্তরে জীবন সঞ্চার করে। মৃতকে কবরের মধ্যে জীবিত করে। রোগ ব্যাধি নিরাময় করে। মানুষ যা কিছু পেয়েছে কুরআন থেকে পেয়েছে। কুরআন আল্লাহর পরিচয় লাভের প্রথম ধাপ। যা কিছু তোমরা লাভ করতে চাও কুরআন পাঠ করে অর্জন কর। ইহা কোন সাধারণ গ্রন্থ নয় যে ভুলে যাবে। ইহা 'লাওহে মাহফুজে' রক্ষিত أُمُّ الْكِتَابِ এর অবিকল নকল। জিব্রাইল কর্তৃক ওহী আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর (সাঃ)-এর পর ওহীর সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। ওহী বুঝবার দরোজা কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের মধ্যে অবারিত রয়েছে। নিখিল সৃষ্টির জন্য কুরআনের বাণী থাকবে। জগতবাসীর জন্য হেদায়েত ও কল্যাণের বাণী সুস্পষ্টভাবে কুরআনে বিদ্যমান। প্রত্যেকের ক্ষমতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে উপকার পৌছবে। حم এর সাতটি পর্দা সাতটি সূরার মধ্যে সন্ধান কর। মুমিনের অন্তর থেকে পর্দাসমূহ ঈমান ও বিশ্বাসের নির্মল জ্যোতির দ্বারা অপসারিত হয়। মুমিন যখন কুরআন পড়ে, কুরআন শুনে তখন খোদা সেখানে উপস্থিত থাকেন। তোমাদের সাথে কথা বলেন। তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাওনা। কিন্তু তিনি তোমাদের দেখেন। তোমাদের কথা শ্রবণ করেন। মুমিন যখন কুরআন পাঠ করে তখন সে আত্মার জগতে সফর করতে থাকে। رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا এর আওয়াজ আসতে থাকে। ঠিক এমনিভাবে যেমন করে মানুষ জীবনের চলার পথে মানঝিলে মানঝিলে স্থানে স্থানে চলতে চলতে থেমে যায়। আত্মা ও জীবনের সাথে ছফর করে। মানুষ যখন নিদ্রা যায় তখন আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে নানা জায়গায় ঘোরা ফেরা করে পুণরায় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং তোমরা নিঃসাড়, নিস্পন্দন হয়ে

স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্থান কালের গন্ডী পেরিয়ে কত অজানা স্থান পরিভ্রমণ করে ফিরে আস। কুরআন এর সত্যতা স্বীকার করে ঘোষণা করে وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছে অবশ্যই ফিরে যাব। যমীনে বিমান পথে ভ্রমণ করার সময় এই আয়াত পাঠ করা হয় سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا ১৩ নম্বর আয়াতের অনুবাদ দেখুন। আদম (আঃ) কে বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র মর্জি ও ইচ্ছা এটাই ছিল। পৃথিবীতে দুটি বিধান প্রতিষ্ঠিত আছে। মনুষত্বের এবং শয়তানীর। দু'টির মধ্যে যেটি ইচ্ছা সেটি গ্রহণ কর। উভয়ের পরিণামের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। حم দিয়ে শুরু পঞ্চম সূরা 'দুখান'। আল্লাহ ঐ পবিত্র রজনীর শপথ করেছেন যে রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। 'লাওহে মাহফুজ' থেকে প্রথম বারের মত আকাশ থেকে নীচে নামানো হয়েছিল। ঐ বরকতময় রজনীতে সমগ্র সৃষ্টির জীবন-মৃত্যু, রিযিক ও সন্তানের নিয়ামতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং ফেরেশতাদের হুকুম দেওয়া হয় যে তাঁরা আল্লাহর আদেশ জানুক। আল্লাহর ফায়সলা সময় মত কার্যকরী হবে। অপেক্ষা কর ঐদিনের যেদিন আকাশমন্ডলী ধোঁয়ার রূপ ধারণ করে ছত্রখান হয়ে যাবে। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আযাবের দিন হবে। মানুষ প্রার্থনা করতে থাকবে। হে পরওয়ারদিগার! আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নাও। এখন আমরা ঈমান এনেছি। যদি আমি এদের উপর থেকে একটুখানি আমার আযাব হটিয়ে দেই তাহলে এরা পুণরায় ঐ কাজ করতে থাকবে যা পূর্বে করত। কিয়ামতের দিন সবার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই সূরাতে দুখান বা ধোঁয়ার দ্বারা মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ হুজুর (সাঃ)-এর যুগে দেখা গিয়েছিল। এবং ইহা হুজুরের বদদোয়ার ফলে ঘটেছিল। বড় আঘাত দ্বারা বদরযুদ্ধের ভবিষৎদ্বানী করা হয়েছে। এরপর ফেরআউনের বর্ণনা এসেছে। যখন মুসা (আঃ)-এর বদ দোয়ার কারণে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং মুসা বলেছিলেন أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ বনী ইসরাইলকে আমার কাছে সোপর্দ করে দাও। আমি তোমাদের সামনে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবনের ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। আমার দিকে হাত বাড়াবার আগে খোদাকে ভয় কর। নিজের দুষ্কর্ম থেকে বিরত হও। মূসা ও ফেরআউনের কাহিনী আনুষঙ্গিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরআউন কেমনভাবে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। তার উত্তরাধিকার মুমিনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তার উপর না আকাশ কেঁদেছিল না যমীন। যখন ফেরআউনের মত শক্তিশালী সম্রাট খোদার অবাধ্যতা করে এবং পয়গম্বরের হেদায়েত না মেনে ধ্বংস

হয়েছে তখন মক্কার কোরেশ নেতারা এবং আরবের কাফের ও বিধর্মীরা কোন ক্ষেতের মূলি যারা অবাধ্যতা জিদ ও কুফরের মধ্যে পড়ে আছে ? মানুষ বলে যে মৃত্যু একবার আসে। এরপর আর কোন জীবন নেই। অথচ মৃত্যুর পর পরকালের জীবন অবশ্যই আছে। পুনরায় মৃতকে জীবিত করা হবে। তোববা জাতির উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যাদেরকে শিরক ও কুফরের অপরাধে ইসলামের অনেক আগেই ধ্বংস করা হয়েছিল। এই পার্থিব জীবন কোন খেলা তামাশার বস্তু নয়। যা মনে আসবে তাই করবে। যেন কোন জিজ্ঞাসাকারী নেই। খোদা অবশ্যই তোমাদের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ জীবন কয় দিনের জন্য। আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। কেবলমাত্র আল্লাহ্ আখিরাতে সাহায্য করতে পারেন। দোযখে পাপীদের যাকুম নামক বৃক্ষের ফলও রস খাওয়া এবং পান করার জন্য দেওয়া হবে। যা পেটে পৌছে নাড়ীভূড়ি গলিয়ে ফেলবে। ফেরেশতাদের বলা হবে ওদের ধর, বেঁধে ফেল এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। ভেগে কোথায় যাবে। বেহেশ্তে প্রবেশকারীদের জীবন অনন্ত সুখের জীবন হবে। মুমিন আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পরিণতি হবে ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্ট বস্তু যা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যা কোন উপকারে আসবেনা।

এরপর حم সম্বলিত ষষ্ট সূরা جاثية শুরু হচ্ছে। রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং حم সম্বলিত প্রত্যেকটি সূরাতে মুমিনদের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো খোদাকে জানা, রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে খোদা পর্যন্ত পৌছানো, কুরআনের হেদায়েত ও উপদেশ অনুসারে জীবন গড়া, সকাল সন্ধ্যায় খোদার যিকিরও তসবীহ পাঠ করা, খোদা ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হতে না দেওয়া। চলতে ফিরতে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ তার ওযীফা হবে। আল্লাহ মানুষের হেফাযতের জন্য দুজন ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করেছেন। তারা আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক ঠিক রাখে। দিন রাতে দুই সময় তাঁদের ডিউটির পরিবর্তন হয়। আসরের সময় যখন তাদের পরিবর্তন হয় তখন এই দুই ফেরেশতা মানুষের আমল নামার মধ্যে আল্লাহর স্মরণে হামদ– গুন বর্ণনার কথা আছে কি-না পাতা উল্টিয়ে দেখতে থাকে। তাদের ইচ্ছা যে বান্দার নাম আল্লাহ্র যিকিরের সাথে লিপিবদ্ধ হোক। তার আখিরাত যেন বিপদমুক্ত হয়। সকাল সন্ধ্যা কুরআন তিলাওয়াতের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নিখিল সৃষ্টি জগত মুমিনকে দান করা হয়েছে। যে জিনিস সে চায় বৈধ করতে পারে এবং খেতে পারে। সব বস্তু বৈধ করা হয়েছে। জগত সৃষ্টি এবং মানব সৃষ্টি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাকি সব বস্তু গুরুত্বপূর্ণ

নয়। এই দুই জিনিসের সময় নির্দিষ্ট আছে। উভয়েরই বিলুপ্ত হবে। উভয়ই সৃষ্টিগত প্রকৃতি যদিও একে অন্য থেকে বিপরীত এবং বিভিন্ন। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতকে আদেশ করেছেন যে মানুষের নিরাপত্তা, বসবাস, এবং জীবনের জন্য সে যেন অনুকূল হয়। সাহায্য ও সহায়তাকারী প্রামাণিত হয়। এক্ষেত্রে উভয় একে অন্যের সাথে শরীক হয়েছে। এর ফলে মানব জীবন এই পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে। উভয় একে অন্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কাজের সঙ্গী হয়েছে। ইহা আল্লাহ্র বিধান।

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ *

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রাকারে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন– তোমরা উভয় আমার আদেশ পালনের জন্য তৈরী হও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বললো– আমরা তো আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।"

প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দল কিয়ামতের দিন হাটুর বুকের উপর পড়ে অবনত অবস্থায় উপস্থিত হবে। (جَاثِيَة অর্থ নতজানু অবস্থায়)

প্রত্যেকের আমলনামা অনুসারে ডাকা হবে। এবং তাদেরকে এই আমলনামা অনুসারে বদলা দেওয়া হবে। আল্লাহ্র কাছে লিখিত কিতাব আকারে আমলনামা থাকবে। ঐ অনুযায়ী ফয়সালা শুনানো হবে। সবাইকে সমান অংশ দেওয়া হবে। মুমিনদেরকে ও পরীক্ষা করা হবে। ঐ অনুসারে তারা বদলা পাবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র বাইশতম রজনী

(ছাব্বিশ পারা)

সূরা আহক্বাফ, মুহাম্মদ, ফাতাহ, হুজুরাত, ক্বাফ, যারিয়াত

২৬তম পারার তিলাওয়াত শুরু হচ্ছে। এবং সুরা আল আহকাফ দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে। আহকাফের অর্থ হলো বালির উঁচু টিলা। কোরআনের সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য মুমিনের মধ্যে এমন উঁচু চরিত্র ও মানসিকতা সৃষ্টি করা যে সে সোজা রাস্তার উপর নিজে নিজেই চলতে পারে। খোদার বিশেষ বান্দা কুরআনের শিক্ষার নমুনা হয়ে থাকে। দিবারাত্র আল্লাহ্‌র যিকির, খোদার তছবীহ পাঠ, খোদার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। এ সব আল্লাহ্‌র হক যা ফরজ অবশ্য করণীয়। এরপর حقوق العباد বা মানুষের অধিকার ফরজ করা হয়েছে। দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। ইহাও জরুরী ও ওয়াজিবের মর্যাদায় পড়ে।

কিন্তু পিতা-মাতার আদেশ পালন, সেবা ও খেদমত এবং তাদের হক খোদার হকের পরে ফরজ করা হয়েছে। তাদের জীবদ্দশায় মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবা কর এবং মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া কর। তাদের জন্য দান খয়রাত কর। ভাল সন্তান, সৌভাগ্যবান সন্তান পিতা-মাতার জন্য صدقة جارية ছাদকায়ে জারীয়া হয়। অর্থাৎ তাদের দ্বারা মৃত্যুর পর ও পিতা-মাতা সওয়াব পেতে থাকে। তাঁদের পর অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের হক। এই সব حقوق العباد ঐরূপ জরুরী যেমন তোমারা حق الله এর উপর গুরুত্ব দিয়ে থাক। আল্লাহ্ তায়ালা নিজের নেক বান্দাদের কাছে সালাম ও রহমত পৌঁছিয়ে থাকেন। পূণ্যবান মুমিনদেরকে তিনি ততক্ষণ কোন দুঃখ, বেদনা কষ্ট ও শোকের সংবাদ শুনাননা যতক্ষণ না ঐ ঘটনা বা খবর বাস্তবে ঘটে। ইহা মৃত্যুদের শ্রবণ করার মাসআলা। এই সূরার বিষয় বস্তু মুশরেকিনদের সম্বোধন করা ও তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেওয়া। এই সব লোকদের উদাহরণ বিলকুল আদ ও সামুদ জাতির ন্যায়। যা বালুর টিলার মধ্যে তাদের উপর ঘটেছিল।

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জ্বীনদের একটি দলকে আল্লাহ্ আপনার অনুগত ও অনুসারী করে দিয়েছেন। নাখলা উপত্যকায় হুজুর (সঃ)-এর যখন এশার নামাজ পড়ছিলেন তখন একদল জ্বিন ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করে। তারা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে গিয়ে ঐ সংবাদ দেয়। এবং জ্বিনদের প্রতিনিধি দল হিজরতের পূর্বে মক্কাতে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিল। হে রাসুল! আপনি মানব ও জ্বীন জাতির জন্য

রহমতের নবী। প্রত্যেক নবীর সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে আপনার সাথেও ঐরূপ ব্যবহার করা হবে। এ জন্য ধৈর্য ধরুন নিজের কাজ করে যান। কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের অধিকারীরাই ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

এরপর কোরআনের ৪৭ তম সুরা মুহাম্মদ আরম্ভ হচ্ছে।

দুনিয়াতে ভাল কাজের পুরস্কার সব থেকে ভাল হয়ে থাকে। যদি সে কাজ অদৃশ্যের উপর ঈমান এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাসের সাথে করা হয়। মুহাম্মদ (সাঃ) পয়গম্বরী ও নেতৃত্ব ব্যতীত ঈমান সম্পূর্ণ হয় না। ঈমানের শর্ত হলো لا اله الا الله محمد رسول الله। কুরআন হেদায়েতের সুস্পষ্ট গ্রন্থ। কুরআনের চিন্তা ভাবনা, গবেষণা করা জরুরী। বড় বড় রহস্য কুরআনের আয়াতের মধ্যে গুপ্ত রয়েছে। এবং আল্লাহ্ সব কিছু বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এই গ্রন্থের রহস্যসমূহ প্রত্যেক যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তুমি যতই এই কিতাব পড়বে ততই এর রহস্যসমূহ জানতে পারবে। প্রত্যেক আয়াত একটি সমুদ্রতুল্য। যার যতটুকু যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে সেই পরিমাণ মুক্তা এই সমুদ্র থেকে আহরণ করতে পারবে। কুরআনের হেদায়েত রাসুলুল্লাহ্‌র কাজের অনুসরণ তোমাকে সফল জীবনের দিকে পরিচালিত করবে। আল্লাহ্ সব সময় এইরূপ মুমিনদের সাথে থাকেন। খোদাকে রাজী ও খুশী করতে সব সময় দান-খয়রাত করতে থাক। বৈধভাবে উপার্জিত বৈধ সম্পদ থেকে দান খয়রাত কর। আল্লাহর কাজে পবিত্র নিয়্যাত ও মাল নিয়োজিত কর। দান খয়রাত পাপসমূহ মুছে দেয় এবং ইহা মাগফিরাতের কারণ হয়। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখ। বাজে খরচ ও অমিতব্যয়িতা পরিহার করে চল। এরপর কুরআনের ৪৮ তম সূরা فتح শুরু হচ্ছে। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র থেকে এই লাভ হয়েছে যে এই সন্ধি মক্কা বিজয়ের কারণ হয়। সোলহে হুদাইবিয়া যদিও একটি সন্ধি চুক্তি ছিল কিন্তু একে সোলহ বা সন্ধি বলা হয়েছে। এই সূরার মূল কথা হলো রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসরণ। আল্লাহ্ ঐ সব মানুষের উপর সন্তুষ্ট যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুসরণে একত্রিত হয়ে বায়াতের হাত বাড়িয়ে দেয়। ইহা একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ছিল যে মুসলমান আল্লাহ্‌র রাসুলের উপর পূর্ণ ভরসা রাখে। যখন রাসূলের উপর পূর্ণ নির্ভর করা হয় তখন দুনিয়ার সকল সাফল্য ও বিজয় রাসূলের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। মুসলমানদের মনের সান্তনা ও শান্তির জন্য আল্লাহ্ নিজের প্রিয় দোস্তের সাহায্যে স্বীয় হাত প্রসারিত করে দেন। যাতে এই ধারণা হয় যে আল্লাহ্‌র হাতও মুমিনদের সাথে রাসূলের বিজয়ে শরীক রয়েছে। হে মুসলমানগণ! মনে রাখবে। রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য ছাড়া তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে না। সাবধানঃ কখনও যেন রাসূলের বিরোধিতা করার ধারণাও তোমাদের মনে না আসে। রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শামিল।

এরপর কুরআনের ৪৯ তম সূরা হুজুরাত শুরু হচ্ছে। এই সূরায় রাসূলুল্লাহর প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার ও রীতিনীতি ও সম্মানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহর সাথীদের মজলিশের কতিপয় রীতি ও সম্মানের পন্থা ও নিয়ম শেখানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূলকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করোনা। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র কাছে

সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ চরিত্র, ভালবাসা ও মমতার এক অনুপম ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্মান কর। তাঁর মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখ। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বণী ইসরাইলের সকল পয়গম্বরের চেয়ে উঁচু। তাঁর মজলিশে যখন আসবে তখন ধীর পদে আদব ও সম্মানের সাথে আসবে। যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে যাও। অনুচ্চ স্বরে কথা বল। রাসুলের সামনে উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে কথা বলবেনা। এতে তোমাদের সকল ভাল কাজ বরবাদ হয়ে যাবে। যেহেতু দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করা হচ্ছিল। দ্বীন ও শরিয়াতের মৌলিক শিক্ষাসমূহ পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য সামাজিক মেলা মিশার রীতি ও আদব, সভ্যতা, ভদ্রতা ও সম্মানের নিয়ম রীতির শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। মুসলিম ব্যক্তি ও ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য সভ্যতা ও সামাজিকতার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজ একটি সভ্য ভদ্র সমাজ। এবং আদব ও সম্মান এবং ছোট-বড় সবার পবিত্রতার প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ইহা ইসলামের উত্তরাধিকার, ইসলামের মহান ঐতিহ্য। মুসলমানকে সর্ব প্রথম ধৈর্য্যের পাঠ শিখানো হয়েছে।

সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। এরপর বিনয়াবনত বন্দেগীর জন্য নামাজের দ্বিতীয় পাঠ দেওয়া হয়েছে। খোদার আনুগত্যকারী লোক বিনয়ী ও ভদ্র হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ্, উঁচু চরিত্র ও কোরআনী শিক্ষার আলোকে গঠিত জীবনের এক আদর্শ রেখে গেছেন। মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিসম্বাদ হলে তাঁদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দাও। যে বাড়াবাড়ি করবে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর। মানুষের উপহাস তাচ্ছিল করোনা। কারও মনে ব্যথা দিওনা। একে অন্যকে খারাপ নামে ডেকোনা। কোন মুসলমানের সম্পর্কে কুধারণা করবেনা। কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দিওনা। ইহা পাপ। কারও গিবত করবেনা। আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল। আমি তোমাদের নারী পুরুষকে জন্ম ও বংশ ধারার মাধ্যমে বিস্তৃত করেছি। বংশ ও গোত্র তৈরী করেছি। যাতে তোমাদের পরিচয় সম্ভব হয়।

তোমাদের সম্মান ইজ্জত তোমাদের ভাল কাজ ও পরহেযগারীর কারণে। উঁচু বংশ ও গোত্রের কারণে নয়। এরপর কুরআনের ৫০ তম সুরা "ق" শুরু হচ্ছে। কুরআন মজীদের শপথ। মানুষ এ জন্য বিস্মিত যে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছেন। যিনি বিস্ময়কর সব কথাবার্তা বলেন। মানুষ মৃত্যুরপর পুণরায় জীবিত হবে। যমীন তো মাটি। শরীরকে খেয়ে ফেলে। মাটির মধ্যে কি প্রভাব রাখা আছে কেউ জানেনা। শুধুমাত্র খোদা জানেন। মাটি কনার প্রভাবের কথা 'লাওহে মাহফুজে' লেখা আছে। মাটির অনুসমূহ জ্বিন কোষের মৌলিক অনু নিজের মধ্যে রক্ষিত রাখে। তার নম্বর, মাত্রা এবং পরিচয়ের মৌলিক পদার্থ এই মাটির অনুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। যেখানে মানুষকে দাফন করা হয় সেখানকার মাটি খোদার হুকুমে নিজের অনু সমূহ থেকে ঐ ব্যক্তিকে একত্রিত করে জীবিত করবেন। ইহা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিধান।

আল্লাহ্‌র মহিমা ও ক্ষমতা অবলোকনের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনটা মিথ্যা প্রমাণিত করবে? আগের জাতিসমূহ নিজেদের নবীকে অস্বীকার করেছিল। কুরআন তাদের পরিণতি বর্ণনা করেছে। মানুষের প্রকৃতিতে সন্দেহ, দ্বিধা, সংশয় ও অনুমান বিদ্যমান। খোদা তো মানুষের জীবন ধমনী থেকেও নিকটবর্তী। কিন্তু মানুষ সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকে। মনে করে খোদা তার থেকে দূরে। কিছু দেখছেনা। অনেকে তো খোদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতিগত অবাধ্যতা ও নিজের মতকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা জেনে দু'জন ফেরেশ্‌তাকে তার কাঁধের উপর দিবা-রাত্র বসিয়ে রেখেছেন, যাতে তারা মানুষের কার্যকলাপ লিখতে পারে। দিবা-রাত্র মানুষের কর্মের ভিডিও ফিল্‌ম তৈরী হচ্ছে। প্রতিটি কথা রেকর্ড হয়ে ভিডিও ক্যাসেট তৈরী হচ্ছে। কিয়ামতের দিন এগুলি প্রদর্শিত হবে। কোন বিষয় সে অস্বীকার করতে পারবে না। এছাড়াও দু'জন ফেরেশ্‌তাকে তাদের হেফাজতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখন মৃত্যুর সময় মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যায় তখন এই অবস্থায় মানুষ মৃত্যুর বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী অবলোকন করে। কোথা কোন দিকে যেতে হবে। মানুষ এই দৃশ্য থেকে পলায়ন করে। ঘাবড়ে যায়। মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আজরাইল যখন রূহ কবজ করে তখন তার সাথে এই দুই ফেরেশ্‌তা মৃত্যুর যাতনা সাথে নিয়ে আকাশের দিকে যায়। আকাশে ইল্লিন ও সিজ্জিন অফিস থেকে তার আমলনামা জওয়াব দিবে। ঐ অনুসারে কবরে তার অবস্থান নির্ধারিত হবে। কবের মুনকার নকীর এসে প্রশ্ন করবে। এ ঐ মনযিল যা সম্পর্কে মানুষ পার্থিব জীবনে কিছু জানতে চাইত না, এর থেকে পলায়ন করতে চাইত। এবং একেবারে গাফেল ছিল।

হে মুমিনগণ! এই কঠিন সময়ের পূর্বেই নিজের আমল ঠিক কর। 'কিরামান কাতেবীন' তোমাদের কাধে বসে ক্যামেরা নিয়ে তোমাদের সকল কাজের প্রতিদিন ফিল্ম তৈরী করছে।*এবং তোমাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করছে। সাবধান! এদের থেকে গাফেল হয়োনা। নিজের কাজের সংশোধন করতে থাক। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত আছে। মৃত্যুর পূর্বে তওবা ও এস্তেগফার কর। নিজের আমল ঠিক কর। কুরআন উপদেশের প্রধান গ্রন্থ। ইহা পাঠ কর। এর থেকে তোমরা পথের দিশা পাবে। নিজের আমল সংশোধন কর। আখিরাতে প্রস্তুতির জন্য নিজের পাথেয় প্রস্তুত রাখ। মুমিনদের জন্য আখিরাতের বিশ্বাস খুবই জরুরী। মৃত্যুর পর জীবন সূরায়ে "ق"-এর মূল বিষয়বস্তু। এ সূরা কুরআনের একটি অক্ষরের রূপ তুলে ধরেছে। এর পর ৫১ নং সূরা-জারিয়াত শুরু। এই সূরাতে কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য পেশ করা হয়েছে। ঐদিন অবশ্যই আসবে। এই দিনের পূর্বে আমল ঠিক কর। তাওবা ও এস্তেগফার কর। বিচারের দিন যখন ফয়সালা শুনানো হবে তখন শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়ই সাথে সাথে পূরণ করা হবে। মানুষকে শুধু এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্বিনদেরকেও এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সকল সৃষ্টি নিজের নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তসবীহ পাঠ করে। নিখিল জগত খোদার প্রশংসা গুণ বর্ণনা ও যিকিরে ব্যস্ত। একমাত্র মানুষই আল্লাহ্‌কে ভুলে রয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র তেইশতম রজনী

(সাতাশ পারা)

সূরা যারিয়াত থেকে হাদীদ পর্যন্ত

সাতাশ পারা শুরু হয়েছে। সূরা যারিয়াত চলছে। প্রাচীন জাতিসমূহ এবং নবীদের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। অবাধ্য স্বভাব এবং একরোখা চরিত্র প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। সমাজের পত্যেক সদস্যের উচিত একে অন্যকে সদোপদেশ দেয়া ও ভাল কাজের নছীহত করা, যাতে অবাধ্যতা বিলুপ্ত হয় এবং মানবতা সঠিক রাস্তায় ফিরে আসে। অত্যাচারীদের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। সময় মতো তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে। আফসোস সে সব লোকদের জন্য যারা শেষ সময় পর্যন্ত ঈমান আনে না। এ ধরণের লোকদের জন্য আজাবের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

তূরের শপথ; যেখানে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার সাথে কথা বলেছেন। সে "লাওহে মাহফুজের" শপথ যেখানে সব কিছু আগে থেকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করা হয়েছে। শপথ সে পবিত্র কুরআনের যাকে উম্মুল কিতাব থেকে এনে মানুষের সামনে স্পষ্টভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। শপথ সে বায়তুল্লাহর যেখানে কুরআন মাজীদ নাজিল হয়েছে। শপথ আল্লাহর ঘরের যার ছাদ উঁচু। যা জগতে ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। শপথ সে সমুদ্রের যা পানিতে পরিপূর্ণ। এতগুলো শপথের পরও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না যে একদিন কিয়ামত আসবে? ভয় কর সে কিয়ামতের দিনকে যার আগমন কেউ রুখতে পারবে না। যেদিন আকাশ কেঁপে উঠবে, পৃথিবী শংকিত হয়ে পড়বে এবং পাহাড় নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আফসোসঃ তবুও তোমরা কিয়ামত এবং শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। যদি তোমরা আখিরাতে বিশ্বাস না কর এবং পাপের জীবন এবং কুফর ও শিরক থেকে দূরে না থাক তাহলে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাদের সহ্য হোক বা না হোক গুণাহ করলে তোমাদেরকে অবশ্যই দোজখে যেতে হবে। বেহেস্তী লোকদের জন্য বাগান রয়েছে, নহর রয়েছে এবং আরাম আয়েশের অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। খাবার জন্য উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। এসব হলো তাদের ভাল কাজের উত্তম বিনিময়। হে রাসূল! এসব কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অবাধ্যতা দেখে আপনি ধৈর্যহারা হবেন না। এরা

আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনার বিরুদ্ধে হত্যা এবং অন্য সব ধরণের চক্রান্ত আমি ব্যর্থ করে দেব। আপনি আমার হেফাজতে আছেন। কেউ আপনাকে হত্যাও করতে পারবে না এবং কোন রকম কষ্টও দিতে পারবে না। আমরা আপনাকে তাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাব। ওরা জানতেও পারবে না। সকাল-সন্ধ্যা এবং উঠতে-বসতে সদা আল্লাহর তাছবীহ পড়বেন এবং তাঁকে স্মরণ করবেন। রাতে যখন নক্ষত্রগুলো ডুবে যায় তখন নামাজ পড়বেন। সব সময় মনে রাখবেন আল্লাহ্ আপনার সাহায্যকারী এবং মদদ্গার।

এরপর পবিত্র কুরআনের ৫৩ নং সূরা নাজম-শুরু হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কতিপয় গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারকামণ্ডলীর শপথ। মুহাম্মদ (সাঃ) মোটেই পাগল নন-যেমন তোমরা তাকে মনে কর। তিনি আমার রাসূল, আমার কথা এবং হুকুম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। তিনি নিজের মনগড়া কোন কথা বলেন না। ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট থেকে যা পান তাই তিনি তোমাদেরকে শুনান। জিব্রাইল আমীন অনেক শক্তির অধিকারী একজন ফেরেস্তা। তিনি সব ফেরেস্তাদের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে আস্থাভাজন। তিনি তাঁর আসলরূপে প্রথম বার দেখা দেন হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থানরত মহানবী (দঃ)-এর সামনে। দ্বিতীয় বার তিনি তাঁর আসল রূপে ধরা দেন মিরাজের রাতে আল্লাহর আরশের নিকট ক্বাবা-কাওসাইনের উপর। এছাড়া তিনি কখনো নিজ প্রকৃত চেহারায় কারো সামনে নিজকে প্রকাশ করেননি। মহানবী (দঃ)-এর জন্য এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত ছিল। তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের জন্য সুন্দর মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে নিজের কাছে ডেকেছেন। তিনি তাঁর চোখ ও অন্তর দুটো দিয়েই আল্লাহর নূর দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট সব ফেরেস্তা থেমে গেল, তাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মহানবী (দঃ) তারও আগে গিয়ে আল্লাহর দীদার লাভ করেন। তাঁর সাথে কথা বলেন। তাঁর থেকে ওহী লাভ করেন। তাঁকে জান্নাতুল মাওয়া-দেখানো হয়েছে, যেখানে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্য জান্নাতীগণ রয়েছেন। তিনি তাদের সাথে দেখা করেছেন। সিদ্রাতুল মুনতাহার নিকট আল্লাহর নূরানী কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। সব কিছু মহানবী (দঃ)-এর জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছিল। নূরের প্রচন্ড আলোচ্ছটায় অনেক কিছু তিনি খোলাখুলি চোখ দিয়ে না দেখতে পারলেও অন্তর দিয়ে উপলব্দি করেছেন। মিরাজের এ রাতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাথে গোপনে অনেক কথা বলেছেন। তাঁকে সৃষ্টির অনেক অপ্রকাশিত রহস্য অবগত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বন্ধুকে বিশেষ সম্মান জানিয়েছেন।

এরপর অন্য প্রসঙ্গ এসেছে-কুরাইশ বংশের কাফেরদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাদের মিথ্যা উপাস্য লাত্, মানাত ও উজ্জার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সবই শিরকী ও কুফরী। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব। যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং গুণাহ কবীরা থেকে দূরে থাকে আল্লাহ তাদের ছগিরা গুণাহ্ মাফ করে দেন। তাদের পাপ মোচন করেন। হে মানুষ! তোমাদের পবিত্রতা তোমাদের সততার মধ্যে নিহিত। সব সময় আল্লাহ্কে ভয় করবে। আমরা ইব্রাহিমকে ছহীফা এবং মুসাকে তাওরাত দিয়েছি। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছি যে, সদা গুণাহ থেকে দূরে থাকবে। একজনের গুণাহর বোঝা অন্যজনে বহন করবে না। প্রত্যেককে নিজের গুণাহর ভার নিজেকেই বহন করতে হবে। এখানে কুরেশ সর্দার ওয়ালিদ বিন মুগীরার কথা তার নাম উল্লেখ না করেই বর্ণিত হয়েছে। তার উদাহরণ হলো নূহ (আঃ)-এর সময়কার সর্দারদের মতো যারা নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হয়েছিল। এ ব্যক্তিও বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

এরপর পবিত্র কুরআনের ৫৪ নং সূরা 'আলকামার' শুরু হয়েছে। মহানবী (দঃ) নবী জীবনের প্রথম দিকে একদিন চাঁদনী রাতের চতুর্দশ তারিখে ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে আংগুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরা করে ফেলেন। তারপর দ্বিখন্ডিত টুকরা দুটো এসে আস্তে আস্তে জোড়া লাগে। এতো বড় মুজেজা দেখার পরও কুরেশ সর্দারগণ এটাকে জাদু বলে আখ্যায়িত করলো। অন্যান্য নাফরমান জাতিগুলোর ন্যায় এদের অভ্যাসও চরিত্র এমনিই ছিল। ওরা যেমন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এরাও তেমনি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন সব জাতির অবস্থা এবং নবীদের কাহিনী এ জন্য বর্ণনা করেছে যেন এ সব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। যেন মক্কার কাফেরগণ তাদের কুকর্ম থেকে বিরত থাকে। পবিত্র কুরআন অতি সহজ আরবীতে তাদের সামনে প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে যেন তারা সব কিছু বুঝে নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারে। কিন্তু খুব কম লোকই এ থেকে সবক হাসিল করে। আ'দ জাতি প্রচণ্ড তুফানে ধ্বংশ হয়েছে। যা দিন-রাত ধরে অব্যাহত ছিল। হযরত ছালেহ (আঃ) উটনির ঘটনাও শুনানো হয়েছে। অথচ এ সব লোক কোন কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। এরা কখনো সোজা রাস্তায় আসবে না। আমার ফেরেস্তা তাদের আমলনামা তৈরী করেছে। সব কিছু লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে এক দিন এদের অবশ্যই বিচার হবে।

এর পর কুরআন মাজীদের বিখ্যাত সূরা আররাহ্মান শুরু হয়েছে। এটা ৫৫ নং সূরা। এটা খুবই সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত। প্রত্যেক আয়াতে আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর প্রশ্ন রয়েছে তোমরা আল্লাহর কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? বলা হয়েছে যে, দেখ জগতের সব কিছু একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে।

প্রত্যেক বস্তু সাবলীলভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। হে মানুষ! সৃষ্টির এ ব্যবস্থাপনায় তোমরা নিজেদের তরফ থেকে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না এবং কোন কিছু নষ্ট করার পরিকল্পনা করো না। এখানে সব কিছু সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত। এ জগতে মাটির উপর অথবা মহাশূন্যে কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। সৌরজগত এক বিশেষ নিয়ম-শৃংখলার অধীনে নিজ কাজ করে চলেছে। প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষ পথে আপন আপন গতিতে চলছে। এ সব কিছু আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান। এ সব কিছু তাঁরই অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। দুটো সমুদ্রকে দেখ আলাদা আলাদা রং ও পৃথক স্বাদ নিয়ে চলছে। যখন এরা একত্রিত হয় তখনও এ স্বতন্ত্র রং ও স্বাদ বহাল থাকে। কিছুক্ষণ একত্রে চলার পর আবার পৃথক হয়ে যায়। কেউ তাদেরকে এ মিলিত হওয়া ও পৃথক হবার কাজে বাধা দেয় না। আবার মাঝখানে কোন দেয়ালও নেই যে, উভয়ের রং মিশে যেতে বাধা দেবে। কুদরতী সিদ্ধান্তের কারণেই এদের রং ও পানি একত্রে প্রবাহিত হবার সময়ও আলাদা থাকে। আল্লাহর কুদরতেই লবনাক্ত সমুদ্র থেকে মিষ্টি পানির ঝরণা প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের তলদেশে তেলের কুপ আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রের পানির নীচ থেকে বের করা হয় মূল্যবান রত্নরাজি ও সাজ-সজ্জার উপাদান। এসব থেকে অলংকারাদি তৈরী হয় যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে এ সব কার কুদরতে ও নির্দেশে হয়? সমুদ্রের বুক চিরে তোমরা বড় বড় জাহাজ চালাও। কে সমুদ্রের বাতাস প্রবাহকে এ উদ্দেশ্যে তোমাদের অনুকুল করে দেন? তোমরা কোন কোন বিষয় অস্বীকার করবে ? আল্লাহর কোন কোন নেয়ামতের জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারবে ? এত কিছুর পরও তোমরা কিভাবে তাঁর অবাধ্য হতে পার এবং তাঁর হুকুম অমান্য করতে পার ?

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এতো প্রমাণ ও নিদর্শন দেখার পরও তোমরা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করছো এবং তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছনা। তাহলে জেনে রাখ এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন এ জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান, জমিন, গাছ-পালা কিছুই থাকবে না। সব কিছু বিলীন হয়ে যাবে। থাকবে শুধু আল্লাহর একক সত্বা তাঁর আরশ কুরসী ও তাঁর সীমাহীন প্রভাব। এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ প্রধান প্রধান দুটো প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। মাটি থেকে মানুষ এবং আগুন থেকে জ্বীন। একই জগতে বসবাস করলেও আমরা জ্বীনকে দেখতে পাইনা। তোমরা কি মহাশূন্য অথবা সমুদ্রের তলদেশে গিয়েও আল্লাহর আয়ত্বের বাইরে যেতে পারবে? জগতের সীমা ছেড়ে পালাতে পারবে? পারলে চেষ্টা করে দেখতো? আসলে মানুষ ও জ্বীন কারো পক্ষেই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আয়ত্বের বাইরে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর মানুষ ও জ্বীনের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হবে, আল্লাহর অবাধ্য হবে, কুফরী, শিরকি, অত্যাচার

ফেৎনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদিতে জড়াবে, তাকে অবশ্যই দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। মানুষ ও জ্বীনের জন্যই দোজখ তৈরী করা হয়েছে।

ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে প্রশ্ন করার আগেই তোমার চেহারায় দেখা দেবে কালিমা, উদ্বিগ্নতা ও ভীতির ছাপ। এ অবস্থায় তোমার পরিণতি কি হবে। সময় থাকতে সতর্ক না হবার কারণে এখন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও অন্তরে আল্লাহর ভয় নিয়ে ভাল পথে চলবে সে দুটো জান্নাত পাবে। এক জান্নাত সে এ পৃথিবীতে পাবে। অন্য জান্নাত মৃত্যুর পর আখিরাতে। সেখানে থাকবে দুটো পৃথক পৃথক বাগান যাতে থাকবে ছায়াদানকারী বৃক্ষ এবং যার তলদেশে প্রবাহিত হবে স্নিগ্ধ পানির নহর। একটি বাগান হবে প্রথম সারির নেক লোকদের জন্য। আর অন্যটি হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের নেক লোকদের জন্য। প্রথম গ্রুপ হলেন اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ এর অর্ন্তভুক্ত। আর দ্বিতীয় গ্রুপ হলেন اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ-এর দলভুক্ত। এটা অবশ্যই তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। সৎ লোকদের প্রতিদান আল্লাহ অনুগ্রহ দিয়ে দেন। উল্লেখিত শ্রেণীভুক্ত দুটো বাগান ছাড়াও আরো অসংখ্য বাগান থাকবে। যেখানে থাকবে অপরূপ সুন্দরী আয়ত লোচনা হুরগণ। আলাদা আলাদা তাঁবুতে বসে বসে তারা নেক লোকদের অপেক্ষায় থাকবে এবং আল্লাহর জিকর করতে থাকবে। فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ। এরপর ৫৬ নং সূরা 'ওয়াকিয়া' আরম্ভ হয়েছে। এতে রয়েছে মৃত্যুর উল্লেখ এবং ক্বিয়ামতের বিবরণ। যখন ক্বিয়ামত আসবে প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হবে। এ তিন ভাগের উল্লেখ রয়েছে সূরা বাকারার প্রারম্ভে। (১) আল্লাহ ও আখিরাতকে না দেখে বিশ্বাসী (২) কাফির, মুশরিক যারা শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত (৩) আহলে কিতাব যথা ইহুদী ও খৃস্টান এবং মুনাফিকগণ। নেক লোকদেরও তিনটি ভাগ হবে। (১) প্রথম দিকের মুসলমান যাদেরকে اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ বলা হয়। (২) এর পরবর্তী মুসলমান যাদের মধ্যে রয়েছেন মুহাজির, আনসার এবং প্রসিদ্ধ ছাহাবাগণ (৩) সাধারণ নেককার মুসলমানগণ। অসৎ পাপী এবং মুনাফিকদের মৃত্যুর দৃশ্য হয় বড়ই করুণ। বেহুশ-অবস্থায় চোখ বন্ধ হবার সাথে সাথে সে ঐ সব অবস্থা দেখতে পায় যার মুকাবিলা একটু পরেই তাকে করতে হবে। সে শুয়ে শুয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সে নিজেই নিজের পরিণাম দেখতে থাকে এবং তাকে যারা নিয়ে যাবে তাদের অপেক্ষায় থাকে। এ অবস্থাকে আমরা 'সাকরাতুল মওত' বলে থাকি। মৃত্যুর সময় প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহকে কেউ দেখতে পায়না। আজরাইল এসে তার জান কবজ করে তাকে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে তার আমলনামা দেখানো হয়। এর পর শেষ বিচারের পূর্ব পর্যন্ত কবরে অবস্থানের সময়কে বলা হয় 'আলমে বরজখ'। সেখানে

'মনকির-নকীর' তাকে প্রশ্ন করে উত্তর লিপিবদ্ধ করবে। তোমরা তো সে সময়কে ভুলে বসে রয়েছ। তবে এটা নিশ্চিত যে, তোমরা কোনভাবেই এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাদের যদি এতোই শক্তি থাকে তাহালে মৃত শরীরে রূহকে পূণঃ প্রবেশ করাবার চেষ্টা করে দেখতো সফল হতে পার কি-না? এটা হলো মাধ্যমিক স্তর। চূড়ান্ত বিচার হবে হাশরের মাঠে। কবর বা আলমে বরজখের সাথে মানুষের চূড়ান্ত আবাসস্থলের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। সৎ ও নেক লোকের কবরের সাথে বেহেস্তের সংযোগ স্থাপিত হবে এবং কবরবাসী সুখে নিদ্রামগ্ন থাকবে। আর অসৎ ও পাপী লোকের কবরের সাথে দোজখের সংযোগ স্থাপতি হবে এবং সে কবরে অশান্তিতে কাটাবে।

পরবর্তী সূরা হলো ৫৭ নং সূরা হাদীদ। জগতের সমগ্র সৃষ্টি নিজ নিজ পন্থায় আল্লাহর তাছবীতে মশগুল রয়েছে। একমাত্র মানুষই এমন যে, আল্লাহর অবাধ্য হবার সাহস পায়। সে ভুলে যায় যে একদিন তার মৃত্যু হবে, তাকে আল্লাহর দরবারে যেতে হবে এবং হিসাব-নিকাশ চুকাতে হবে। নেকী ও ছওয়াব রয়েছে সেসব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দান ছদকা করে এবং করজে হাছানার মাধ্যমে জনগণের উপকার করে। তারা কৃপণতা করে না এবং সব সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় লালন করে। এরা ভাল কাজ করার জন্য সব সময় উৎসাহী থাকে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সব সময় পরীক্ষা করতে থাকেন। কিছু লোক এমন রয়েছে যারা জাগতিক সব সম্পর্ক ত্যাগ করে সন্নাসী হয়ে বৈরাগ্য জীবন যাপনের পথ বেছে নেয়। ঘর-সংসার, স্ত্রী, সন্তান সব কিছু ত্যাগ করে খানকাবাসী হয়ে যায়। নবী-রাসূলদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনো এটা ছিলনা। রাসূলুল্লাহ (দঃ) পরিপুর্ণ সংসারী ছিলেন। স্ত্রী, সন্তান ও জাগতিক কাজ কারবারে ব্যস্ত ছিলেন। সাথে সাথে দ্বীনী শিক্ষা প্রচার করেছেন। এবং সে মোতাবেক আমল করেছেন। তিনি আল্লাহর নামে দুনিয়া ছাড়েননি এবং দ্বীনও ঠিক রেখেছেন। বস্তুতঃ 'হুকূকুল্লাহ্' এবং 'হুকূকুল ইবাদ' উভয়ের মর্যাদা ও ছাওয়াব ইসলামের দৃষ্টিতে সমান সমান। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ কারো বংশানুক্রমিক সম্পদ নয়। এজন্য এটা এমনিতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ পৃথিবীকে খনিজ সম্পদ দিয়ে ভরে দিয়েছেন এবং মানুষকে সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখিয়েছেন। মানুষের জন্য আল্লাহ সব নেয়ামত ও সম্পদ নিয়োজিত করেছেন। দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ) এ সব দিয়ে নানা রকম পণ্য উৎপাদন করেছেন। এভাবে আল্লাহ মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই দান করেছেন এবং না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখিয়েছেন। হুকূকুল্লাহ এবং 'হুকূকুল ইবাদ' দুটোর প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছেন। মানুষের সামনে দুটো পথ খোলা রয়েছে। সে একটা পথ বেছে নিতে পারে। সে ইচ্ছে করলে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে পারে। আর ইচ্ছা করলে অসত্য ও গুমরাহীর রাস্তায় যেতে পারে।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র চব্বিশতম রজনী

(আঠাশ পারা)

সূরা মুজাদিলাহ্ থেকে সূরা তাহ্রীম পর্যন্ত

হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের অতি নিকটেই রয়েছেন এবং তোমাদের সব কথা শুনছেন ও কাজ-কর্ম দেখছেন। এক মহিলা ঘরের ভেতর তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করছিল যে তাকে মা বলে সম্বোধন করেছিল। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আল্লাহ্ই ঠিক করে দেন। কোন ব্যক্তির এ সম্পর্ক বদলাবার এবং স্ত্রীকে মা বলার কোন অধিকার নেই। মা হলেন তিনি যে সন্তানকে পেটে ধারণ করে। সন্তান তো হয় মা-বাবার। মা-বাবার অধিকার ও সন্তানের কর্তব্য কুরআন মাজীদ শিখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্র আইন অটল। আল্লাহ্র আইন বিরোধী কথা বললে গুণাহ হবে এবং সেজন্য কাফ্ফারা দিতে হবে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মা বলে ডাকবে তাকে কাফ্ফারাহ্ হিসেবে একজন দাস মুক্ত করতে হবে অথবা ষাটজন মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। এরপর তার জন্য স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল করা বৈধ হবে। যে আল্লাহ্র সীমা লংঘন করবে সে গুণাহ্গার হবে এবং দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, শুনেন এবং সর্বত্র বিরাজমান। তোমরা কানাঘুষা এবং অতি গোপনে যেসব কথাবার্তা বল সেগুলোও তিনি জানেন। তোমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর যে বিরোধিতা লুকিয়ে রয়েছে তাও তাঁর জানা আছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। রাসূলের অনুকরণ কর। নিয়মিত নামাজ পড় জাকাত আদায় কর। বেশি করে দান-ছদ্কা কর। কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। মিথ্যা কসম খেয়ে লোকদেরকে ধোকা দিতে চাও এটা খুব কঠিন গুণাহ্। এর পরিণাম খুব ভয়াবহ। আল্লাহ্র নেক বান্দা যারা, সৎ ও মুত্তাকী যারা– তারা না দেখেই কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

এর পর আরম্ভ হয়েছে ৫৯নং সূরা হাশর। এ সূরায় রয়েছে আল্লাহ্র তাছবীহ্ ও গুণ-গানের কথা। রাত-দিন আল্লাহ্র গুণ-গান করতে থাক। অতঃপর এতে মদীনা থেকে ইহুদীদের বিতাড়নের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্যে তা সহজেই সম্পন্ন হয়েছে। এখানে দুটো হাশরের কথা বলা হয়েছে। একটা হাশর হলো ইহুদীদের ঘরবাড়ি এবং ক্ষেত-খামার ও বাগান ধ্বংস

হওয়া। অন্য হাশর হলো মদীনা থেকে তাদের বিতাড়ন। তাদের বিতাড়নের পর যেসব সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তা গরীব-মিসকীন এবং অভাগ্রস্তদের হক ছিল। যারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত হয়নি এবং ধৈর্যহারা হয়নি। তাদের মাঝে এসব সম্পদ বিতরণ করা হয়। কুরআন কোন মামুলী কিতাব নয়। এ কুরআনের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যের ধারণা তোমাদের নেই। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারী কিতাব। মনে কর যদি এ কিতাব মাটির উপর অবতীর্ণ করা হতো তাহলে এর ভারে জমিন উল্টে যেত, মাটির ভেতরে যত লুকায়িত সম্পদ রয়েছে সব বেরিয়ে পড়তো এবং কবরে দাফন করা মৃত মানুষগণ সব উঠে যেত ও চলাফেরা করা শুরু করতো। যদি সমুদ্রের উপর এ কিতাব নাজিল করা হতো তাহলে সমুদ্র শুকিয়ে যেত এবং সমুদ্রের যাবতীয় প্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যদি পাহাড়ের উপর এ কিতাব নাজিল করা হতো তাহলে এর ভারে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। মানুষ স্বেচ্ছায় আগ বাড়িয়ে এ কিতাবের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সবাই যখন এ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলো তখন মানুষ এগিয়ে আসলো। সুতরাং এ কিতাবের আসল রহস্য একমাত্র মানুষই জানতে পারে। সেই এ বোঝা বহন করতে পারে। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। তাঁর রয়েছে অনেক জাতি এবং ছিফাতী নাম। এসব নামের কোন বিকল্প নেই। তার স্মরণ থেকে কখনো দূরে থাকবে না। সকাল-সন্ধ্যা তাঁর স্মরণ ও জিকিরে মশগুল থাকবে। আল্লাহ্‌র অবস্থান মানুষের অন্তরে মানব অন্তরের বাইরে নয়।

এর পর ৬০ নং সূরা মুমতাহিনা। এতে ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে হে মুমেনগণ! মনে রেখ যারা খোদার দুশমন তারা মুসলমানদেরও দুশমন। তাদের সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব করা কখনো সম্ভব নয়। তোমাদের জন্য আমার প্রিয় বান্দা ইব্রাহিম (আঃ)-এর উদাহরণ কি যথেষ্ট নয়। যিনি আল্লাহ্‌র মহব্বতে তাঁর ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্য দেশে হিজরত করেছিলেন। মুসলিম মহিলারা কাফির মুশরিকদের নিকট থেকে যদি তোমাদের কাছে চলে আসে তাহলে তাদেরকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিওনা। তাদের সাহায্যকারীরূপে কাজ করবে। মুসলিম মহিলাদেরকে কাফিরদের অধীনে যেতে দেবে না। মুসলিম মহিলাগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। আর কাফির মুশরিক মহিলাগণও মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। এদের মাঝে বিয়ে-শাদী অবৈধ। যেসব নারী স্বেচ্ছায় কাফিরদের সাথে বসবাস করতে চায় তাদেরকে বাধা দেবে না। যেসব মুসলিম মহিলা ইসলামের উপর বায়াত করার জন্য এসেছে তাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বায়াত করাবে ঃ

(১) তারা শিরক করবে না (২) চুরি ও খেয়ানত করবে না (৩) নিজ সন্তানকে গর্ভাবস্থায় হত্যা করবে না (৪) ব্যাভিচার ও কুকর্মে লিপ্ত হবে না (৫) মিথ্যা অপবাদ দেবে না (৬) অন্য নারীর সন্তান চুরি করে নিজের সন্তান বলে দাবি করবে না। গর্ভধারণের আসায় অন্য কোন পুরুষের বীর্য গ্রহণ করবে না। (৭) শরিয়তের হুকুমের

বিরোধিতা করবে না। এ সাত বিষয়ে পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদেরকে বায়াত করাবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ্ সবাইকে মাফ করবেন ও ক্ষমা করবেন।

এরপর শুরু হয়েছে ৬১ নং সূরা সাফ্ফ। سَبَّحَ দিয়ে শুরু হয়েছে এ ধরণের তৃতীয় সূরা হলো এটি। আল্লাহ্ তায়ালার গুণ-গান দিয়ে শুরু হয়েছে এ সূরা। তারপর বলা হয়েছে হে মানুষ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কার্যে পরিণত করতে পারবে না। আল্লাহ্ তায়ালা এটা মোটেই পছন্দ করেন না। আল্লাহ্র রাস্তায় যখন জিহাদ কর তখন দুশমনের মোকাবিলায় সীসাঢালা পাথরের দেয়ালের মতো শক্ত হয়ে লড়বে মোটেই পিছু হটবে না। দৃঢ় আস্থার সাথে কাজ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখবে। আল্লাহ্ তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারীদের সাথে থাকেন। মানুষ সব সময় তাদের যুগের নবীদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং অস্বীকার করেছে। নবী-রাসুলগণ জনগণকে একটি মাত্র মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) সবাই এ কথাই বলেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে, তাঁরপর আহমাদ নামে একজন নবী আসবেন এবং তিনিই শেষ নবী হবেন। তাঁর যুগের লোকদের উচিত তাঁর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনুগত্য করা। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের অনেক লোক তাঁর প্রচারিত দ্বীন কবুল করেনি এবং তাঁর কথা শুনেনি। এমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ)-এর যুগেও অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান আনেনি। তবে তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম অন্য সব ধর্মের উপর বিজয়ী হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকার জন্যই এসেছে। হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সাথে এক ব্যবসায়ে যোগ দেয়ার আহবান জানাচ্ছেন। এই ব্যবসা খুবই লাভজনক। এ ব্যবসায়ে পূজি হলো তিনটি ঃ (১) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য (২) আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন সেগুলো গরীব-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য খরচ করা (৩) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে শরীক হওয়া। এ পূঁজি বিনিয়োগ করার পর যে মুনাফা হবে তা আশাতীত। আল্লাহ্ এর বিনিময়ে গুণাহ মাফ করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। আর হে উম্মাতে মুহাম্মাদী: তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাহায্য কর তেমনিভাবে যেমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহচরগণ তাঁর সাহায্য করেছিলেন। এ আয়াত মোতাবেক আমল করে অনেক সাহাবী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। এ আয়াত নাজিল হবার পর রাসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলেন– ইয়া আল্লাহ্ দ্বীনের কাজে আমাকে সহায়তা করার জন্য ওমর ইবনে হিশাম বা ওমর ইবনে খাত্তাবকে দান কর। আল্লাহ এ দোয়া কবুল করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব নিজে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর দরবারে এসে ছাহাবায়ে কেরামের কাতারে শামিল হয়েছিলেন।

এরপরে এসেছে ৬২নং সূরা জুমুয়াহ। يُسَبِّحُ দিয়ে যে সব সূরা শুরু হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটি প্রথম। এর পরে সূরা তাগাবুন يُسَبِّحُ দিয়ে শুরু হয়েছে। এ সূরার মূল বিষয় হলো মুসলমানদের সাপ্তাহিক সমাবেশ নির্ধারণ করা। আল্লাহ্র কালাম দ্বারা

মোমেন বান্দার অন্তর ও চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত হয়। বই পুস্তক পড়ে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। ইসলামী শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়। কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক জীবন যাপন করলে মানব জীবন পূর্ণতা লাভ করে এবং জীবনও মৃত্যুর রহস্য বুঝে আসে। সপ্তাহের সাতদিনের একদিন মুসলমানদের সমাবেশ করা অতীব প্রয়োজনীয়। মুসলমানগণ যদি ঐক্যবদ্ধভাবে শৃংখলার সাথে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ্‌কে সিজদা করে তাহলে তাদের আগত বংশধরগণও আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করবে এবং তাঁকে সিজদা করবে। জুময়ার দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় কাজ-কারবার বন্ধ থাকবে। এ সময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানদের শৃংখলা স্থাপনের জন্য নির্ধারিত। গোসল করে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে আল্লাহর ইবাদতের জন্য জুময়ার সমাবেশে যোগদান কর। আলাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর বন্দেগী শেষ করার পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ-কারবার আবার শুরু কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তথা হালাল রুজি অর্জনের কাজে লেগে যাও। এভাবে সুশৃংখল ও সৎ জীবন-যাপন করলে আল্লাহ অশেষ নেয়ামত ও রিজক দান করিবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। জুময়া মুসলমানদের উপর ফরজ। জুমার দিন খুতবার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। খুতবা শোনার জন্য চার রাকয়াত নামাজকে দুই রাকায়াতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে ৬৩ নং সূরা 'মুনাফিকুন'। মদীনার মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ মুনাফিকদের অন্তরের অবস্থা ভালভাবে অবগত আছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে (সাঃ) বলে দিয়েছেন তিনি যেন মুনাফিকদের জন্য দোয়া না করেন। আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য ইজ্জত-সম্মান, মাগফিরাত এবং ক্ষমা কিছুই নেই। হে মুসলমানগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী-সন্তান কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও নামাজ-রোজা থেকে বিরত রাখতে না পারে। আর যদি এ সবের কারণে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাও তাহলে তোমরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে হালাল রিজক দেবার ওয়াদা করেছেন। তিনি অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন। তোমরা তাঁর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে দান খয়রাত করবে। জাকাত তোমাদের জন্য আখিরাতের নাজাতের এক চমৎকার উছিলা। জীবন থাকতে নিজ হাতে নিজ অর্জিত সম্পদ থেকে হকদারদের হক আদায় করবে। দান-খয়রাত করবে এবং জাকাত দেবে। অন্যথায় তোমাদের অর্জিত সম্পদ অন্য লোক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং খেয়ে হজম করে ফেলবে। তুমি যে সম্পদ রেখে যাবে তা অন্যদের মাঝে বন্টন করা হবে। মৃত্যুর পর তোমরা খালি হাতে চলে যাবে। এজন্য মৃত্যুর আগে নিজ হাতে যতদূর সম্ভব সৎ পথে ব্যয় করে যাও। অভাবীদের সাহায্য কর না হয় পরে আফসোস করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন— দিয়েছেন ধন-দৌলত ও ব্যবসায়ে মুনাফা। জীবন অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য। যতদিন জীবন আছে নেক কাজ কর এবং আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ কর। তোমরা যা করবে আল্লাহ তা জানেন। তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

এরপর আসে ৬৪ নং সূরা 'তাগাবুন'। এ সূরা يُسَبِّحُ দিয়ে শুরু হয়। এতে মানুষের ক্ষতি কিসে তার বর্ণনা রয়েছে। জমিন ও আসমানের মালিক আল্লাহ্। জগতের প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র তাছবীহ পাঠ করে। আল্লাহর তাছবীহ্ ব্যতীত তোমরা দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে না। এ জগতে শান্তিতে বাস করতে হলে আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে তাঁর জিকির ও তাছবীহ্ করেই থাকতে হবে। জগত এক পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এখানে তাঁর হুকুমই চলবে। তোমাদের কাজ-কর্ম আল্লাহ্র মর্জি মোতাবেক হলে পরিণতিও তাঁর মর্জি মোতাবেক হবে। তোমাদের পরীক্ষা তোমাদের ঘর থেকেই শুরু হবে। স্ত্রী-সন্তানরা, মা বাবা, ধন-দৌলত প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্র মর্জি ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। নিজ মর্জিও ইচ্ছা অনুযায়ী চললে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সুখ, শান্তি এবং শৃংখলা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্র জন্যে যদি ভালবাসা থাকে তাহলে তাঁর রাস্তায় জান-মাল খরচ করে দেখাও। দান খয়রাত কর এবং নিয়মিত জাকাত আদায় কর অভাবী লোকদেরকে করজে হাছানা দাও। এর থেকে কয়েকগুণ বেশি আল্লাহ্ তোমাকে দেবার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখ। তাঁর স্মরণ থেকে কখনো বিরত থেকো না। আল্লাহর স্মরণ ও জিকিরের মধ্যে অনেক বরকত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে যদি তিনটি বিষয় মনে রাখি তাহলে সারা জীবন সুখে শান্তিতে কাটাতে পারবো। এ তিনটি বিষয় হলো আল্লাহ্র আনুগত্য, রাসূলের অনুসরণ ও আল্লাহ্র জিকির। আল্লাহ্র তাছবীহ্ ও জিকিরের বদৌলতে দুঃখ থাকে না এবং কোন দিক থেকে বিপদও আসে না। বরং মানুষ আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে যায়। যখন আমরা আল্লাহ্র বন্ধু হয়ে যাব এবং দিন-রাত তাঁর তাছবীহ ও জিকিরে ব্যস্ত থাকবো তখন আল্লাহ আমাদের সব গুণাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি বড় সদয় ও মেহেরবান।

অতঃপর শুরু হয়েছে ৬৫ নং সূরা তালাক। সূরা বাকারায় তালাক সংক্রান্ত যে বর্ণনা রয়েছে তাতে লোকজনের মনে কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য এ সূরা নাজিল করা হয়েছে। এ সূরায় তালাকের বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে মাসিক ঋতু স্রাবের আগের পবিত্র অবস্থায় থাকাকালে দিবে। এরপর ইদ্দতের সময় হিসেব করে তিন ইদ্দতের সময় পুরো করবে। তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের মেয়াদকালে যেন ঘরের বাইরে না যায়। ঘরের ভেতরেই যেন থাকে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোন সাময়িক ব্যাপার নয়। সারা জীবন টিকে রাখার জন্যই এ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সন্তানের লালন-পালন ও তালীম তারবীয়ত মায়ের জিম্মায় থাকে। স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব হলো পুরুষের। অবশ্য কোন কারণে যদি উভয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়, মতের অমিল হয় তাহলে সুন্দরভাবে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল। এজন্য তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তালাক আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক

প্রেমপ্রীতি, ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে অটুট থাকাই কাম্য এবং উত্তম। আত্মীয় স্বজনের মধ্যস্থতা এবং ভুল বুঝাবুঝির অবসানের দ্বারা এ সম্পর্ক যতদূর সম্ভব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত। তালাকের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক ও জটিল। ফিক্‌হের কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এরপর আসে ৬৬ নং সূরা তাহ্‌রীম ঃ হে মানুষ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলো তোমরা হারাম করো না। কথায় কথায় কসম খেয়ো না। কসম খাওয়ার কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। এ সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা উম্মুল মোমেনীনদেরকে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে ঐক্য জোট গঠন করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সম্মান করা ও তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকের কর্তব্য। কোন বিষয়ে তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে থাকলে তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি যদি কোন কারণে স্ত্রীদের কাউকে ত্যাগ করেন তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম নারীর ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং তোমাদের উচিত তাঁর কথা মতো চলা এবং তাঁকে কষ্ট না দেয়া এবং সব সময় তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করা। মানুষ নিজের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মানুষের উচিত প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। নবীর স্ত্রী হওয়া অনেক মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপার। হযরত লূত এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর পরিবারের কথা স্মরণ কর। নবীর স্ত্রী ও সন্তান হয়েও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছিল। সেজন্য তাদেরকে অত্যন্ত করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল। অথচ ফেরআউনের স্ত্রী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁকে আল্লাহ্ ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছিলেন। ফলে তিনি সম্মানিতা মহিলাদের দলভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেক আমলের বদৌলতে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করেছেন। হযরত মারয়াম (আঃ)-এর উদাহরণ হলো একজন সতী, নেক্‌কার ও আল্লাহ্‌র অনুগত নারীর। এ কারণে আল্লাহ তাঁকে অনেক মর্যাদার অধিকারী করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রী। এসব হলো ভাল ও মন্দ স্ত্রীদের উদাহরণ। নবীর স্ত্রী হয়েও যারা অবাধ্য ও নাফরমান ছিল তারা অবশ্যই আজাব ভোগ করবে। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুম আহ্‌কাম শিখাও এবং দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও— যা হবে অত্যন্ত কঠোর ও কষ্টদায়ক। আর হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র হুজুরে বিশুদ্ধ অন্তরে তৌবা কর এবং গুণাহ মাফ চাও। সত্যিকার তৌবা তিনি তাড়াতাড়ি কবুল করেন। তিনি ছাড়া তোমাদের গুণাহ্ মাফ করার অন্য কেউ তো নেই। গুণাহ্ থেকে মুক্ত হলে তিনি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যারা সত্যিকারভাবে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন ও তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা এ বলে দোয়া করেন— হে প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর। ঈমান ও হেদায়েতের নূর সদা আমাদের সার্থে রাখ। তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র পঁচিশতম রজনী

(উনত্রিশ পারা)

সূরা মূলক থেকে সূরা মুরসালাত পর্যন্ত

এ পারার প্রথম সূরা মূলকের তিরিশ আয়াত একজন গুণাহগারকে জাহান্নামের গর্ত থেকে নাজাত দেবার কাজ করে। এ সূরা মৃত ব্যক্তিকে কবর আজাব থেকে রেহাই দেয়। যে ব্যক্তি প্রতিরাতে এ সূরা তিলাওয়াত করবে তার কবর আজাব কমে যাবে। আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও প্রভু। সৃষ্টি জগতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 'আলমে মূলক' আর 'আলমে মালাকুত' 'আলমে মূলক' বা জাগতিক কাঠামো জগতের মালিক যেমন আল্লাহ্ তেমনি 'আলমে মালাকুত' বা আধ্যাত্মিক জগতের মালিকও তিনি। আসমানসমূহের উপর তাঁর আরশ। এ আসমান সাত স্তরবিশিষ্ট। প্রথম আসমানে রয়েছে সৌরজগত, গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য বস্তুর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। একে খোদায়ী প্রশাসন কেন্দ্র বা রাজধানীও বলা যায়। এর চারিদিকে রয়েছে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা। আসমানের ন্যায় জমিনেরও রয়েছে কয়েকটি স্তর। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো 'আলমে বরজখ'। কবরে দাফন করার পর মৃত ব্যক্তি জমিনের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে স্তর রয়েছে তা হলো সবচেয়ে বড় পাপীর ঠিকানা। মানুষ জমিনে যে রকম কাজ-কর্ম করবে সে রকম ফলাফল তারা আকাশ থেকে লাভ করবে। কুকর্ম, ফেৎনা-ফাসাদের কারণে আসমান থেকে আসে বালা মুছিবত, ঝড় এবং তুফান ইত্যাদি। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ট বাদ্শাহ। সমগ্র জগত তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনিই সবার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেন। জমিন ও আসমানের সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। মানুষের সৃষ্টির মধ্যে অবশ্য তফাৎ রয়েছে। এখানে রয়েছে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, মানবতা ও শয়তানীর তারতম্য। জগত হলো পরীক্ষার জায়গা। সেজন্য এখানে এ পার্থক্যের প্রয়োজন রয়েছে। এ পার্থক্য না থাকলে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ এর পরীক্ষা কি করে হবে। সরকারী শাসন তখনই তো কায়েম হবে যখন অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। এবং অত্যাচার ও জুলুম থেকে সমাজকে মুক্ত করা হবে। আর ভাল লোকদেরকে তাদের কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হবে এবং উৎসাহিত করা হবে। অবশেষে এক নির্ধারিত দিনে সব কাজের চূড়ান্ত হিসেব হবে। আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান তিনি কাউকে অযথা শাস্তি দিবেন না। সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত করা হবে। নামাজের মধ্যে চুপে চুপে এবং রাতের নির্জনতায়

ফেরেস্তারা সে রুহ নিয়ে আসমানে চলে যায়। কিয়ামতের একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সেদিন অতি নিকটে। সেদিন আকাশ তামার রং ধারণ করবে। পাহাড় টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। হায়-হুতাশের অবস্থা দেখা দিবে। একে অন্যের কথা ভুলে যাবে। কেউ কারো কথা মনে রাখবে না। ইবাদত বন্দেগীতে যাদের জীবন কেটেছে এবং যারা সৎ ও নেককার ছিলেন তারা অবশ্য সুস্থির থাকবেন। তারা তো কিয়ামতে বিশ্বাস করতেন এবং একদিন এরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে তা জানতেন। যারা নিয়মিত নামাজ পড়তেন, জাকাত আদায় করতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ধন-দৌলত বিতরণ করতেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন, নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতেন, আমনত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন তারা সেদিন সম্মান পাবেন, চিন্তা মুক্ত হবেন।

এরপর ৭১ নং সূরা হযরত নূহ (আঃ) এর নামে চিহ্নিত। তিনি তাঁর জাতিকে অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর পর অন্যজীবন আসবে। সে সময় তোমাদেরকে কুফর ও শিরক এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারা কোন কথাই শুনলো না। অস্বীকার করলো। নূহ (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা স্বীকার করলেন এবং নিজ জাতিকে ধ্বংস করার জন্য বদ-দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। বিরামহীনভাবে বৃষ্টি শুরু হলো এবং মহা প্লাবন দেখা দিল। সমগ্র জাতি ডুবে মারা গেল। তাদের সাথে তাদের উপাস্য দেবতা উদ, ছুয়াড়, ইয়াগুছ এবং নাছরা ডুবে ধ্বংস হলো। তাদের বংশধরগণ ও বাকি রইল না। অত্যাচারী, অবাধ্য লোকদের পরিণাম এরকমই হয়ে থাকে। এদের নাম নিশানা পর্যন্ত বাকি থাকে না।

এরপর শুরু হয়েছে ৭২ নং সূরা জ্বিন। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে জানালেন যে জ্বীনদের একদল তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা স্বীকার করেছে যে আল্লাহর উপর যাদের ঈমান রয়েছে তারা কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাকে। ইতিপূর্বে জ্বীনের এক গোষ্ঠি যাদু-টোনার কাজে লিপ্ত লোকদের সাথে মিলে-মিশে মানুষের অনেক কাজ করতো এবং তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিত। ভবিষ্যতবাণী করে মানুষকে সতর্ক করতো। এজন্য তাদের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। তারা ভাবতে লাগলো যে তারাও আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যখন আসমানে পাহারাদারির ব্যবস্থা জোরদার করা হলো তখন আকাশে তাদের আনা-গোনা বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা দুর্বল হয়ে গেল। ফলে তারা তাদের আসল পরিচয় জানতে পারলো। এ কারণে তারা নিজেদের কার্যপদ্ধতি সংগঠিত করে ঈমান আনলো। এ সূরার ৯ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে জ্বীনদের সাথে রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর যে

কথা বার্তা হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে। এর পর মক্কা শরীফের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ শেষ হয়েছে।

এরপর ৭৩ নং সূরা মুজাম্মেল শুরু হয়েছে। এ সূরায় আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্যে করে বলছেন হে কাপড়মুড়ি দিয়ে থাকা আমার প্রিয় রাসূল! উঠুন লোকদের কথায় কান দেবেন না। নিজের কাজ চালু রাখুন। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করুন। এতে অন্তর শক্তিশালী হয়। রাতে উঠে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করুন, তাঁর ইবাদত করুন। রাতের শুরু এবং শেষ পর্যায়ে তাঁর ইবাদত করুন। ছুবহে সাদেকের আগের সময় খুব মাকবুল হয়। সে সময় সারা দুনিয়া নিদ্রায় মগ্ন থাকে। আপনি তখন জেগে জেগে আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময় পরিষ্কার করে পড়ুন। রাতের ইবাদতকে বোঝা মনে করবেন না। অবশ্য ঘুম থেকে উঠা এবং ইবাদতের জন্য দাঁড়ানো বেশ কষ্টকর। কিন্তু এ নির্জনতার সময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন তাঁর দীদারের আশায় ঘুম থেকে উঠে তাঁর ইবাদতে দাঁড়িয়ে যায় তখন তাঁর প্রবৃত্তি নিজ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এ সময় খুব একাগ্রতা হয়। এ নির্জনতায় খুব মজা লাগে। কাফের মুশরিকগণ আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তা আমার জানা আছে। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাকে সময় দিন। একটু অপেক্ষা করুন। দেখুন তাদের কি দুরাবস্থা হয়। কিয়ামতের খবর দেয়া এবং কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য আমি আপনাকে পাঠিয়েছি। আমি মুসা (আঃ) কে মিসরে পাঠিয়েছিলাম ফেরআউনকে ভয় দেখাবার জন্য। কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনলো না। তাদের যে পরিণতি হয়েছে কুরআন তার বর্ণনা দিয়েছে। তোমাদের পরিণামও সে রকম হবে। কিয়ামতের ভয়াবহতা তোমাদেরকে বৃদ্ধ বানাবার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র ওয়াদা কখনো মিথ্যে হয় না। মুত্তাকীগণ আল্লাহ্‌কে ভয় করে। নিয়মিত নামাজ পড়ে। আল্লাহর স্মরণে নিজেদের সময় ব্যয় করে। এদের অনেকে গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করে দোয়া চাইতে থাকে। কোন সময় ভাল তা আল্লাহ্ জানেন। তাহাজ্জুদের সময় হলো সর্বোত্তম সময়। এসময় ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি যতটুকু সম্ভব করা উত্তম। কুরআন বেশী করে তিলাওয়াত কর। এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। শীতের রাতে কম্বল ছেড়ে উঠে আসা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র জন্য একষ্ট স্বীকার করে আল্লাহ তা দেখেন ও শুনেন। এটা হলো নফল ইবাদত। দিন হলো রুজি রোজগারের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকার জন্য। দিনে ইবাদতের সময় কম পাওয়া যায়। সারা দিন কষ্ট করার পর রাতে আরামের প্রয়োজন রয়েছে। যেন সকালে সুস্থ মন নিয়ে উঠে আবার কাজে মনোনিবেশ করা যায়। এজন্য সারাদিনে

পাঁচবার নামাজ নির্ধারিত করা হয়েছে। এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, জাকাত আদায় কর এবং অভাবীদেরকে করজে হাসানা দাও। ছদকা-খয়রাত আখিরাতে তোমার সাথে যাবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট গুণাহ্ মাফ চাও।

এরপর শুরু হয়েছে ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছের। মক্কায় অবতীর্ণ একেবারে প্রথমদিকের সূরাগুলোর মধ্যে অন্যতম। হে রাসূল! দ্বীনের কাজের জন্য উঠে দাঁড়ান। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন। লোকদের কে বুঝাতে থাকুন যে মূর্তি পূজায় কোন লাভ নেই। তাদের উচিত মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা। আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। তিনি পাক পবিত্র। হে রাসূল! আপনিও আপনার কাপড় পাক পবিত্র রাখুন। কিয়ামতের ভীতিকর অবস্থা লোকদের সামনে তুলে ধরুন। এক ব্যক্তি বেশ কঠোরভাবে আপনার বিরোধিতা করছে। তাকে আমার সোপর্দ করে দিন। সে ধন-সম্পদ ও সন্তানের গৌরবে দিশেহারা। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ও খাহেশ রাখে। অতি শীঘ্রই তার মৃত্যু হবে। (বদরের যুদ্ধে নিহত) কিয়ামতের দিন তাকে অনেক কঠিন আজাব দেয়া হবে। দোজখের দরজায় রয়েছে ১৯ জন প্রহরী। তারা কাউকে ছাড়বে না। কাফেরদের পৃথক পৃথক উনিশ স্তর হবে। প্রত্যেক কাফির মুশরিক চায় তাকে মুজেজা দেখানো হোক। তাদেরকে বলে দিন যে কুরআন হলো সব চেয়ে বড় মুজেজা।

এরপর শুরু হয়েছে ৭৫ নং সূরা আল কিয়ামাহ্। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসের কসম খাচ্ছেন। মানুষের যে নাফস তাকে মন্দ কাজের জন্য ভৎর্সনা করে সে নাফসেরও কসম খাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে রয়েছে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি মানুষকে সর্বদা কুপথে পরিচালিত করে। তার অন্তরে নানা রকম কুচিন্তা ঢুকিয়ে দেয়। এর প্ররোচনায় সে কামনা বাসনা চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহকে ভয় করা থেকে দূরে থাকে। মৃত্যুর পরের জীবন এবং কিয়ামত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির দাস হয়ে সে সদা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে। লাগামহীন ঘোড়া ও বাঁধনহারা ষাঁড়ের মতো স্বেচ্ছাচারিতার জীবন যাপন করতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। আখিরাতের ভয় দেখালে বলে কিয়ামত কবে আসবে? সে বলতে থাকে যে জীবন একটাই। মৃত্যুর পর সব শেষ। তার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে এবং ফেরেস্তা যখন তার জান কবজ করতে আসবে তখন তাকে কে বাঁচাবে? মৃত্যু যন্ত্রণায় যখন সে ছটফট করবে তখন কে তাকে উদ্ধার করবে? ঐ সময় তো তার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তাকে আল্লাহর দিকে যাত্রা করতে হবে।

হে মানুষ! সে চূড়ান্ত সময়ের আগে সতর্ক হয়ে যাও। তাওবা কর–আল্লাহ্‌র নিকট গুণাহ মাফ চাও। আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। নিয়মিত নামাজ পড়। নেক কাজ কর। সৎ কাজে মন দাও। ভেবে দেখ তোমাদের মূল উৎস কি? এক বিন্দু নাপাক পানি থেকে

তোমরা এ অবয়ব লাভ করেছ। শৈশব ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পা রেখেছ। এখনো অসর্তক অবস্থায় রয়ে গেছ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মৃত্যুর পর আবার জীবনের ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান পোষণ কর।

এর পরবর্তী সূরা হলো ৭৬ নং সূরা আদ্দাহার। মানুষের জীবন এক বিন্দু পানি থেকে শুরু হয়। পানির সামান্য এক বিন্দু কোথা থেকে কোথায় এসে গেছে। তবুও সে আল্লাহ্‌র অকৃতজ্ঞ রয়ে গেছে। দুনিয়ার সব নেয়ামত পেয়েছে তবুও আল্লাহ্‌কে চিনলোনা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলো না। বস্তুতঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অকৃতজ্ঞ। সে সদা প্রবৃত্তির কামনা, বাসনা এবং লালসা মেটাতে ব্যস্ত থাকে। এভাবে মানবতা শয়তানী ও পশুত্বে রূপান্তরিত হয়। এজন্য প্রয়োজন ছিল মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার। হে রাসূল! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাবার জন্য। তাদেরকে জান্নাত ও দোজখ উভয়ের অবস্থা ভালভাবে বুঝিয়ে দিন। এরপর তাদের ইচ্ছামত তারা চলার পথ বেছে নেবে। হে রাসূল! তাদের অবাধ্যতা এবং নাফরমানীর ক্ষেত্রে আপনি ধৈর্য্য ও ছবরের সাথে কাজ করবেন। ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকবেন। রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বেন এবং আল্লাহ্‌র জিকির করবেন। "হুকুকুল্লাহ্" এবং 'হুকুকুল ইবাদত' দুটোই পুরো করবেন। এ জগতে যা কিছু ঘটে তা আমার মর্জি মোতাবেক ঘটে। আমি যা চাই তাই হয়।

এরপরে রয়েছে ৭৭ নং সূরা 'মুরসালাত'। প্রেরিত সে কোন বস্তু যা মেঘের আকারে পানি বহন করে আকাশে ঘোরাফেরা করে? এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রদর্শনী। আসমানে এসব কাজের জন্য আল্লাহ অনেক ফেরেস্তা নিয়োগ করেছেন। তারা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম মোতাবেক নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করে। যখন আকাশে মেঘ গর্জন করে, বিদ্যুৎ চমকায় এবং চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায় তখন আসমানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাগণ ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তারা মনে করে যে হয়তো কিয়ামত এসে গেছে। কিয়ামত যেদিন হবে সেদিন অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেটা হবে বড় কঠিন দিন। আফসোস! অনেক লোক এ কঠিন দিনকে অস্বীকার করে এবং বিশ্বাস করেনা। এ বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এদের প্রকৃত পরিচয় কি? তারা তো মায়ের গর্ভে এক বিন্দু নাপাক পানিরূপে পড়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব কুদরতী হাতে তাকে বড় করেছেন। সে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে। আস্তে আস্তে তার শরীরে গোস্ত এসেছে, হাড় জন্মেছে। এক নির্দিষ্ট সময়ে সুস্থ্য-সবল শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে। তাকে আল্লাহ্ দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি দান করেছেন। পানির এ বিন্দু এখন এতো লাফানো শুরু করেছে যে, আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করে বসেছে। কথায় কথায় সে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করে। আফসোস! মানুষ তার আসল পরিচয় ভুলে গেছে। তাকে বুঝানো দরকার। যতটুকু সম্ভব হেদায়াত ও নছীহত করা প্রয়োজন।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র ছাব্বিশতম রজনী

(তিরিশ পারার অর্ধাংশ পর্যন্ত)

সূরা নাবা থেকে ফজর পর্যন্ত

সূরা নাবা'র শুরুতে কিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। এটা হবে এক প্রচন্ড ভীতিকর অবস্থা। অতঃপর এতে আল্লাহ্র নেয়ামত ও ইহ্সানসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সেদিন আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন ঃ শিংগাতে ফু দেবার জন্য। এ শিংগার আওয়াজে সব মৃত ব্যক্তি দৌড়ে অস্থির হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং বলতে থাকবে কে আমাদেরকে কবর থেকে ডেকে উঠালো ? দৌড়াতে দৌড়াতে তারা শেষ বিচারের স্থল হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। সেদিন আকাশ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সেখানে রাস্তার পর রাস্তা দেখা যাবে। পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ হয়ে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে এবং তুলার মতো উড়তে থাকবে। দোজখকে টেনে কাছে নিয়ে আসা হবে। দোজখের জলন্ত অগ্নিশিখা পাপী ও নাফরমান লোকদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে। দোজখ হলো মন্দ লোকদের ঠিকানা, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে খাবার জন্য এমন বস্তু দেয়া হবে যা গিলতে খুব কষ্ট হবে। পান করার জন্য তাদেরকে দেয়া হবে গরম পানি। বরং তাদেরকে পূঁজ পান করানো হবে। এভাবে তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের বদলা দেয়া হবে। এসব কাজ তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। যেসব লোক আল্লাহকে ভয় করে, আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তারা নেক-লোক এবং তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। সুস্বাদু ফল এবং মজাদার খাবার দেয়া হবে তাদের খাবার জন্য। সেখানে থাকবে আংগুর ও খেজুরের সুন্দর সুন্দর বাগান। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে থাকবে সুন্দরী যুবতী নারীগণ। পাত্রভরা সুমিষ্ট পানীয় দেয়া হবে তাদের পান করার জন্য। সেখানে কোন অর্থহীন কথা-বার্তা শুনা যাবে না। জান্নাতী সৎ লোকদের জন্যে হবে এসব পুরস্কার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্র ইখতিয়ারে রয়েছে সবকিছু। সব ফেরেশ্তা হাত বেঁধে তাঁর দরবারে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কারো কথা বলার সাহস হবে না। এটা হবে চূড়ান্ত বিচারের দিন। সৎ লোকদেরকে তাদের ভাল কাজের জন্য উত্তম বদলা দেয়া হবে। মন্দ লোকদের তাদের কু-কর্মের জন্য দেয়া হবে মন্দ বদলা। প্রত্যেকের আমলনামা সেদিন প্রত্যেকের হাতে থাকবে। কাফিরগণ বলে উঠবে হায় আফসোস! এদিন আসার আগে যদি মাটি বা পাথর হয়ে যেতাম।

এর পরের ৭৯ তম সূরা হলো নাজেয়াত والنازعات। ঐ সব ফেরেশ্তাদের শপথ করে বলা হয়েছে যারা মুমিন ও কাফেরদের রুহ কবজ করার জন্য নিযুক্ত আছে। রুহকে মানব শরীরের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। আল্লাহ্র ফেরেশ্তা আজরাইলের সাথে আরও দু'জন ফেরেশতা থাকে যারা রুহের সাথে সাথে আকাশের

দিকে উড়ে চলে যায়। এই দু'জন রক্ষী ফেরেশ্‌তা আজরাইলের সাথে বিভিন্ন আকাশ সাঁতরিয়ে উর্ধ্ব আকাশে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর ওখান থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই নির্দেশ অনুসারে রুহকে আকাশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর তাকে আলমে বারযাখে পৌছানো হয় এবং পরলৌকিক জগতের প্রতিক্ষায় রুহ বিশ্রাম করে এবং নিজের ভাগ্যবরণ করে। যখন কিয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে তখন ঈস্রাফিলের আওয়াজে কবরের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয়ে কবর থেকে বের হয়ে আসবে। এবং আত্মাকে শরীরের সাথে যুক্ত করা হবে। মৃতের নাম পরিচয়সহ সমস্ত লোক আসল অবস্থায় ফিরে আসবে এবং ঐ দিন সবাই ভয়ে কম্পমান হবে। চোখ লজ্জায় নীচের দিকে অবনত থাকবে। ঐ দিন সবাই জানতে পারবে যে তারা বড় ক্ষতির সন্মুখীন। তাদের কাছে নিজের আখিরাতের জন্য কোন পাথেয় নেই। তারা কিয়ামতকেই বিশ্বাস করত না। এরপর ইস্রাফিল দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুকবেন। এবং সমস্ত মৃত ব্যক্তি হাশরের মাঠে সমবেত হবে। সকলের আমলনামা তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। সবার হিসাব নিকাশ হবে। এবং শাস্তি ও পুরস্কারের কথা শুনানো হবে। এরপর ওয়াদীয়ে তুয়ার পবিত্র স্থানে মুসা (আঃ) কে আহবান করার কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। তাঁকে কেমন করে নবুওয়্যত দান করে এবং মুজিজা দিয়ে ফেরআউনের নিকট পাঠানো হয়েছিল। সে ফেরআউন খোদার বিদ্রোহী ও নাফরমান হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের ইচ্ছামত নিজের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ও কামনায় বিভোর হয়ে অহংকারী, দাম্ভিক ও অবাধ্য হয়েছিল। তাকে ভয় দেখানো ও ধমকানোর জন্য মুসা ও হারুন (আঃ)-কে পাঠানো হয়েছিল। সে তাদের কথা বিশ্বাস করেনি এবং তাঁদের কথা মানেনি। এবং আল্লাহ তাঁর অহংকার ও দম্ভ চূর্ণ করার জন্য তাকে সাগরে ডুবিয়ে ছিলেন। ফেরআউনের ঘটনার মধ্যে মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। খোদার শক্তি ও মহিমার নিদর্শনাবলী দেখ। এসব নিদর্শন দিন-রাত তোমাদের সামনেই আছে। খোদার দান ও অনুগ্রহ স্বীকার কর। যে অনুগ্রহ দিবা-রাত্র তোমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। যিনি তোমাদের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রুযী ও রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এরপরও তোমরা খোদার একত্ববাদকে অস্বীকার কর ? পয়গাম্বরের কাজ হলো খোদার হুকুম পৌছে দেওয়া। যখন কিয়ামত হবে তখন এর এক দিন দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। মানুষ বলবে আমরাতো পৃথিবীতে খুবই অল্প সময়ের জন্য ছিলাম, একদিন অথবা দুদিনের বেশি ছিলাম না ।

এর পরের সূরা হবে عبس আবাছা। মক্কার কাফিরদের মজলিশে হুজুর দ্বীনের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত। এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবী দ্বীনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য সেখানকার মজলিশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি হুজুর (সাঃ)-এর সাথে কথা বলতে শুরু করে দেন। মক্কার কাফির এবং বড় বড় কোরাইশ নেতৃবর্গ হুজুরের কথার মাঝখানে একজন সাধারণ অন্ধ ব্যক্তির বাধা সৃষ্টি অশোভনীয় মনে করল। হুজুর (সাঃ)ও এরূপ আচরণ পছন্দ করেননি। আল্লাহ্‌র জালাল ও পরাক্রমের দরিয়ায় তরঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, হে দোস্ত! আপনার দরবারে আমার খাঁটি বান্দার

এরূপ প্রবেশ আপনার কাছে অপছন্দনীয় হয়েছে এবং আপনি তাদের দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন যারা কখনও ঈমানের পথে আসবে না। হে সুহৃদ! দ্বীনকে বুঝার জ্ঞান দান করা আমার কাজ, আপনার কাজ নয়। এবং আপনি এজন্য চিন্তিত হবেন না। আপনাকে এ দায়িত্ব কখনও দেওয়া হয়নি যে কে ইসলাম গ্রহণ করল, কে করল না তা দেখবেন এবং আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। যারা খোদাকে ভয় করে এবং রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক আপনি তাদের জন্য বেশি চিন্তা করুন এবং তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন। এই হেদায়েত ও নছিহত 'লাওহে মাহফুজে' তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যে পরহেযগার সে হোদায়েত লাভ করবে। যে এই হেদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করবেনা সে ধ্বংস হবে। এই সব অস্বীকারকারীদের অবস্থা দেখ। তারা একফোটা অপবিত্র পানি থেকে পয়দা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের বুদ্ধি, বোধশক্তি, চোখ, কান সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন। আর আজ তারা এই জ্ঞান-বুদ্ধির বলে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়ে আওয়াজ উঠাচ্ছে। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার আমি তার জীবন দান করবো এরপর আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। মানুষের উচিত সে আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকে, আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। নিজের কাজের পর্যালোচনা নিজেই করে। নিজের বাঁচার চিন্তা নিজেই করে।

এর পরের সূরা হলো التكوير। তাকভীর । এ সূরাটিও কিয়ামতের বর্ণনার সাথে শুরু হয়েছে। কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। কেমন করে নিমিশের মধ্যে সৌর ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যাবে। চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী আলোহীন হয়ে ঝরে পড়বে। এই তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জের জীবনও বিস্ময়কর জীবন। এরা নিজে নিজেই পয়দা হয় এবং মারা যায়। তাদের ভাগ্য হিসাব করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নিখিল জগত তারই সৃষ্টি। তিনিই এর স্রষ্টা এবং বিলুপ্তকারী। এই রাসূলও তাঁরই। ফেরেশ্‌তা উর্ধ্বলোক থেকে ওহী নিয়ে রাসূলের উপর নাজেল করে। জিব্রীল আমীন আসীম শক্তির অধিকারী আল্লাহর এক নিকটতম ফেরেশতা। যাকে আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করার দায়িত্ব দিয়ে একজন অতি বিশ্বস্ত ফেরেশ্‌তা বানিয়েছেন। হুজুর (সাঃ) এই বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে মক্কার উপত্যকায় আকাশে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখেছিলেন। এরপর এই ফেরেশতা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। এসব ঘটেছিল হিরা গুহায়। হে মানুষ! এই কুরআন পাঠ কর। এর হেদায়েত ও উপদেশের উপর আমল কর। তোমরা নিজের জন্য ঐ সব চাইতে পারনা যা খোদা তোমাদের জন্য না চান। খোদার ইচ্ছা, ইরাদাহ, মর্জি সব কিছুর উপর ব্যপ্ত। তিনি যা কিছু চাইবেন তাই হবে। এরপর ৮২ তম সূরা "انفطار" কিয়ামতের বর্ণনার সাথে শুরু হচ্ছে। যখন সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যাবে। কবরসমূহ বিদীর্ণ হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে সে কেমন ভাল কর্ম সাথে নিয়ে এসেছে। এবং পিছনে কি রেখে এসেছে। দুনিয়ার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। উত্তম হল সুন্দর কর্মময় জীবন। ধৈর্য ধারণ কর। দুনিয়ার গোলাম হয়ে আখিরাত ভুলে গিয়ে জীবন যাপন করনা। আল্লাহ্ তোমাদের ডানে ও বাঁয়ে দুজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত

করেছেন। যারা তোমাদের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধ করছে। তোমাদের কথা ও কর্মের ভিডিও ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট ও টেপ রেকর্ড করে যাচ্ছে। যাতে তোমরা কোন সময় অস্বীকার করতে না পার। তোমাদের সকল কর্মের ফিল্ম তোমাদের দেখানো হবে। এবং সেই অনুসারে তোমাদের বদলা দেওয়া হবে। শাস্তি ও পুরস্কার এই আমলনামার গণনা, শুমার ও পরিমাপের উপর নির্ভর করবে। তোমাদের এ ব্যাপারে কোন খবর নেই। কিয়ামতের দিন সব খবর পেয়ে যাবে। খুব কম লোকই কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্‌র দাঁড়ি- পাল্লার আদালতে পুরা ন্যায়বিচার করে বদলা দেওয়া হবে।

এরপর ৮৩তম সূরা المطففين শুরু হচ্ছে। এই সূরার বিষয়বস্তুও কিয়ামত, কিয়ামতের অস্বীকার এবং মৃত্যুর পর জীবন। মাপে যারা কম বেশি করে তারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে না। কিয়ামতকে তারা অস্বীকার করে। কিরামান কাতেবীন বা সম্মানিত লেখক ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাদের প্রত্যেকটি কাজ লিপিবদ্ধ করে চলেছে। তাদের কর্মের ফিল্ম ও টেপ রেকর্ড সব কিছু হচ্ছে। কোন কোন বিষয় তারা অস্বীকার করবে। এবং কেমন করে অস্বীকার করবে। তাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। তাদের প্রতিটি আচরণ ফিল্‌মবন্দী করা হয়েছে। তারা বলে বেড়ায় বিগত যামানার কথা মিথ্যা ও অলীক কিচ্ছা কাহিনী। তাদের অন্তরের উপর মরিচা পড়েছে। কিয়ামতের দিন সব কিছু জানা যাবে। আমি সবার আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে ইল্লীন ও সিজ্জীনে সংরক্ষিত করছি। পুরাপুরি রেকর্ড তৈরী আছে। আল্লাহ্‌র দুই রক্ষী ফেরেশতা পৃথক পৃথকভাবে এর তত্ত্বাবধান করছে। পুণ্যবান লোকদের বেহেশ্‌তে সুস্বাদু পানীয় সালসাবীল দ্বারা আপ্যায়িত করা হবে। মেশ্‌কের সুগন্ধি মাখানো বিশেষ সিলযুক্ত শরবত দেওয়া হবে। কাওসার কুপের সুস্বাদু আরামদায়ক পানীয়, তাসনীম নামক ঝরণার জীবন সঞ্জীবক পানি বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত থাকবে। হতভাগ্য কাফির ও বিধর্মীগণ বেহেশ্‌তী মানুষদেরকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করবে কি অবস্থায় আছ। কিয়ামতের দিন পুন্যবান মুসলমান কাফিরদের দেখে হাঁসবে। এদের দোযখে দেখা যাবে। এর পরের ৮৪ তম সূরাটি হলো انشقاق। এতে কিয়ামতের দৃশ্য ও আমলনামার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। কিয়ামতের দিন জমিন তার গচ্ছিত সমস্ত সম্পদরাজী বাহিরে বের করে দিবে এবং একেবারে খালী হয়ে যাবে। হে মানুষ! তুমি পার্থিব জীবনে সকল দুনিয়া পাওয়ার জন্য কষ্ট ও পরিশ্রমরত ছিলে। টাকা পয়সা অর্জন করার ধান্দায় স্বাস্থ্য ও জীবনের শান্তি খতম করে দিয়েছ। এখন মৃত্যুর মুখে চলে এসেছ। এখন বল আখিরাতের জন্য তুমি কি কামাই করে এসেছ। আমলনামা দেখা হবে। ভাল আমলনামার পুরস্কার হবে বেহেশ্‌ত। খারাপ ও মন্দ আমলনামার শাস্তি হবে দোযখ ও জাহান্নামে অবস্থান। কুরআন গোধূলীর লালিমার শপথ, রাতের আঁধারের শপথ করে বলছে যে দিন-রাত্রির বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। এমনিভাবে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন হ'তে থাকে। কখনও ঘুমের অবস্থা, কখনও বিশ্রামের অবস্থা, কখনও শ্রম ও কষ্টের অবস্থা। কখনও শৈশব, কৈশোর তারুণ্য ও বার্দ্ধক্যের অবস্থা। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছে যায়। এতো মানব

জীবনের এক জগত। আবার দ্বিতীয় জগত হলো বরযাখী জগত। যেখানে কবরের অবস্থা এবং বিশ্রাম ও প্রতিক্ষার অবস্থা। তৃতীয় হলো পারলৌকিক জগত বা আলমে আখিরাত। মৃত্যুর পরও জীবন বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়। জমীনের সাত স্তর। আলমে বরযখে গুনাহগার লোক বিভিন্ন স্তরে থাকবে। এসব স্তর তাদের আমলনামা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হবে। মানুষকে এভাবে আখিরাতের শাস্তির সংবাদ দাও। যারা নেককার হবে তারা ভাল পুরস্কার অবশ্যই পাবে। এরপর ৮৫ তম সূরা البروج যা কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করছে। কিয়ামত জুম্মা এবং আরাফাতের দিন সংঘটিত হবে। উভয় দিবস এক সাথে আসবে। ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট জীব পুনরায় জীবিত হবে। মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্‌তামণ্ডলী আল্লাহ্‌র সমীপে একত্রিত হবে। আমলনামা সকলের হাতে হবে। সকলকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সকলের সাথে ন্যায় বিচার করা হবে। বেহেশ্‌তী ও দোযখী লোকদের পৃথক ও আলাদা করা হবে। তওবা ও এস্তেগফারকারীদের সুযোগ দেওয়া হবে। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও মার্জনাকারী। তিনি নিখিল জগতের প্রভু এবং বিচার দিবসের মালিক। তিনি আ'দ, সামুদ এবং গহ্বর ওয়ালা সকল জালিমের কথা তোমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে যারা সংশোধন হতে চায় তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। 'লাওহে মাহফুজ' থেকে নাযিলকৃত এই গ্রন্থে সবার অবস্থা, সবার পরিণতির কথা শুনানো হয়েছে। ইহা উপদেশপূর্ণ এক মহান গ্রন্থ।

এরপর কুরআনের ৮৬ তম সূরা "الطارق"। রাতের শেষ প্রহরে যে তারা উদিত হয় তা আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা যা তারকারাজির আলোয় ঝলমল আকাশের শোভা বৃদ্ধি করে এবং স্বীয় বিশেষ চলার ভঙ্গিমায় হ্রাস ও বর্দ্ধিত হতে থাকে। এই নক্ষত্র কে نجم الثاقب বা উজ্জ্বল তারা বলা হয়। মানুষের আমলনামা ও এমনিভাবে লিখিত হয়, হ্রাস পায়, বৃদ্ধি পায় এবং তা আকাশে সংরক্ষিত থাকে। উহা কেবল কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। এর সময় নির্দিষ্ট আছে। মানুষের নিজের জীবনের মর্ম ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা ও জানা উচিত। নর-নারীর সৃষ্টি শুক্র ডিম্বের মিলনের ফলে সম্ভব হয়। বীর্য কি জাতীয় পদার্থ। নর ও নারীর শরীরের ভিতর থেকে, হৃদয় ও মস্তিষ্কের পিছনের অংশ থেকে, মেরুদণ্ডের হাঁড় অতিক্রম করে, প্রধান অঙ্গসমূহ আলোড়িত করে এবং নারীর বক্ষ নিষ্পেষিত করে এই পদার্থ নির্গত হয়। নরের পিঠের পেছন থেকে বের হয়ে প্রজনন অঙ্গে একত্রিত হয়। একে অন্যের বংশ, উত্তরাধিকার, সৌন্দর্য, রোগ-ব্যাধি ও অবস্থার নির্যাস এক ফোঁটা বীর্য যখন সম্ভোগের মাতামাতির মধ্যে পরস্পর মিলিত হয় তখন ভ্রূণ তৈরী হয়। আল্লাহ্ স্বীয় কৌশল, ইচ্ছা ও মর্জিতে ইহাকে ফলবান করতে পারেন অথবা বিলুপ্ত করতে পারেন। নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করাতে পারেন অথবা জরায়ুর বাইরে রাখতে পারেন। এটা হলো সৃষ্টির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ মৃত্যুর পর কবরে শুরু হয়। মাটির শরীর কবরের মাটির সাথে মিশে যায়। যা কিয়ামতের দিন ধরিত্রি মাতার উদর থেকে পুনরায় পয়দা হবে।

কুরআনের বাণী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। কুরআনের প্রত্যেকটি কথা অটল। এটা কেউই পরিবর্তন করতে পারবেনা। লোক এই গ্রন্থ পড়তে মানতে টাল-বাহানা করে। আল্লাহ্ও এদের দূর্ভাগ্য ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে কৌশল ও অজুহাত তালাশ করতে থাকেন। যেরূপ তারাভরা রাতের আঁধারের মধ্যে النجم الثاقب উজ্জ্বল হয়ে ঝকমল করতে থাকে। ঠিক অনুরূপভাবে সংকীর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মুর্খতা ও গোমরাহী পূর্ণ পৃথিবীতে النجم الثاقب এর ন্যায় কুরআন মজীদ উজ্জ্বল জ্যোতি ও হেদায়েতের উৎস। কুরআনের এক একটি আদেশ শ্বাশ্বত বাণী। এর দ্বারা জীবনকে সংশোধন করে নাও। জিদ ও অবাধ্যতার দিন হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র। জীবনের অবকাশ খুব বেশি পাবেনা। সময় খুব কম মনে কর তোমাকে কিছুদিনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ নিঃশ্বাস নিতে পারবে। তেমাদের কিছুদিনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এরপর রোগ-ব্যাধির খপ্পরে পড়বে। এরপর আমরা তোমার সকল চালাকী ষড়যন্ত্র এবং বাহানার রশি ধরে টান দিব। এবং তোমাদের ভালভাবে দেখে নিব। এরপর কুরআনের ৮৭ তম সূরা اعلى শুরু হচ্ছে। এই সূরা কুরআনের তকদীর সম্পর্কিত দর্শন বর্ণনা করছে। আল্লাহ্ সবার সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সারা বিশ্বের রব ও প্রতিপালক। তিনি প্রত্যেক বস্তু বিশেষ পরিমাণ ও আন্দাজে হিসাব করে পরিমাপ করে তৈরী করেছেন। তার আন্দাজ, পরিমাপ, হিসাব কিতাব এত সঠিক যে প্রত্যেক বস্তু নিজেই আপন শক্তি ও গতিতে নিজের কাজ করতে থাকে। এর হেদায়েত ও পথ নির্দেশনার ব্যবস্থার বোতামের উপর কার অঙ্গুলী রয়েছে ? এর ব্যবস্থাপনা কার এখতিয়ারভুক্ত ? তোমরা একথা জানতে পার। আল্লাহ্ সবার রিযিকদাতা ও মালিক। যে সব খড়-কুটা মাটির মধ্যে জমা হয়ে কাল মাটিতে পরিণত হয়। এটাও আল্লাহর মাটি সৃষ্ট জীবের খোরাক হিসাবে কাজে লাগে। জমীনের উদ্ভিদ, বৃক্ষ, ফল-ফুল, তরকারী ও ফসল, ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মানুষের খাদ্য ও পশুর খোরাক আমিই পয়দা করি। রিযিক সরবরাহ করার দায়িত্ব আমার। আমি স্রষ্টা রিযিকদাতা। কুরআন পড়তে থাক। আপনা থেকে সব মনে পড়বে। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আমি কোন কিছু বিস্মৃত হবনা। হে রাসূল! আমি পুনরায় আপনার সকল কঠিন কাজ সহজ করে দিব। আল্লাহর স্মরণ থেকে কখনও গাফেল হবে না। হতভাগা সে যে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল এবং কুরআন থেকে দূরে সরে যায়। তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। হে নবী! নামাজ পড়তে থাকুন। আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠ ও যিকির বেশি করে করুন। দুনিয়াদার লোক দুনিয়ার জীবনকে গুরুত্ব দেয়। আমরা পরকালের জীবনকে গুরুত্ব দেই।

এরপর কুরআনের ৮৮ তম সূরা " الغاشية " কিয়ামতের বর্ণনার সাথে শুরু হচ্ছে। غاشية অর্থ আচ্ছাদনকারী। যখন কিয়ামত আসবে তখন এই বিশ্বচরাচর ও জমীনকে ঢেকে ফেলবে এবং সর্বব্যাপী হয়ে চারিদিক ছেয়ে যাবে। এবং সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। দুষ্কৃতিকারীদের কন্টক বিশিষ্ট খাদ্য ও ফল এবং আযাবের কূপ থেকে টগবগে টগবগে গরম পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে। যারা পরহেযগার এবং পুণ্যবান হবে তাদের চেহারা হাসিতে উজ্জ্বল হবে। তাদেরকে বেহেশ্তে পৌছে দেওয়া

হবে। উত্তম ফল ও শান্তিদায়ক পানীয় দ্বারা তাদেরকে আপ্যায়িত করা হবে। সবকিছু আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতায় হবে। আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিমা দেখতে হলে উটের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা কর। তাকে আল্লাহ্ কেমন করে বানিয়েছেন। তার সৃষ্টি ও আকৃতি অন্যসব পশু থেকে আলাদা। এসব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। যাকে যেমন চেয়েছেন তেমনভাবে বানিয়েছেন। আল্লাহ্ বড় প্রভু। তার সামনে অবনত হও। কুরআনের উপদেশ ও নছিহতের উপর আমল কর। যে মানেনা তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমরা তার থেকে হিসাব নিব।

এরপর ৮৯তম সূরা "الفجر" শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্‌র শক্তি ও মহিমা এই যে তিনি জোড় ও বেজোড় সংখ্যা সমূহের মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন। জিলহজ্ব মাসের নবম তারিখ মহররম মাসের দশম তারিখ, নামাজের রাকাতের মধ্যে দুই রাকাত, তিন রাকাত কখনও চার রাকাত ফরজ করেছেন। জ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে এর মধ্যে। বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি তোমরা একটু চিন্তা কর তাহলে বুঝতে পারবে। আ'দ জাতি পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর, শক্তিশালী, জ্ঞান, কৌশল এবং নির্মাণ শিল্পে অদ্বিতীয় ছিল। মিসরের ফেরআউনের দরবারে পিরামিড নির্মাণকারী কারিগর ছিল। কতনা বিশাল ও দূর্লভ নমুনা বরবাদ ও ধ্বংস করা হয়েছে। এজন্য যে এরা আল্লাহর পয়গাম্বরদের অমান্যকারী, বিদ্রোহী ছিল। এবং আল্লাহ্‌র বিধান এ যে, তিনি জাতিসমূহকে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তাদের পরখ করেন। খুব কমই এ পরীক্ষায় সফল হয়েছে। বেশির ভাগ ব্যর্থ হয়েছে। এদের কাছে দুনিয়া বেশি লোভনীয় ছিল। সম্পদের প্রতি বেশি আসক্তি ছিল। দান খয়রাত কখনও করতনা। আল্লাহ্‌কে মোটেও ভয় করতনা। কিয়ামতের দিন সকল ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যাবে। ফেরেশ্‌তামণ্ডলী সারি বেঁধে আকাশ থেকে অবতরণ করবে। ঐ দিন হেদায়েত উপদেশ কোন কাজে আসবেনা। হায়! জীবনে যদি আখিরাতের ভাবনা একটু ভাবত! আখিরাতের জন্য কিছু পাথেয় সাথে নিত! মানুষের নফস সব সময় মানুষকে অপদস্ত করেছে। নাফসে আম্মারা কখনও সাথ ছাড়েনি। খুব কম লোকই ভাগ্যবান যারা প্রশান্ত নফস نفس مطمئنة লাভ করেছে। এরাই সফলকাম হয়েছে ভাল কাজে। এরূপ প্রশান্ত আত্মাকে বলা হবে যাও বেশ্‌তে প্রবেশ কর। তোমার পছন্দনীয় স্থান। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমিও আল্লাহ্‌র উপর খুশী।

بسم الله الرحمن الرحيم

তারাবীহ্'র সাতাশতম রজনী

(তিরিশ পারার শেষ ২৫ সূরার তিলাওয়াত)

সূরা আল্-বালাদ, আশ্শামস ও লাইল

মক্কা নগরীর শপথ। যেখানে খোদার কেন্দ্রীয় ইবাদতগাহ অবস্থিত। যেখানে সর্বশেষ পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন। যেখানে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেখানে ৩৬০টি প্রতিমার পংকিলতা এবং কুফর ও অন্ধকারকে দূরিভূত করে সব কিছু পরিষ্কার করা হয়েছে। এই শহর শান্তি ও নিরাপত্তার শহর। এই শহরে লড়াই ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মানুষকে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে এবং সে নিজের সীমা থেকে বাইরে চলে গেছে। সে আল্লাহ্র হেদায়েত ও তাওফিক লাভ করেছে কিন্তু সে তা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের মধ্যে এই ধারণা ও অহমিকা বিদ্যমান যে সে নিজের পরিশ্রম ও যোগ্যতার বলে সবকিছু অর্জন করে এবং সে নিজেই নিজের ভাগ্য নির্মাতা। কিন্তু এরূপ কখনও নয়। সে মনে করে যে তাকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে আর একজন ব্যক্তি আছে। অন্য আর এক ব্যক্তি তার কাছে বসবাস করছে। আসল মানুষ সেই। তার আত্মা। মৃত্যু তাকেই স্পর্শ করে। এই আত্মা তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করে। আবার পথভ্রষ্ট করে। মুমিন হলে দান-খয়রাত করে। অভুক্তকে খানা খাওয়ায়। ঋণগ্রস্ত মানুষের ঋণ পরিশোধ করে। মানুষের জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করে। ভাল ও পুণ্যের কাজ করে। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা সে। এ اصحاب الميمنة ভাগ্যবান লোকদের দলভুক্ত হবে। যারা আল্লাহ্র বিদ্রোহী ও অবাধ্য, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অস্বীকারকারী। এরা اصحاب الميمنة বা হতভাগার দল। বাম হাতে আমলনামা ধারণকারীর দল। এদেরকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর ৯১তম সূরা الشمس শুরু হচ্ছে। এখানে মানুষের নফসের বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ স্বীয় জ্যোতির্ময়তার নিদর্শনসমূহের শপথ করছেন। যা মানুষের পার্থিব জীবনের জন্য পয়দা করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে আর একজন মানুষকে রাখা হয়েছে। যাকে নফস বলা হয়। যে বাইরের মানুষকে চালায়, উৎসাহিত করে। বিপথগামী করে, সংশোধন করে। বাইরের মানুষ দেহ। ভিতরের মানুষের জন্য আবরণ। ভিতরের মানুষ আসল মানুষ। যে বক্ষের নীচ থেকে পায়ের অর্ধেকাংশ পর্যন্ত অধিকার করে আছে। যা

চায় তাই করে। যে দিকে চায় নিয়ে যায়। সমস্ত অঙ্গ তার কবজা ও আয়ত্বের মধ্যে থাকে। নফসের আকাংখা ও ভোগের নাম জীবন। আ'দ ও সামুদ জাতি কি করেছিল? মন যা চেয়েছে তাই করেছে। সালেহ পয়গম্বরের উষ্ট্রী খোদার নিদর্শন হয়ে এসেছিল। মন চেয়েছিল তাকে মেরে ফেলেছিল। যার ফলে আল্লাহ্‌র আযাব নিজের মাথায় করে নিজেরাই নিয়েছিল এবং পরিশেষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এরপর ৯২তম সূরা الليل আরম্ভ হচ্ছে। আগের সূরা الشمس দিনের উদয়ের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এই সূরা রাতের অন্ধকার এবং সূর্যের অস্ত যাওয়ার সাথে শুরু হচ্ছে। এইসব দিন-রাত্রি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী। নারী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি তাদের একতা, ভালবাসা সব খোদার নিদর্শন, খোদার দান ও অনুগ্রহ। মানুষের নিজের স্বজাতির সাথে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও জগতের শক্তিসমূহের সাথে একাত্ম হয়ে পরস্পর ঐক্য ও সহযোগিতার সাথে বসবাস করা উচিত। মানুষের সংযোগ রয়েছে নিখিল জগতের সাথে, দিনের সাথে, রাতের সাথে, আলোর সাথে, আঁধারের সাথে, বাতাসের সাথে পানির সাথে। এসব আল্লাহ্‌র দান। মানুষের জীবন ও তার মেজাজ প্রকৃতির গঠনের জন্য এসব প্রয়োজনীয়। যদি এইসব প্রাকৃতিক মাধ্যমগুলো আল্লাহ্ থেকে হটে গিয়ে কৃত্রিম আলো, কৃত্রিম রাত-দিন সৃষ্টি করে তাহলে মানুষের জীবন পদ্ধতির মধ্যে দারুণ বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সে পীড়িত ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্ নতুন জীবনের এইসব কৃত্রিম সৃষ্টিকে, কৃত্রিম জীবন পদ্ধতিকে পছন্দ করেন না। যা আপনা আপনি সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ে। কুরআনের কাজ হলো পরিষ্কারভাবে নছিহত করা, দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণনা করা। আখিরাত হলো সর্বোত্তম জীবন। যা হোক তোমরা দান খয়রাত কর। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভাল কাজ কর। প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন কর। আল্লাহ্‌র নেয়ামতরাজী ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

সূরা আদ্‌দুহা, সূরা আলাম নাশরাহ ও সূরা আত্‌তীন

সূরা الضحى কুরআনের ৯৩তম সূরা। উজ্জ্বল দিনের শপথ যার পরে রাতের অন্ধকার নেমে আসে বিশ্বচরাচরে। ইহা প্রকৃতির ব্যবস্থা। আল্লাহ্ স্বীয় সুহৃদকে কখনও একাকী ছেড়ে দেননি। কখনও তিনি তাঁর থেকে গাফেল থাকেননি। হে বন্ধু! আল্লাহ্ তোমার জন্য এই দুনিয়ার চেয়ে উত্তম পুরস্কার আখিরাতে রেখেছেন। আল্লাহ্ আপনার উপর সন্তুষ্ট ও খুশী। শীঘ্রই আল্লাহ্ আপনাকে নিজের অনুগ্রহের উপহার প্রদান করবেন। (হাউজে কাউসার) এমন এক নিয়ামত যা দেখে আপনি খুশী হবেন। ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা। যখন আল্লাহ্ আপনাকে পৃথিবীতে পয়দা করেন তখন আপনি এতিম

ছিলেন। আপনার মা আপনাকে হালিমার ঘরে পাঠিয়ে দেন। আমি আপনার অভিভাবক ছিলাম। আপনি দরিদ্র ছিলেন। আল্লাহ্ আপনাকে ধনী করেছেন। সম্পদ দিয়েছেন। প্রেমময়ী স্ত্রী খোদেজাকে দিয়েছেন। তাঁর থেকে সন্তানাদি দিয়েছেন। সকল নিয়ামত আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনি গরীব, দুস্থ মিসকীনদের অভিভাবক হন। তাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ আপনাকে নিজের একান্ত আপনজন করেছেন। আপনি চিন্তা করবেন না। গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতে থাকুন। কোন ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কাকেও ধমকাবেন না। আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ করতে থাকুন।

এর পরের সূরা হলো الم نشرح। হে রাসূল! আমরা আপনাকে শৈশবকাল থেকেই পয়গম্বরী কাজের জন্য নির্বাচন করেছি। কুরআন অবতীর্ণ করার জন্য আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করে পাক-সাফ করেছি। কাউসার তছনিমের পানি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করেছি। বক্ষের পংকিলতা ফেরেশ্তা ধুয়ে পরিষ্কার করেছে। একে শক্ত ও মজবুত বানিয়েছে। যাতে কুরআনের বোঝা ধারণ করতে সক্ষম হয়। শীঘ্রই এই বক্ষে কুরআন নাযিল হবে। কুরআন আমানতের এমন এক বোঝা যা কেউ গ্রহণ করতে চায়নি। সবাই অপারগতা প্রকাশ করেছে। আমি জানি যে আপানার বক্ষ বিদীর্ণ করে আপনার অন্তরকে মজবুত ও পবিত্র করা হয়েছে যাতে আপনি কুরআনের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করতে পারেন। আপনার উপর একটি বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এ কাজের জন্য আমি আপনাকে পছন্দ করেছি। পৃথিবতে আপনার নাম ও কথা উঁচু করেছি। আপনার উপর দরূদ ও সালাম। সমস্ত পৃথিবী কিয়ামত পর্যন্ত আযানের মধ্যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। এবং সকলের চেয়ে অধিক আপনার নাম আকাশে, জমীনে উচ্চারিত হবে। হে বন্ধু! কঠিন সমস্যা দেখে ঘাবড়াবেন না। সকল কষ্টের পর সুখ আসে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। নিজের সাংসারিক ও ব্যক্তিগত কাজের ব্যস্ততা থেকে যখন ফারেগ হবেন তখন খোদার দিকে একাগ্র হয়ে যান। আনন্দের সাথে তাঁর এবাদত বন্দেগীতে লেগে যান।

এর পরে সূরা হলো التين। পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির মধ্যে যাইতুন গাছ সবচেয়ে উত্তম। এর মধ্যে উদ্ভিদ জীবনের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট রয়েছে। এরপর তৃতীয় উত্তম সৃষ্টি হলো جمادات বা জড় পাথর ও খনিজ বস্তু। যার মধ্যে তুর পাহাড়ের সৃষ্টি উত্তম। এই পাহাড় উঁচু সংকল্প ও দৃঢ় ইচ্ছার প্রতীক। যেখানে আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বর মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। সাফা মারওয়া পাহাড় বিবি হাজেরার ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাক্ষ্য দেয় এবং মক্কা নগরী যেখানে আল্লাহ্র হাবীব পয়দা হয়েছিলেন উত্তম স্থান। সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হলো মানুষ। তাকে

সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। তার সকল পুণ্য কাজ, ঈমান ও বিশ্বাসের জীবন, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং আখিরাতভিত্তিক ঈমানের প্রতিফলন। এর উত্তম পুরস্কার তাকে আল্লাহ্ আখিরাতে প্রদান করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ احكم الحاكمين বা সর্বোত্তম বিচারক হবেন।

সূরা আলাক, সূরা আল-কদর ও বাইয়্যেনাহ্

কুরআনের ৯৬তম সূরা আলাকের প্রথম তিনটি আয়াত সর্বপ্রথম হেরা গুহায় জিব্রাইল এসে শুনিয়েছিল, শিখিয়েছিল। এটাই প্রথম ওহী। আল্লাহ্র রাসূল পড়া শিখে নিয়েছেন। আল্লাহ্র নামে, যিনি রহমান ও রহীম এবং নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। মানুষ কিছু জানতনা। আল্লাহ কলম দ্বারা শিখিয়েছেন। জ্ঞানকে কলম দ্বারা সংরক্ষিত করেছেন। জ্ঞানের কারণে মানুষ গর্বিত হয়। জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা দ্বীন বুঝতে চায়। দ্বীনকে জ্ঞানের অনুগত রাখতে চায়। প্রত্যেক কথা জ্ঞান দ্বারা জানতে চায়। বিশ্বাসের ব্যাপারে জ্ঞানের কোন হাত নেই। ঈমান عقيده بالغيب বা অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসের নাম। কিছু না জেনে না বুঝে বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। মানুষের জন্য এটা একটি বড় ভুল যে সে বিশ্বাস জ্ঞান দ্বারা অর্জন করবে। এই কারণে মক্কার বড় বড় বিদ্যান, জ্ঞানী, ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা জ্ঞানের জোরে দ্বীন বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু এসব ভাষাবিদ পণ্ডিতরা দ্বীন অর্জন করতে পারেনি। হাবশী ক্রীতদাস বেলাল, উটের রাখাল বেদুঈনের ছেলে ওমর, দ্বীন হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্কে ও আল্লাহ্র রাসূলকে পেয়েছিলেন। বিশ্বাস জ্ঞানের উপর প্রাধান্য পেয়েছিল। বিশ্বাসের জয় হয়েছিল। অবিশ্বাসীদের মাথার চুল ধরে টেনে হেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। মক্কায় বড় বড় বিদ্যান যুদ্ধবাজ কোরেশ নেতা শায়বা, ওতবা, অলীদ, আবু জেহেল সবাই বদরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আল্লাহ্কে কে রুখতে পারে?

এর পরের সূরার নাম القدر। নব বধুর সাজে সজ্জিত, সুন্দর ও সুরভি মন্ডিত এই সূরা انا انزلناه দিয়ে শুরু হয়েছে। মর্যাদা ও মহিমাময় রজনীতে অবতীর্ণ এই সূরা রহমতের রজনীতে অবতীর্ণ এই সূরা। যে রাত হাজার রাতের সমান। কুরআন নাযিল হওয়ার বরকতময় রজনীতে আকাশ থেকে মর্ত্যে আপন সুহৃদের সাথে কথা বিনিময় হয়। রমযান মাসের বেজোড় রাতে রহমত বরকত ও মর্যাদা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই রাতের ইবাদত ও মর্যাদা সওয়াব ও পুরস্কার হাজার রাতের ইবাদত ও সওয়াবের

সমান। লাইলাতুল কদর কি এবং কে জানতে পারে এর রহমত ও বরকরতে কথা। ঐ রাতে আল্লাহ্‌র আদেশে অসংখ্য ফেরেশতা আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পরহেজগার ও সৎকর্মশীল মানুষের সাথে করমর্দন করে। তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পয়গাম শুনিয়ে যায়। অনুগ্রহের সুসংবাদ দিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলে মানুষের শান্তি, মুক্তি ও মাগফিরাত এবং রহমত প্রভাত হওয়া পর্যন্ত ছেয়ে থাকে। এর পরের সূরা হলো ৯৮তম সূরা। যার নাম বাইয়্যেনাত। মক্কা রাসূলের জন্মস্থান। এ শহর সম্মানিত পূর্ব পুরুষ ইসমাইলের জন্মের শহর। এবাদতের কেন্দ্র আল্লাহ্‌র প্রথম ঘর। খোদার প্রথম নিদর্শন। খোদার নিদর্শনের চিহ্নস্বরূপ এই শহরে সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়। এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিদর্শনস্বরূপ মোজেজা হিসাবে শ্রুত ও পঠিত হতে থাকবে। এর পূর্বে তওরাত ও ইন্‌যিলে খোদার যত নিদর্শন এসেছে তার পূর্ণতা বিধানে শেষ সংস্করণ এবং পূর্ণ সংস্করণ কুরআন শেষগ্রন্থ এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। সৎ পরহেজগার এবং ঈমান্দার লোক খোদার এই ঘরে ইবাদতের জন্য আসতে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনদার আল্লাহ্‌র পূজারীদের এখানে ভীড় লেগে থাকবে। আখিরাত বিশ্বাসকারীরা বেহেশ্‌তের উপযুক্ত হবে। তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। আল্লাহ্ মুমিনদের উপর রাজী এবং মুমিনরা আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট ও খুশী হবে।

সূরা ঝিলঝাল, আদিয়াত, ক্বারিয়াহ্, আত্বাকাছুর থেকে নাস পর্যন্ত

কুরআনের ৯৯তম সূরা زلزال কিয়ামাতের দৃশ্য পেশ করছে। যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তু থর থর করে কাঁপতে থাকবে, তখন মানুষ হতভম্ব হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে কি হয়েছে? তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তাঁর আদেশে এসব ঘটছে। আজ জমীন তাঁর আমানত বাইরে বের করে দিবে। আজ يوم الحساب হিসাব নিকাশের দিন। মানুষের আমলনামা উপস্থিত করা হবে। তাদের কর্মসমূহ দেখা হবে। যার কর্মের ওজন বেশি হবে তাকে উত্তম পুরস্কার দেওয়া হবে আর যার কর্মের ওজন কম হবে সে নিজের মন্দ কাজ ও দুষ্কৃতি পড়ে নিবে। এরপর ১০০ নম্বর সূরা والعاديات কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করছে। জেহাদে কার্যকরী ঘোড়াসমূহের সহিত উপমা দেওয়া হচ্ছে। দেখ! এই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী! তোমরা তাকে খাদ্য দাও এর ফলে সে তোমাদের বিশ্বস্ত হয়ে যায়। তোমাদের প্রত্যেক আদেশ মানে। তোমরা একে আস্তাবলে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা থেকে রক্ষা কর বলে সে তোমাদের

কাছে কৃতজ্ঞ ও বাধ্য। তোমাদের ইশারায় সে দৌড়ায়। আর তোমরা খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তোমাদের উপর তার অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে। অথচ তোমরা কি পশু থেকেও খারাপ ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী যে তোমরা নিজের প্রভুর বিশ্বস্ত বাধ্য হয়ে তাঁর ইবাদত বন্দেগী করনা? আল্লাহ্ কিতাব পড়না? তাঁর ইবাদত করনা? রোযা রাখনা? তোমরা কেন বিদ্রোহী, অবাধ্য, কাফের ও অহংকারী হলে? মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অকৃতজ্ঞ। এবং সে নিজেই এর সাক্ষী। সে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে বন্দী হয়েছে। সে খোদার দিকে ফিরে যাওয়ার সময় পায়না। খোদার আদেশ পালন করা, বন্দেগী করার ফুরসত হয়না। সমস্ত জীবন দুনিয়া অর্জনের পিছনে অতিবাহিত করল। কিছুটা অর্জন করতে পারল না। শেষে কবরে পৌছে গেল। মরণঘুমে শুয়ে পড়ল। কিয়ামতের দিন দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানো হবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে সাথে কি নিয়ে এসেছ? তার সকল কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। তাকে দেখানো হবে।

এরপর ১০১ নম্বর সূরা القارعة। কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করছে। যখন কিয়ামত ঘটবে তখন ভীষণ শব্দে জমীন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মানুষ জিজ্ঞাসা করতে থাকবে এসব কি হচ্ছে? কিয়ামতের দৃশ্য বিস্ময়কর ও ভয়ংকর হবে। নেক পরহেযগার বান্দা যারা কিয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিল শান্ত ও ধীরস্থির থাকবে। তারা নিজেদের জীবনকে আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল। তাদের পাথেয় তাদের কাছে থাকবে। তারা কখনও চিন্তিত ও নিরাশ হবে না। যারা পাথেয় সাথে করে নিয়ে আসবে না। কিয়ামতের উপর যাদের বিশ্বাস ছিলনা তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকবে। তাদের বলা হবে যাও হাবীয়া দোযখে প্রবেশ কর। হাবীয়া কি তা কেউ জানেনা। হাবীয়া একটি দোযখের নাম। সেখানে শুধু আগুন আর আগুন।

এরপর ১০২ নম্বর সূরা التكاثر। কিয়ামত ও কবরের অবস্থা বর্ণনা করছে। মানুষ দুনিয়ার পিছনে ঘুরে আরাম আয়েশের সন্ধানে থেকে এবং মনের আকাংখা মিটাতে গিয়ে সত্য পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে গেছে। নিজের আখিরাতের জন্য কোন পাথেয় সাথে নিতে পারেনি। তার যৌবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা সবকিছু খেলাধূলা এবং অর্থ উপার্জনে ব্যয় করেছে। বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে দুর্বলতা, অসামর্থ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অক্ষমতা, একাকীত্ব ও অসহায়তার শিকার হয়ে কোন কিছুর যোগ্যতা আর থাকেনা। ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া তার কপালে আর কিছু জোটেনা। কবরে যখন এল তখন খালি হাতে এল। তখন সে জানতে পারল যে তার পরিণাম কি? না তার ঈমান ছিল না বিশ্বাস। কোন পুণ্যের কাজও সে করেনি। মুনকার নকীরের প্রশ্নের কি জওয়াব দিবে? কবরেই দোযখের জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষা কর। এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একটি একটি করে আল্লাহ্র নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছ। যৌবন কোথায় অতিবাহিত করেছ। ধন-সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ।

এরপর ১০৩ নম্বর সূরা العصر। জীবনের কাহিনী শুনাচ্ছে। মহাকালের শপথ! যা গত হয়েছে। কেমন কেমন লোক ছিল? কি কীর্তি ছিল? পৃথিবীর নানা জাতি ও সম্প্রদায় আজ কোথায়? কারো নাম নিশানা পর্যন্ত বাকি নেই। আগামীতে যে সময়ের আগমন ঘটবে তা হলো আখিরাতের যামানা। এ সময় তারই হবে যার কাছে ঈমান, বিশ্বাস ও ভয় আছে। যারা এবাদত বন্দেগী এবং খোদার স্মরণে জীবন যাপন করে থাকবে। সময় বড়ই ধোকাবাজ। সবাইকে ধোকা দেয়। সবাই নিজের আখিরাতকে ভুলে রয়েছে। তারা এমন জীবন যাপন করছে যা শুধু ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসবে। কর্মের ফল তারাই পাবে যারা পরহেযগার ও পুণ্যবান হবেন। হেদায়েত কেবল মোত্তাকী ও সৎ মানুষেরাই লাভ করবে। যাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ রয়েছে। হে মানুষ সকল! পার্থিব জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ কর। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ। আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর এবং সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক।

এরপর ১০৪ নম্বর সূরা همزة শুরু হচ্ছে। বিধর্মী কাফির ও মুশরেক গালি-গালাজ করে মোত্তাকী ও সৎ মানুষের। উপহাস করে দ্বীনের। উপহাস করে খোদার আদেশসমূহের। দুনিয়ার আয়েশ ও আরামের জীবন নিয়ে অহংকার করে বলে যে মুসলমানদের কাছে কিছুই নাই। অভুক্ত, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র। তাদের অবস্থা শোচনীয়। এরা আল্লাহ্‌র ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দা। এদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করোনা। তোমাদের ধন-সম্পদ চিরকাল থাকবে না। এর উপর গর্ব ও অহংকার করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। কিয়ামত অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে 'হুতামা'। حطمة এমন আগুন যে এর মধ্যে কিছু নিক্ষেপ করতেই আগুন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। চেহারা ও শরীর ঝলসিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলে এবং ছাই হয়ে যায়।

এরপর ১০৫ নম্বর সূরা الفيل। শুরু হচ্ছে। ইয়ামানের গভর্নর বড় শক্তিমত্তা দেখিয়েছিল। হস্তীবাহিনী নিয়ে আল্লাহ্‌র কাবা ঘর মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য মক্কা উপত্যকার দিকে রওয়ানা হয়েছিল। হাতী আগে অগ্রসর হতে পারেনি। শিকল দিয়ে বাঁধা হাতিগুলো শত চেষ্টা সত্ত্বেও আগে অগ্রসর হলোনা। হাতী যখন পাহাড়ের দিকে ধাবিত হল তখন আকাশে আবাবীলের ন্যায় ক্ষুদ্র পাখীর দল ছোট ছোট পাথরকণা ঠোঁটে ধারণ করে উপর থেকে নিক্ষেপ করতে লাগল। ক্ষুদ্র পাথরকণার আঘাতে সব হাতী দুই টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। কাবা আল্লাহর ঘর। আল্লাহ্ নিজেই এর হেফাজত করার দায়িত্ব নেন। আব্দুল মোত্তালিব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এ ছিল অদৃশ্যের উপর অটল বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এই তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের নিদর্শন ছিল। বাকি কাজ আল্লাহ্‌র ছিল। তিনি সে কাজ পুরা করে দেখিয়ে দিলেন।

এরপর ১০৬ নম্বর সুরা قريش। মক্কাবাসীদের উপর আল্লাহর কতই না অনুগ্রহ ও করুণা ছিল। বন্ধ্যা মরুভূমিতে আবে যমযমের কূপ দান করেছেন। খেজুর বৃক্ষ উৎপন্ন করেছেন। ইব্রাহিমের দোয়া এবং রিযিকের প্রতিশ্রুতি ছিল। ক্ষুধায় অন্ন যোগানো,

পিপাসায় স্বাস্থ্যকর মিষ্টি পানি পান করানোর ওয়াদা পুরা করেছেন। বাণিজ্য কাফেলার বিশ্রামের জন্য জায়গা, কোলাহলমুখর জনপদ, ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কোন নিয়ামত ছিলনা যা তাদের বিনা খরচায় দেওয়া হয়নি। আল্লাহর অশেষ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার স্থলে তারা ৩০০ মূর্তি এনে কাবাঘরে স্থাপন করেছিল। এবং তাদেরকে খোদা বানিয়ে পুজা করতে লেগেছিল। উপকারের জওয়াব তারা কুফর ও শিরক, অস্বীকার ও অবাধ্যতার দ্বারা দিয়েছিল। তোমাদের উচিত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা যিনি তোমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার নগরীতে তোমাদের আবাদ করেছেন। তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেছেন। তোমাদেরকে অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক। তাঁর উপকারের কথা মনে রাখ।

এরপর ১০৭ নম্বর সূরা الماعون- সারা মক্কার কাফির ও মুশরিক একজন পয়গম্বরের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দল গঠন করেছিল। শুধু এই কথার জন্য যে তিনি এক আল্লাহ্‌র কথা বলেছিলেন। তিনি কুফুর ও শিরক থেকে প্রতিমার উপাসনা থেকে নিষেধ করার জন্য এসেছিলেন। তাদের হৃদয় এতই কঠিন ছিল যে করুনা ভালবাসা স্নেহ-মমতা এবং মানবীয় সহানুভূতির নাম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিলনা। তারা না ক্ষুধার্তকে খানা দিত না নিঃস্ব দরিদ্রকে সাহায্য করত। তারা অনাথের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করত। মক্কার নেতৃবর্গ মক্কার ব্যবসায়ী লোক এতই অত্যাচারী এবং দ্বীন ইসলামের বিরোধী হয়ে যায় যে তারা হুজুর (সাঃ) কে নামাজ পড়তে দিতনা। নামাজের অবস্থায় তারা হুজুর (সাঃ)-এর উপর ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করত। তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটত। নামাজ পুণ্যের কাজ এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদত। ধর্মের একটি বিশেষ স্তম্ভ। ইসলাম ধর্ম ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, অনাথকে সাহায্য করা ঋণগ্রস্ত মানুষের ঋণ পরিশোধ করা এবং একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দয়া দেখানোর শিক্ষা দেয়। জীবনের প্রয়োজনীয় ও দরকারী জিনিস অন্যের উপকারার্থে দেওয়ার কথা বলে।

এরপর ১০৮ নম্বর সূরা الكوثر। ইহা পূর্বের প্রতিশ্রুতির পূরণ ও বাস্তবায়ন। যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ সূরা الضحى তে স্বীয় বন্ধু সুহৃদ হুজুর (সাঃ)-এর কাছে দিয়েছিলেন। বিধর্মী লোক হুজুরকে খোঁটা দিয়ে বলে বেড়ায় যে, তার কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনি নির্বংশ তাঁর কোন ওয়ারিশ নেই। মানুষ জানেনা উত্তরাধিকার কি জিনিস। উহা বান্দার উপর আল্লাহ্‌র দান। আল্লাহ ৯৩ নম্বর সূরা والضحى তে ওয়াদা করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ আপনাকে এমন নেয়ামত দান করা হবে যা পেয়ে আপনি খুশি হবেন। আমরা আপনাকে حوض كوثر দান করেছি। ইহা একটি বিরাট নেয়ামত, যদি আপনি জানেন। হাশরের দিনে কেউ যদি এ পানি এক ঢোক পান করে তাহলে সকল তৃষ্ণা নিমেষে দূর হয়ে যাবে। এবং সে নতুন জীবনী শক্তি পেয়ে সজীব হয়ে যাবে। কাওসারের পানি হাশরের দিন কেবল মাত্র নেককার মোত্তাকীদের জন্য, উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য উপহার হিসাবে এবং আল্লাহ্‌র রহমতের দান হিসাবে প্রদান করা হবে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহর এই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করুন। তাঁর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করুন। যেসব কাফির কটুক্তি করে বেড়ায় এবং হুজুর (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে খোঁটা দেয় তারা নির্বংশ হবে। তাদের বংশের সকল নাম-নিশানা মুছে যাবে। কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা।

এরপর ১০৯ নম্বর সূরা الكافرون। মক্কার নেতৃবর্গ ধর্মের ব্যাপারে একটি আপোস প্রস্তাব পেশ করে। তাতে বলা হয়েছিল যে, কিছু সময় মুসলমান তাদের প্রতিমার উপাসনা করুক এবং কিছু সময় কাফির ও বিধর্মীরা মুসলমানদের আল্লাহ্‌র ইবাদত নামাজ ও হজ্ব করবে। এভাবে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং শত্রুতা থাকবেনা। এই সমঝোতামূলক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ এই সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ বলেন কখনই এরূপ হবেনা। তোমাদের ধর্ম তোমাদের থাক আর আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে থাকি। দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা শুনিয়ে দেওয়া হলো এবং ইহাই অটল থাকবে। এর কোন নড়চড় হবেনা।

এরপর ১১০ নম্বর সূরা اذا جاء। শুরু হচ্ছে। যখন আল্লাহ্‌র দ্বীন ইসলামের বিধান ও শরীয়ত পূর্ণ হলো তখন প্রচারকের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেল। আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুকে বললেন যে, দ্বীন ইসলামের মধ্যে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। আপনি দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব পুরা করেছেন। আপনার প্রয়োজন এবং আমার ওহীর প্রয়োজন আর নেই। হে বন্ধু! আপনি দ্বীনের জন্য বড় পরিশ্রম ও কষ্ট করেছেন এখন আরাম করুন। সমস্ত সময় আল্লাহ্‌র স্মরণ ও গুণ বর্ণনার মধ্যে অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্‌কে বেশি করে স্মরণ করুন। খুব শীঘ্রই আল্লাহ আপনাকে তাঁর মেহমান করবেন। এজন্য আপনি আনন্দ প্রকাশ করুন। এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করুন।

এরপর ১১১ নম্বর সূরা تبت। শুরু হচ্ছে। আবু লাহাব হুজুর (সাঃ)-এর চাচার নাম। তিনি ইসলামের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে সকলের আগে থাকতেন। আল্লাহ্ যখন প্রিয় বন্ধুকে বিষণ্ন, দুঃখিত ও চিন্তিত দেখলেন তখন সান্ত্বনার জন্য এই সূরা নাযিল করেন। এবং বললেন, হে আমার সুহৃদ! আমি এইসব জালেম কাফেরদের হাত ভেঙ্গে দিব। আবু লাহাবের স্ত্রী যে তার হীন কাজে শরীক ছিল খেজুরের পাকানো দড়ি দ্বারা নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আবু লাহাব কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। মক্কার অধিবাসীগণ সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচার জন্য তাকে জীবন্ত গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে আসবে। তার লাশ জঙ্গলে পড়ে পঁচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে। পাখী তার গলিত লাশ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খেয়ে ফেলবে। এইসব লোকের এই পরিণতি হবে।

এর পরের সূরা ১১২ নম্বর সূরা ইখলাস। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বা তাওহীদের ইহা একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও অর্থবহ সূরা। এই সূরা আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী সার্বিকভাবে বর্ণনা করছে। অল্প বাক্য বিশিষ্ট এই সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। এবং গোটা কুরআনের ভাব-সংক্ষেপ। আমার প্রকৃত মাবুদ এক, উপমাহীন, অংশীদার হীন, নিখিল বিশ্বের প্রভু, অমুখাপেক্ষী, কারও সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই, কেউ তাঁর মত নয়। কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন। কেউ তার সমান হতে পারেনা। তিনি একক, তুলনাহীন, রাজাধিরাজ এবং শরীক বিহীন।

এরপর ১১৩ নম্বর সূরা فلق শুরু হচ্ছে। এর পাঁচটি আয়াতে আশ্রয় চাওয়ার হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। যা মানুষের এখতিয়ার ও ক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও। মানুষের ও সৃষ্ট জীবের অকল্যাণ ও ক্ষতিকারিতা থেকে আশ্রয় চাও। মানুষের দুষ্কৃতি ও বিশৃংখলা, পরস্পরের হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতা থেকে আশ্রয় চাও। অন্ধকার রাতের অমঙ্গল ও ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাও। যখন রাতের অন্ধকারে জ্বিন ও শয়তান বিভীষিকার পরিবেশ বিস্তৃত করে। যাদুকরের যাদুর তেলেসমাতী বিশৃংখলা থেকে মানুষের নিজেদের মধ্যে কলহ-ফাসাদ বেশী-ভয়ংকার হয়ে থাকে। আল্লাহ্ এর থেকে হেফাজত ও রক্ষা করুন।

এরপর ১১৪ নম্বর সূরা নাস হলো কুরআনের শেষ সূরা। এই সূরা ছয়টি আয়াত সম্বলিত। এতে বলা হয়েছে যে, মন্দ ও বিশৃংখলা মানুষের ক্ষমতাভুক্ত। যদি তারা চায় ইহা খতম করতে পারে। মানুষের অন্তরের মধ্যে ধারণা, অনুমান সংশয় ও সন্দেহ ব্যাপক বিশৃংখলা ঘটাতে পারে। এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। মানুষের বাদশাহ থেকে, আদেশ দাতা সুলতান থেকে, অত্যাচারী দম্ভপূর্ণ শাসক থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে চলে এস। মানুষ যখন সীমালংঘনকারী অবাধ্য হয়ে যায় তখন মানুষের অনিষ্টকারিতা মানুষের জন্য অধিক প্রাণঘাতী হলাহলে পরিণত হয়। আল্লাহর আশ্রয়ে এসে যাও। অত্যাচারী ঘাতক-এর সাহচর্য থেকে দূরে থাক। তার ঘর, শহর ছেড়ে দূরে চলে যাও। অন্তরে যে কু-ধারণা সন্দেহ সৃষ্টি হয় তার থেকে নিজকে রক্ষা কর। আল্লাহর আশ্রয় খোঁজ। আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। আল্লাহর যিকির স্মরণে মগ্ন হয়ে যাও। তাঁরই স্মরণ ও যিকিরের বদৌলতে তুমি রক্ষা পেতে পার। শয়তান, জ্বিন, যাদুকর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই দুটি সূরা সর্বদা একত্রে পাঠ কর। সর্বমোট এগারটি আয়াত। এর কার্যকারীতা অত্যন্ত গভীর। প্রত্যেক সমস্যা ও বিপদের সমাধান এতে রয়েছে।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান ও মহীয়ান আল্লাহর - যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। যিনি করুণাময় ও দয়ালু। বিচার দিবস ও আখিরাতের মালিক। আমরা তাঁরই ইবাদত করি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। হে পরওয়ারদিগার! আমাদের সোজা পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের রাস্তা নয় যাদের উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

হে রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রার্থনা কবুল কর। (আমীন)

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ (سورة ص)

এটাতো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ মাত্র, এবং ক্ষণেক বাদেই তুমি এর সংবাদ জানতে পারবে।